উৎসর্গ করিলাম তাঁকে এটী যাঁর ধন,
আর তাঁদের
যাঁরা করেন তাঁর অনুগমন।

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

I and my Brother are one." —*Keshub.*

শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রম
হাবড়া।

১৯১১।

 [ব্যয়াদি সাহায্য ১৷৷৹ টাকা।

নিবেদন।

শ্রীব্রহ্মানন্দ-জননীর কৃপায় এই পুস্তকখানি বাহির হইল। ধন্য তিনি যিনি কত বিঘ্ন বিপদ নিবারণ করিয়া এই পুস্তক প্রকাশ ব্রত উদ্‌যাপন করাইলেন। তাই সর্ব্বপ্রথমে তাঁরই শ্রীচরণে কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হৃদয়ে প্রণাম করি। এবং যাহারা অনুগ্রহ করিয়া নানা প্রকারে এই পুস্তক প্রকাশে উৎসাহ ও সাহায্য দান করিলেন তাঁহাদিগকেও কৃতজ্ঞতা-ভিবাদন করি।

শ্রীব্রহ্মানন্দের মহজ্জীবন তত্ত্ব সমালোচনা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। এই কার্য্য সাধনে আমি তো সম্পূর্ণই আপনাকে অযোগ্য মনে করি। ব্রহ্মানন্দাশ্রমে ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসবে একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করা হইবে এই উদ্দেশ্যে ইহা প্রথম লিপিবদ্ধ করা হয়। কোন বন্ধুর অনুরোধে ইহা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিতে ছাপাখানায় দিয়া প্রুফ সংশোধন করিতে গিয়া ক্রমেই ইহা একখানি পুস্তক হইয়া দাঁড়াইল; এবং আশ্চর্য্য এই যখনই যে বিষয়টী লিখিতে প্রেরণা অনুভব করিলাম, কোথা হইতে ভাব যেন আপনাপনি যোগাইতে লাগিল এবং ব্রহ্মানন্দের তৎ-সম্বন্ধীয় উক্তিও যেন তাঁর পুস্তকাদি খুলিবামাত্র বাহির হইয়া পড়িল। সুতরাং এসকলে স্বয়ং পবিত্রাত্মারই প্রেরণা ও ব্রহ্মানন্দের জীবন্ত সহায়তা ভিন্ন আমি আর কিছুই মনে করিতে পারি না। তথাপিও আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি ব্রহ্মানন্দের মহান জীবনের তত্ত্ব ইহাতে যে আমার সব বলা হইল তাহা নহে। এখনও অনেক কথা বলিবার বাকী রহিয়া গেল। এই পুস্তকখানিতে যে তো এমন অনেক বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে

যাহা অনেকের মতের সহিত না মিলিতে পারে, কিংবা অনেকের নিকট সে সমুদয় "নূতন নববিধানের" মত বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু আমি কি করিব ব্রহ্মানন্দের অনুগমন করিতে গিয়া যাহা বাহির হইয়া পড়িয়াছে তাহাই ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইহার ভাষা আমার, কিন্তু ভাব পবিত্রাত্মার এবং সত্য স্বয়ং ব্রহ্মানন্দ ও তাঁর মার। সরল প্রার্থনাশীল অন্তরে পবিত্রাত্মার আলোকে ব্রহ্মানন্দের প্রার্থনা ও উপদেশাদি যিনি পাঠ করিবেন তিনিই এই পুস্তকের প্রত্যেক কথাই যাচাই করিয়া লইতে পারিবেন। যদি তাঁহার সহিত কোন কথা না মেলে কেহ লইবেন না।

সাধারণে অনুসন্ধিৎসু হইয়া ব্রহ্মানন্দের পুস্তকাদি আরো পাঠ করিবেন এবং তাঁর কথায় তাঁহাকে চিনিবেন এই পুস্তক প্রচারের প্রধানতঃ ইহাই উদ্দেশ্য।

ভাষা আমার দুর্ব্বল, তাই অনেক স্থানে আমার হৃদয়ের ভাব হয় তো সকলকার বোধোপযোগী করিতে পারি নাই এবং ছাপার ভুলও স্থানে স্থানে যথেষ্টই রহিয়া গিয়াছে, তজ্জন্য পাঠকগণের নিকট অপরাধ স্বীকার করিতেছি। এখানেই প্রধান কয়টী ভুল সংশোধিত হইল :—

পৃষ্ঠা ১০৮ পংক্তি ১১ "কবিও" স্থানে "বাঁচিও" হইবে।
" ১৫১ " ৫ "জীবন বিহীন" "জীবনবিহীন হয়" হইবে।
" ৩১৭ " ৭ "ঘুরিয়া" " "ঘুচিয়া" হইবে

শ্রীব্রহ্মানন্দ প্রার্থনায় জীবন আরম্ভ করেন এবং যুগল সাধনে ইহ জীবন পূর্ণ করেন, তাই এই পুস্তকের প্রথমে ও শেষে সেই সেই ভাবের দুইখানি ছবি দেওয়া হইল। শ্রীব্রহ্মানন্দজননী আমার পাঠক মহাশয়-দিগকে তাঁর পবিত্রাত্মার পরিচালনায় ব্রহ্মানন্দানুগমনে পরিচালিত করুন এই ভিক্ষা করি।

সূচী পত্র।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

বিষয়। | পৃষ্ঠা।

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

ART PRESS

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

প্রার্থনা।

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মনে ব্রহ্মানন্দ-জননীর নিকট প্রার্থনা করি,—"মা, সমুদয় ধর্ম্ম পূর্ণ হবে এই নববিধানে। পৃথিবীর সব আশা ভরসা ইহাতে পূর্ণ হবে; বেদ বেদান্ত পুরাণাদিতে যা বলা হয়েছে, তা সিদ্ধান্ত হবে এই নববিধানে। যত ভক্ত যত উপদেশ দিয়াছেন তা পূর্ণ হবে এই নববিধানে। রজনীর অন্ধকার চলে যাবে, দিবসের আলো আসিবে। আমরা শুভক্ষণে জন্মিয়াছি। সেই শান্তির দিন শীঘ্র ফিরে আসিবে। সব পাপ তাপ যাবে।

"হে ঈশ্বর, এমন কঠিন কার্য্য সামান্য লোকের হাতে দিলে? বড় বড় লোক বড় বড় ধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ হন, এবার তাঁদের পদরেণু মাথায় নিতে পারে না, এমন সামান্য লোকের উপর এত বড় স্বর্গের ভবন স্থাপন করিলে? যারা নিজে খেতে পায় না, তারা অন্যকে ভাল সামগ্রী খাওয়াবে? নিজে যারা শাস্ত্র জানে না, অপরের পক্ষে তারা শাস্ত্র হবে? নববিধির এই বিধি যে সামান্য লোকের দ্বারা বড় ব্যাপার ঘটাবে। মহাদেব কি মুটের মাথায় স্বর্গের রত্ন পাঠা-লেন? মহাপ্রভুর কি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাণ্ড হয় কে জানে?

"হে ঈশ্বর, আশীর্ব্বাদ কর যেন এই ক্ষুদ্র দেহ হইতে নূতন মানুষ বাহির হয়। এ দেহ ভিতর হইতে জীবাত্মা পক্ষী বাহির হইয়া মুক্তির সমাচার মুখে লইয়া দেশে দেশে উড়িয়া যাইবে। তুমি যাদুকর হইয়া নূতনবিধানে নূতন মানুষ কর। যাদুকরের ছড়ি আমাদের অসার রিপু পরতন্ত্র দেহে ছোঁয়াও, এগুলি ভেঙ্গে যাক, আর ইহার ভিতর হইতে নূতন মানুষ বাহির হউক, হইয়া নববিধানের রথ টানিয়া লইয়া যাক। তুমি কৃপাবর্ষণপূর্ব্বক এমন আশীর্ব্বাদ কর।" শ্রীব্রহ্মানন্দের এই প্রার্থনা মা ব্রহ্মানন্দ-জননী বিশেষভাবে এই অধম ব্রহ্মানন্দদাসের জীবনেও পূর্ণ করুন।

সূচনা।

এ অধম সেবক আজ ব্রহ্মানন্দের জীবনবার্ত্তা ঘোষণা করিতে আদিষ্ট। এই কার্য্যের গুরুত্ব ভাবিয়া এবং ইহার জন্য নিজের একান্ত অনুপযুক্ততা স্মরণ করিয়া আমি নিতান্তই অবসন্ন হইতেছি। জানি না ব্রহ্মানন্দ-জননী কেন আমাকে এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উৎসাহিত করিলেন।

সত্যই কি তিনি এ মূঢ়ের মাথায় দিয়া এবার তাঁর স্বর্গের রত্ন জগতে বিলাইবেন? যদি তাঁর ইহাই অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তবে তাঁর যা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হউক, এই বলিয়া আমি তাঁরই শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিতেছি এবং তাঁর ব্রহ্মানন্দ ও তাঁর পবিত্রাত্মার প্রেরণা একান্ত বিনীত অন্তরে ভিক্ষা করিতেছি। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তাঁর প্রিয় ব্রহ্মানন্দের মহান জীবনতত্ত্ব সর্ব্ব সমক্ষে ঘোষণা করিয়া তাঁকে, তাঁর সন্তানকে ও

তাঁর বিধানকে গৌরবান্বিত করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। এই কার্য্যে ভক্তমণ্ডলী এবং আমার জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অগ্রজ নববিধান-প্রেরিত ও প্রচারক মহাশয়দিগেরও পদরেণু ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রের জীবনতত্ত্ব অতি উচ্চ ও গভীর। ইহার তত্ত্ব অপর সাধারণ জীবনের ন্যায় সহজ নহে। এ মহজ্জীবন নিজ জীবনে কথঞ্চিৎ প্রতিফলিত না হইলেও ইহা হৃদয়ঙ্গম করাই কঠিন। কারণ ব্রহ্মানন্দ-জীবন-তত্ত্ব কেবল জানিবার বিষয় নয়, ইহা জীবনে সংগ্রথিত এবং প্রতিফলিত করিবার বিষয়। তাই ব্রহ্মানন্দের অনুগমনার্থী না হইয়া যিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইবেন, তিনি কেবল উপর উপর ভাসা ভাসা ভাবে ইহা আলোচনা করিতে পারিবেন মাত্র, ইহার গভীরতার ভিতর প্রবেশ করিতে কখনই সক্ষম হইবেন না। তাই এপর্য্যন্ত এ জীবনের গভীর তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে বড় কেহ চেষ্টা করেন নাই, বরং তাহা করিতে অনেকে ভয়ই পাইয়াছেন।

তবে ব্রহ্মানন্দ কিনা স্বয়ং বলিয়াছেন "আমাদের মধ্যে ভীরুতা যেন আর না থাকে, যাহা গোপনে শুনিয়াছি তাহা বলিতে হইবে। সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছি ভয় পাইব কেন? তাই সমুদয় সত্য পৃথিবীর কাছে নির্ভয়ে যেন প্রচার করিতে পারি।" ভক্তের এই প্রার্থনার বলেই আমি এই কার্য্যে সাহসী হইতেছি।

আমরাও এখনই যে এ তত্ত্ব নিবেদন করিবার অধিকার হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কেন না আমি বুঝিয়াছি ব্রহ্মানন্দ জীবনের প্রকৃত সাক্ষী ব্রহ্মানন্দ-গত-জীবন একটী ব্রহ্মানন্দী দল। এইরূপ এক ব্রহ্মানন্দী দল না হইলে ব্রহ্মানন্দ জীবনের যথার্থ সাক্ষ্য দিতে কেহ পারিবে না এবং তাহার সত্যতারও প্রকৃত প্রমাণ হইবে না।

তবে কেবল ব্রহ্ম-কৃপাবলে আত্মজীবনের অধ্যাত্ম সাধনায় (subjectively) অন্তরে যাহা সবিশেষ উপলব্ধি করিয়াছি তাহাই নিবেদন করিতেছি; ব্রহ্মানন্দ-জননীর কৃপালোকে ব্রহ্মানন্দ-জীবন যাহা পাঠ করিয়াছি এবং তাঁর নিজমুখে যে আত্ম-পরিচয় পাইয়াছি তাহাই কেবল ঘোষণা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি।

ব্রহ্মানন্দকে ব্রহ্মানন্দ নিজে যেমন চিনিয়াছেন তেমন আর কে? সুতরাং তাঁর প্রকৃত সাক্ষী এক তাঁকেই দেখিয়া এবং তাঁর সাক্ষ্য তাঁরই মার মুখে সাব্যস্ত করিয়া স্বয়ং পবিত্রাত্মার প্রেরণায় যাহা উপলব্ধি করিয়াছি তাহাই আমি প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছি।

কিন্তু আমি এখানে গভীর অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে প্রথম জীবনে আমি ব্রহ্মানন্দের ঘোর বিরোধী ছিলাম। তাঁর বিরোধী কোন ব্যক্তির পাল্লায় পড়িয়া আমি তাঁর দলকে "কৈশবিক দল" ইত্যাদি বলিয়া বিদ্রূপ করিতাম। তার পর বিধাতার চক্রে যখন ব্রহ্মানন্দের অনুচর বলিয়া যাঁরা পরিচয় দিতেন এমন কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন, তাঁর অনুগামী লোকও তাঁর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন, সেই সময়ে সেই কোচবিহার বিবাহের আন্দোলন সময়ে মা আমাকে ব্রহ্মানন্দের সমীপবর্ত্তী করিলেন। কোচবিহার বিবাহে দুই জাতির মিলনে দেশের সামাজিক উন্নতি হইবে এইরূপ বিশ্বাসে আমি ইহার যুক্তিযুক্ততা সমর্থন করিয়া কলিকাতাস্থ যুবকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে ব্রহ্মানন্দকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিতে তাঁর নিকটস্থ হইলাম। অভিনন্দন পত্রখানি গ্রহণ করিয়া তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাঁর গভীর প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে তাকাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনও যেন কাড়িয়া লইলেন। সেই দিন হইতে তাঁর বিরোধীতা ছাড়িয়া

আমি তাঁহারই হইয়া গেলাম। তাঁর সঙ্গ লইলাম, তাঁর যুবকদলে মিলিলাম, তাঁর পদপ্রান্তে বসিয়া কত শিক্ষা লইতে আরম্ভ করিলাম, তাঁর কতক কতক কার্য্যও করিতে লাগিলাম।

তথাপি আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যতদিন তিনি দেহে ছিলেন ততদিন তাঁহাকে সম্যক চিনিতে পারি নাই। ভাবিতাম তিনিও আমার মত একজন মানুষ; তবে তিনি কিছু বড়, আমি কিছু ছোট, চেষ্টা করিলে কালে আমিও হয়ত তাঁর মত হইতে পারি। কিন্তু যে দিন তিনি তাঁর দিব্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমর ধামে চলিয়া গেলেন, রোগের অস্থিরতায় তাঁর দেহ খাটের উপর চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে ঠিক আমি যেখানে উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়াছিলাম, সেইস্থানে তাঁর চরণদুটী আনিয়া যাই আমার বক্ষের উপর রাখিলেন, অমনি তাঁর প্রাণবায়ু বাহির হইয়া উর্দ্ধগামী হইল এবং আমি যেন স্পষ্ট তাঁর আত্মাকে স্বর্গে আরোহণ করিতে দেখিলাম, তখন হইতেই এই ধারণা আমার হৃদয়ে উপলব্ধ হইল,—তিনি সামান্য মানুষ নহেন!

তিনি আকাশ হইতে উচ্চ এবং আমি সমুদ্রতল অপেক্ষা নীচ, আমার ন্যায় অধম পাপী জনের পক্ষে তাঁর জীবনতত্ত্ব নাগাইলেরও অতীত, এবং এখন যতই দিন যাইতেছে ততই তিনি যেন বড় হইতে আরো বড় হইতেছেন, তাঁর অনন্ত দৌড়ের সঙ্গে আমি আর দৌড় দিতে পারিতেছি না, তাঁর নাগাইল পাওয়া দূরে থাক কতদিনে যে তাঁকে ধরিতে পারিব তাহার কল্পনাই যেন করিতে পারিতেছি না, তাঁহার উচ্চতা এতই অনতিক্রমনীয় এবং গভীরতা এতই দুরবগাহ্য। এক্ষণে তাঁহার নিতান্ত অযোগ্য হইলেও মা স্বয়ং যখন আমাকে তাঁহার অনুগামী করিয়াছেন সেই সাহসেই তাঁর মহজ্জীবনতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

শ্রীব্রহ্মানন্দ জীবনবৃত্তান্ত।

শ্রী কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের জীবনবৃত্তান্ত অনেকেই জানেন; তথাপি যাঁহারা না জানেন তাঁহাদের জন্য সংক্ষেপে এই বলি তিনি ইংরাজী ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে নভেম্বর কলিকাতার কলুটোলা পল্লীতে দেওয়ান শ্রীপ্যারীমোহন সেনের ঔরসে এবং মা সারদাদেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মানন্দ বাল্যজীবন হইতেই নিজ ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের অনেক পরিচয় দিয়া ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মমতের সহিত তাঁহার মতের মিলন আছে দেখিয়া আপনাপনি এই ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং আপনার নবধর্ম্ম বিশ্বাসের জন্য স্বজন পরিত্যক্ত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রধানাচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর কর্তৃক গৃহীত ও আদৃত হন। তিনিই তাঁহাকে ব্রহ্মানন্দ নামে অভিহিত করেন ও ঈশ্বরাদেশে আচার্য্য পদে বরণ করেন। আচার্য্যের পদ লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের নানা প্রকার পুষ্টিসাধন করেন এবং ইহার সম্পূর্ণ নূতন পরিণতি প্রদর্শন করিয়া ইহাকে পরিত্রাণের নিমিত্ত ঈশ্বর প্রেরিত নববিধান বলিয়া ঘোষণা করেন।

তিনি ঈশা, মুষা, বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ, মোহম্মদ প্রভৃতি যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগকে মহামানুষ বলিয়া প্রতিপাদন করতঃ ভক্ত-সমাগম সমাধান করেন এবং হিন্দুধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম ইত্যাদি ধর্ম্ম-মণ্ডলীর মধ্যে যে সমুদয় ভ্রান্তমত কুসংস্কারাদি প্রবেশ করিয়াছে তাহা বর্জ্জন করিয়া তাহাদের ভিতর যাহা সত্য তাহার পুনরুদ্ধার করতঃ তাহাদের নব নব ব্যাখ্যা দিয়া নববিধানে ঐ সমুদয় ধর্ম্ম বিধানের সমন্বয় করেন। তিনি খোল, কীর্ত্তন, জলসংস্কার, ব্রত, হোম, নৃত্য গীত, থিয়েটার ইত্যাদিরও উদ্ধার সাধন করেন এবং কামিনী, কাঞ্চন, সংসার

পালন ইত্যাদি উক্ত ধর্ম্ম সাধনের বিরোধী বলিয়া যে পরিত্যক্ত হইত তাহার ভিতরও ব্রহ্মের অবতারণা উপলব্ধি করিয়া তাহাদিকেও ধর্ম্ম সাধনার সহায় বলিয়া তিনি গ্রহণ করেন। এবং বর্ত্তমান যুগে (Rationalism) জ্ঞানবাদ (Agnosticism) অজ্ঞেয়বাদ (Materialism) জড়বাদ (Anarchism) অনর্থবাদ ইত্যাদি যে সকল পাশ্চাত্য বিদেশী মাল আমদানী হইয়া দেশীয় যুবকবৃন্দের অপরিনত মস্তিষ্ককে বিকৃত করিতেছে, তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম দর্শন শ্রবণ, বৈরাগ্য, ত্যাগ, সংসারে থাকিয়া যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম সাধন প্রবর্ত্তন করেন এবং নিজ নিজ বিচার বুদ্ধি ছাড়িয়া ঈশ্বরের পরিচালনা বা আদেশে জীবন যাপনের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতে এক মহা নূতন ধর্ম্ম আনয়ন করেন।

তিনি যে ভারতে ও বিলাতে কেবল ধর্ম্ম প্রচারই করিয়াগিয়াছেন তাহা নহে, দেশ-সংস্কার, নর নারীর প্রকৃত স্বাধীনতা ও দেশহিতৈষণা, সাধন এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, প্রথম সুলভ সংবাদ পত্র ও ইংরাজী দৈনিক প্রচার, দুর্নীতি ও মাদক-নিবারণ এবং সুনীতি সঞ্চার এবং রাজা প্রজার মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন ইত্যাদি বিবিধ প্রকারে মানবজাতীর উন্নতি বিধান করেন। এবং পরিশেষে এই নববিধান ধর্ম্মকে নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত, প্রতিফলিত এবং প্রমাণিত করিয়া ইংরাজী ১৮৮৪ সালে ইহলোক হইতে স্বর্গারোহণ করেন।

যুগাবতার।

গীতা বলেন :—

"পরিত্রাণার্থায় সাধুনাং বিনাশয় চ দুস্কৃতাং ;
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

"সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতদিগের দণ্ডদানের জন্য এবং যুগধর্ম্ম বিস্তারের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি।" যদিও ভগবান স্বয়ং পৃথিবীতে অবতার হইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন বলিয়া গীতায় উক্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ বা ভক্তগণের অবতারণাতেই এই উক্তি যথার্থ প্রযুজ্য হইতে পারে এবং সেই ভাবেই যে ব্রহ্মানন্দের জন্ম আমরা নিঃসন্দেহ বিশ্বাস করি। উপরোক্ত শ্লোকের সোজাসুজি অর্থ করিতে গিয়া যখনই কোনও যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখনই তাঁহাকে স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার বলিয়া তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যগণ গ্রহণ ও প্রচার করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ অবশ্য সে ভাবে অবতার হইয়া জন্মান নাই। বরং যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া প্রতিপাদন করার যে ভ্রান্ত মত, তাহা খণ্ডন করিবার জন্যই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

ভগবান নিজেই মানবাকার ধরিয়া সাধুদের হিতসাধন এবং দুষ্কৃতদিগের দমন করিবার জন্য অবতার হইয়া নব নববিধান ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন, এ সংস্কার যেন মানবের হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া গিয়াছিল। মানবের সরলভক্তিপূর্ণপ্রাণ যেখানে একটু মহত্ত্ব, একটু অলৌকিকত্ব, একটু দেবত্ব দেখিয়াছে সেই খানেই অবনত হইয়া তাহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়াছে। মাটী,গাছ, পাথরকে যে দুর্ব্বল প্রাণ ঈশ্বরত্ব দিতে পারে, জীবন্ত মানুষের অসাধারণ দেব প্রতিভা দেখিলে যে সে প্রাণ তাঁহাকে ঈশ্বরের আসনে বসাইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ মহাপুরুষদিগের ব্রহ্মযোগ সমন্বিত জীবন এবং বচনাদি ধর্ম্মপ্রাণ সেবক শিষ্যদের প্রাণে এতই ভক্তির আতিশয্য উদ্দীপন করাইয়া দেয় যে তাহারা আপন [illegible] তাঁহাদিগকে ঈশ্বর না বলিয়া স্থির থাকিতেই পারে না।

ব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধে আতঙ্ক।

ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র সম্বন্ধেও লোকের উক্তরূপ ভ্রান্তি আসিবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে ভাবিয়া তাঁহার সম্বন্ধেও অনেকে ভয়ে ভয়ে কথা বলিয়া থাকেন। পাছে তিনি ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসেন, এই ভয়ে অনেকে তাঁর নাম পর্য্যন্তও করিতে সাহস করেন না। অনেকে হয়ত তাঁহার নাম করাতেই মহা কুসংস্কার এবং নরপূজা আসিয়া পড়িবে এই আশঙ্কায় তাহা দমন করিবার জন্য সসব্যস্ত হইয়া আপনারাই যেন আর এক কুসংস্কারে পতিত ও সত্যের অপলাপ অপরাধে অপরাধী হইতেছেন।

আমার মনে হয় যাহারা বড়ই ঠাণ্ডা লাগিবার ভয় করিয়া সর্ব্বদা দরজা জানালা বন্ধ করিয়া থাকে, তাহাদেরই যেমন শীঘ্র ঠাণ্ডা লাগিবার আশঙ্কা, যাহারা দরজা জানালা খুলিয়া থাকে তাহাদের তেমন নয়, তেমনি যাহারা কেশব পাছে ঈশ্বর হইয়া পড়েন এই আতঙ্কে কেশবের নাম পর্য্যন্ত করেন না বা করিতে সাহসী হন না, তাঁহাদেরই পক্ষে তাঁকে ঈশ্বর করিয়া তুলিবার বরং অধিক সম্ভাবনা। কারণ, মানুষ যে কখনই ঈশ্বর হইতে পারেন না এ বিশ্বাস তাঁহাদের মনে এখনও যথেষ্ট বদ্ধমূল হয় নাই।

এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই, ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র সম্বন্ধে যিনি সর্ব্ব প্রথমে নরপূজার অভিযোগ আনিলেন তিনিই শিষ্যদিগের নিকট স্বয়ং ভগবান হইয়া পূজা লইলেন এবং এখনও তাঁহার ছবি পর্য্যন্ত তাহাদিগের পূজার বস্তু হইয়াছে।

যাহাহউক এই সংস্কার অপনোদন করিবার জন্যই শ্রীকেশচন্দ্রের জন্ম। মহাপুরুষগণ যে সকলেই মহামানুষ জগতে এত করিয়া কে ঘোষণা

করিয়াছেন যেমন তিনি? যদিও মহাত্মা কার্লাইল অন্যান্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক-দিগকে মহাপুরুষ hero বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ঈশার সম্বন্ধে তিনি তো কই সে কথা বলিতে সাহস করেন নাই? তা ছাড়া একটা ধর্ম্ম বিধানের ভিতর মহাপুরুষদিগের প্রকৃত স্থান কোথায়, তাহার নির্দ্দেশ কেবল ব্রহ্মানন্দই করিয়াছেন। যিনি নিজে মহাপুরুষদিগকেও মানুষ বলিয়া প্রতিপাদন করিলেন, তিনি কি কখনও মানুষ না হইয়া ঈশ্বর হইতে পারেন?

মহাপুরুষগণকে কিরূপে ঠিক দেখা যায়?

তবে যাহারা নিজালোকে মহাপুরুষদিগকে দেখিবে তাহারা হ তাঁহাদিগকে দেবতা নয় তাঁহাদিগকে Imposter বা ধর্ম্মদ্রো বলিবেই। কেন না আমরা আপনাদিগের মনের ক্ষীণালোকে মহাপুর বা কাহাকেই ঠিকরূপে দেখিতে পারি না এবং তাঁহাদের ছবি আমাদে আপনাদেরই অনুরূপ গড়িয়া থাকি। যেমন বাজারে দেখিতে প এক রাম সীতার মূর্ত্তি বাঙ্গালী চিত্রকর বাঙ্গালীর ভাবে আঁকেন, বগ চিত্রকর মহারাষ্ট্রীয় মূর্ত্তি চিত্র করেন, আবার মান্দ্রাজী যিনি তিনি তাহা মান্দাজী রূপেই প্রতিফলিত করিয়া থাকেন। সেইরূপ যে কে ভক্তকেই আমরা গ্রহণ করিতে যাই না কেন, আমরা নিজ নিজ ভা তাঁহাতে আরোপ করিতে প্রলুব্ধ হই। সেই জন্য ব্রহ্মানন্দ মহাপুর দিগকে একমাত্র ব্রহ্মালোকেই দেখিবার উপদেশ দিলেন। মহাপুর

দিগকে কিম্বা সকল লোককেই আমরা যদি ব্রহ্মালোকে দর্শন করি, তাহা হইলেই কেবল আমরা তাঁহাদের যথাযথ রূপ দেখিতে পাই।

বাস্তবিক, যেমন সূর্য্যালোক ভিন্ন কোনও বস্তুই পরিষ্কাররূপে দেখা যায় না, রাত্রির আঁধার-আলোকে দীর্ঘ পল্লবযুক্ত বৃক্ষকেও কাহারও কাহারও যেমন প্রেতাত্মা বলিয়া ভয় হয়, আবার দিবালোকে যথার্থ জিনিষটী দেখিলে সে ভ্রম যায়, সেইরূপ আমাদের দুর্ব্বল চিত্তের ক্ষীণ আলোকে অনেক সময়েই মহাপুরুষকেও হয় দেবতা নয় উপদেবতা মনে করি এবং সংসারের মানুষের মধ্যেও কাহাকেও মায়ার চক্ষে, কাহাকেও ঘৃণার চক্ষে, কাহাকেও অত্যধিক আদরের চক্ষে দেখি; এক ব্রহ্মের ভিতর দিয়া দেখিলেই যাঁহাকে যেরূপ দেখিবার তাঁহাকে ঠিক সেইরূপ দেখা যায়, কোন প্রকার ভুল ভ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই জন্যই মহাপুরুষদিগকে দেখিতে হইলে কেবল ব্রহ্মের ভিতর দিয়া দেখিলেই ঠিক দেখা যায় ইহাই ব্রহ্মানন্দের শিক্ষা।

ব্রহ্মানন্দ অসাধারণ মানুষ।

তাই ব্রহ্মালোকেই আমরা ব্রহ্মানন্দকে দেখিয়াছি—তিনি এক অসাধারণ মানুষ। তিনি সাধারণ মানুষ নন। তিনি নিজেও আপনার সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়াছেন, "I am a singular man, I am not as other men are."—আমি অসাধারণ মানুষ, আমি অন্য মানুষের মত নই। তিনি আরও বলিয়াছেন, "Every inch of this man is real, tremendously real."—এই মানুষটীর প্রত্যেক বিন্দু অবধি খাঁটী, ভয়ঙ্কর খাঁটী। যিনি এমন করিয়া সাহসপূর্ব্বক আপনাকে পূর্ণ খাঁটী সত্যবাদী বলিলেন, তাঁহার কথা আর আমরা কি

করিয়া অবিশ্বাস করিব? তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য বলিয় স্বীকার করিতেই হইবে, কেন না তিনি কি কখনও আপনার সম্বন্ধে মিথ্যা বলিতে পারেন? সুতরাং যিনি নিজেকে এমন করিয়া অসাধার মানুষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন, তাঁহাকে সাধারণ মানুষই বা কি করিয় বলি আবার ঈশ্বর স্থানীয়ই বা কি করিয়া বলিতে পারি?

তাঁর এরূপ স্পষ্ট আত্ম-পরিচয় স্বত্ত্বেও তাঁহাকে দেবত করিয়া ফেলিবার আতঙ্কই বা এত কেন তাহাও বুঝিতে পারি না। যাঁহারা যথার্থ তাঁর সমীপবর্ত্তী হইবেন, তাঁহাকে গ্রহণ করিবে তাঁহারা অবশ্যই তাঁহার নিজ কথায় বিশ্বাস করিবেনই করিবেন। কার যিনি আপনাকে মানুষ বলিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া গেলেন তাঁহাকে যদি ঈশ্বর বলি তাহা হইলে প্রথমেইত তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হয়। যদিও শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব আপনাকে ঈশ্ব বলিয়া অস্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান বলিয় পূজা করিতেছেন, কিন্তু ভয়ঙ্কর সত্য কথা যাঁহার বিশেষত্ব তিনি আপনা সম্বন্ধে মিথ্যা বিনয় দেখাইয়াছেন ইহা কি সম্ভব? যাঁহারা ব্রহ্মানন্দে যথার্থ অনুগামী হইবেন তাই এ আশঙ্কা তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছুতে খাটিতে পারে না।

আবার এই আতঙ্ক দ্বারাও প্রমাণ হয় তিনি সাধারণ মানু ছিলেন না; কই অনেক সাধু মহাত্মাইত আছেন, বিশেষং ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগামী যাঁরা, রাজা রামমোহন কি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কই তাঁহাদের সম্বন্ধে তো এত আতঙ্ক লোকের মনে উদয় হয় না বাস্তবিক ব্রহ্মানন্দ এমনই অসাধারণ মানুষ যে একটু ভক্তির আতিশয় হইলেই তাঁকে লোকে ঈশ্বর করিয়া তুলিতে পারে। কেন না, মহা

দেবেন্দ্রনাথও ব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধে স্বীকার করিয়াছেন, "আমি আর তাঁহার নাগাইল পাই না।"

ব্রহ্মানন্দ আত্মাময়।

যাহাহউক এখন দেখা যাউক ব্রহ্মানন্দ কিরূপ অসাধারণ মানুষ। ব্রহ্মানন্দ তাঁর আত্মপরিচয় বিষয়ে কয়েকটী প্রার্থনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে দুইটী বিষয় সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখ করি। একটী তাঁর অধ্যাত্ম জীবন, একটী তাঁর মানবীয় জীবন। অধ্যাত্ম জীবন সম্বন্ধে তিনি বলেনঃ—"আমি কেবল আত্মা, চিন্ময় বস্তু আমি। আমি অদ্ভুত, ভৌতিকের অতীত। হে অদ্ভুত, তোমাকে বরণ করি। তুমি আমি যে অভেদ জানিতে দিয়াছ এজন্য কৃতার্থ হইলাম। সেই অদ্ভুত দেশে যেখানে সংসার নাই, পরিবার নাই, স্ত্রীপুত্র নাই সেই দেশে আছি। অকূলে অকূল। ভিতর থেকে একটা পদার্থ বাহির হইল। এমন তেজ এমন পুণ্য এই আত্মার, বড় বিক্রম, বড় ভয়ানক শক্তি তোর। এত টুকু সরিষার চেয়ে ছোট তুই। কিন্তু এত তেজ এত গন্ধ বাহির করিয়াছিস? তুমিই বস্তু। তুমিই ইহকাল পরকালে থাক। তুমি পদার্থ, শরীরটা জন্তু। আত্মার কোলে আত্মা। হে আত্মা, তুমি আমার ভিতর ঠিক হইয়া থাক। তুমি কিরণ, ভগবানের চিদাকাশে চিক্‌মিক্ কর। হে বৃহচ্চন্দ্র তুমি ক্ষুদ্র চন্দ্রকে কোলে করিয়া বোস। এই আত্মাই আমি।" ইহাই ব্রহ্মানন্দের যথার্থ পরিচয়,—তিনি কেবল শরীর নন, সূক্ষ্ম আত্মা।

মহাত্মা সেণ্ট পল বলিয়াছেন, "আমি দেখিতেছি সকল মানুষই আপন আপন শবস্কন্ধে লইয়া বেড়াইতেছে, সকল মানুষই এক এক মৃৎপিণ্ড।"

বাস্তবিক এই আত্মাবিহীন মানুষ মৃৎপিণ্ড ভিন্ন আর কিছুই নয়। ই
ভারে যে অবসন্ন সে শববাহক ভিন্ন আর কি? মানুষের মধ্যে যিনি আ
আত্মাকে চিনেন, আত্মাতেই বাস করেন, আত্মাই আমার আমি ব
পারেন তিনিই যথার্থ মানুষ। নিশ্চয় তিনি অসাধারণ মানুষ।

ব্রহ্মানন্দ এই আত্মবান বলিয়াই বলিয়াছেন "ব্রহ্মকে দেখ
আর প্রমাণ দিতে হইবেনা আমাকে দেখিলেই হইবে। এক প
দুইটী পদার্থ মিলিয়াছে।" নিত্য ব্রহ্মযোগ-যুক্ত আত্মময় মানুষ
কে আর এ কথা বলিতে পারে? ঈশা যে বলিয়াছেন I and my fa
are one "আমি ও আমার পিতা এক' তাহাও এই আত্মযো
অবস্থাতেই বলিয়াছিলেন। এই "আমি ও আমার পিতা এক" আর
আমি অভেদ" বলা একই। এবং এই আত্মিক জীবন দেখিয়াই লোকে
পুরুষদিগকে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহাই যে মা
"বড় আমি" বা উচ্চ বিভাগ তাহা ব্রহ্মানন্দ নিজ জীবনে সুস্পষ্ট
প্রতিপাদন করিয়াছেন।

ইহাকে কিন্তু ঈশ্বরত্ব না বলিয়া ঈশ্বর-পুত্রত্ব বলিলে আর
গোল থাকে না। পুত্রত্ব অর্থাৎ আত্মিক জীবন ভিতরে ল
ব্রহ্মানন্দ আপনার অসাধারণ মানবত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং এই ত
বান বা "আত্মক্রীড়ঃ আত্মরতিঃ" না হইলে যে মানুষ মানুষই হইতে
না, শরীরবান মানুষ আর পশুতে যে তফাৎ নাই ইহাই পরিষ্কা
বুঝাইয়া দিলেন।

সমস্ত জগৎ কেবল এক পেটের দায়ে উদর পোষণ করিবার নি
ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ইহা ভিন্ন মানুষের যেন আর কোন কাজই নাই। ই
যত যুদ্ধ বিগ্রহই বল, চাষ পরিশ্রমই বল, শিল্প বানিজ্যই বল সমস্তই উ

জন্য বই আর কি? আর পশুরাও যাহা কিছু করে তাহাও ত সমস্তই উদরের জন্য! তবে পশুতে আর মানুষে প্রভেদ কি? তাই শরীর ছাড়া যে অশরীরী আত্মা আছে এবং তাহাই যে আমার যথার্থ আমি, তাহাই আমার মনুষ্যত্ব ইহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে এবং শরীরের সেবাই যে মানবজীবনের একমাত্র কার্য্য নয় ইহা মনে না রাখিলে আমরা কখনই মানুষ নামে পরিচিত হইতে পারি না। ব্রহ্মানন্দ মানুষ হইয়াও আপনাকে আত্মা বলিয়া পরিচয় দিয়া মানুষের কি হওয়া উচিত তাহারই আদর্শ দেখাইয়া দিয়াছেন। তাই বলি তিনি আত্মস্থ মানুষ বা দেব-মানব, তিনি অপর সাধারণ মানুষের মত নহেন।

ব্রহ্মানন্দের মানবত্ব।

ব্রহ্মানন্দের দ্বিতীয় পরিচয় তাঁর মানবীয় বিভাগ। ইহাই তাঁহার অসাধারণ মানবত্বের বিশেষ পরিচয়। এই পরিচয় প্রদান করিতেই তাঁহার জগতে অবতরণ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মাগণ কেবল আপনাদের আত্মিক ভাব বা দেবভাবেরই বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কেহ ব্রহ্মযোগ, কেহ বা ব্রহ্মপ্রেম, কেহ বা ব্রহ্মজ্ঞান কেহ বা ব্রহ্ম-ধ্যান ইত্যাদি এক এক দেবভাবেরই পরিচয় দিয়া সরল হৃদয় শিষ্য প্রশিষ্য দিগের নিকট ঈশ্বর বলিয়া পূজিত হন। তাঁরা কেবল আপনাদের আত্মাকেই প্রতিফলিত করেন, তাই তাঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্যগণও তাঁদের আত্মা ও পরমাত্মার ভেদ দেখিতে না পাইয়া ভক্তির আতিশয্য হেতু বিহ্বলচিত্তে তাঁহাদিগীকেই স্বয়ং ভগবান ভ্রমে অবলোকন করেন।

যদিও মহর্ষি ঈশাও আপনাকে মনুষ্য-সন্তান বলিয়াই পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাহইলেও তাঁর আত্মার ভাগ এতই উজ্জ্বল আলোকে তাঁর শিষ্যেরা

দেখিলেন যে অপর দিকটা বড় তাঁহাদের দৃষ্টিতে পড়িলই না, কাজেই তাঁহাকেও তাঁহারা ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়াই সম্বোধন করিলেন।

অন্তরে খ্রীষ্ট বহির্ব্রহ্মানন্দ।

মহর্ষি ঈশাই ত মানব সন্তানত্বের আদর্শ দেখাইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ। কিন্তু তাঁর শিষ্যগণ তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিলেন বলিয়া তাঁর অবতরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইলনা। এই জন্যই বর্ত্তমান যুগে অসাধারণ মানবাকারে ব্রহ্মানন্দকে ভগবান সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রেরণ করেন। এই ব্রহ্মপুত্র ঈশার মানবত্ব দেখানই ব্রহ্মানন্দের জীবনের কার্য্য। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে যেমন তাঁর ভক্তগণ বলেন তিনি অন্তর কৃষ্ণ বহির্গৌরাঙ্গ, তেমনি ব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে তাঁর অন্তরে দেবসন্তান ঋষি খ্রীষ্ট বাহিরে মানবসন্তান ব্রহ্মানন্দ। অর্থাৎ ঈশা-বিধানের সকল ধর্ম্মভাব যথার্থ রূপে পূর্ণ করিবার জন্যই ব্রহ্মানন্দের জীবন।

ঈশা যদি ঈশ্বর হন, তিনি ঈশ্বরত্ব দেখাইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাহাতে আর মানুষের উদ্ধারেরই বা উপায় কৈ হইল? ঈশ্বর হইয়া ঈশা ত মানুষের পূজনীয় দেবতাই হইলেন, মানুষের আদর্শ তাহাতে তিনি হইলেন কৈ? মানুষই কেবল মানুষের আদর্শ হইতে পারে, কারণ মানুষ যাহা করে মানুষ তাহাই করিতে পারে, ঈশ্বর যা করেন তা আর মানুষ করিবে কি প্রকারে? তাই ঈশাকে যথার্থ চিনাইবার জন্যই ঈশাদাস হইয়া ব্রহ্মানন্দ মানবাকারে অবতীর্ণ হইলেন। মানুষ যে কিরূপে ঈশ্বর-পুত্রত্ব লাভ করিতে পারেন তাহা দেখাইবার নিমিত্তই ব্রহ্মানন্দ

জন্ম গ্রহণ করিলেন। এবং এই আদর্শ মানুষ হইয়া জগজ্জনকে ব্রহ্মপুত্রত্ব লাভের পথ দেখাইয়া দিলেন।

আদর্শ মানুষ।

ব্রহ্মানন্দের তাই যথার্থ পরিচয় তিনি আদর্শ মানুষ। তিনি আপনার ভিতর সকল মানুষকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপে গ্রহণ করিয়া এই আদর্শ-মানবত্বের প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে মহা-পুরুষগণ ব্রহ্মযোগে যোগী হইয়া ব্রহ্মের সহিত যোগসাধনতত্ত্বই প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ যেমন ব্রহ্মযোগে যোগী, তেমনি পাপী সাধু সকল মানুষের সহিতও যোগযুক্ত হইয়া আপনি মহা বিরাট পুরুষত্ব লাভ করিয়া মানব-যোগ তত্ত্বও কি তাহা প্রদর্শন করিলেন; এইজন্যই তাঁহাকে যথার্থ আদর্শ মানুষ বলা যাইতে পারে।

তিনি তাঁহার আত্ম-পরিচয়ে বলিয়াছেন:—"স্বর্গে তুমি একজন মানুষ করিয়াছিলে সেই মানুষ আমি। যখন আমি হইলাম, আমার হাত পা নাক কাণ সমুদয় হইল। যখন তুমি আমায় পৃথিবীতে আনিলে তখন আমি ছিলাম সকল অখণ্ড। ক্রমে নাক কাণ ঠোঁট সব বিদেশে গেল, শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন দিকে গেল।

"আমি বিনয় ও অহঙ্কারের সহিত বলিতেছি আমি আসিলাম অঙ্গ লইয়া, আমাকে ছাড়ুক শুকাইবে। মাধবী যাকে বৃক্ষ জড়াইয়া, বৃক্ষ ছাড়ুক তখনই শুকাইবে, কেহ বাঁচাইতে পারিবে না। ইহারা আমার যোগেতে আশ্রিত। এরাও যা আমিও তা, আমিও যা এরাও তাই। আমি আর এরা একটা। এক শরীর, এক প্রাণ কর, সকলে একখানা

মানুষ হই। একজন মানুষ, কিন্তু তার চক্ষু কর্ণ নাসিকা অ
সকলে। এক ঈশ্বর উপরে, এক সন্তান নীচে। একমেবাদ্বিতীয়
ব্রাহ্মসমাজ বলিয়াছিলেন উপরে, একমেবাদ্বিতীয়ং নববিধান বলিতেছে
পৃথিবীতে; সমুদয় মনুষ্য সমাজ এক।

"নব দুর্গার সন্তান নব মানুষ। শত শত হস্ত শত কর্ণ, শত নাসিব
শত চক্ষু, এই যে প্রকাণ্ড নবাকৃতি মানুষ, সেই আমি। আমার শরী
বিশটা প্রচারক, যিনি যেখানে যান আমি যাই। এরা এক শরীরের অঙ্গ
তুমি এক, আমরা এক।" এমন করিয়া সকল মানুষকে আপনা
যিনি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপে, গাঁথিয়া লইয়া, এক অখণ্ড-মানব হইলে
তিনি ভিন্ন যথার্থ আদর্শ মানুষ বল আর কে হইতে পারে?

অখণ্ড মানব।

পৃথিবীতে যে এই একমেবাদ্বিতীয়ং মানুষ, ইনিই আমার ব্রহ্মানন
এই মানবমণ্ডলীকে একমেবাদ্বিতীয়ং করিতেই ত ব্রহ্মানন্দে
আগমন। দার্শনিক কোমৎ যে মানবের একত্বের আভাস জ্ঞান বা কল্পনা-যে
দেখাইয়াছিলেন এবং তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যগণ যে এক মানব-মণ্ডলীর উপাস
করেন, সেই একাকার মানব মণ্ডলী ব্রহ্মানন্দেই মূর্তিমান। কোমৎ-শিষ্য
নিরীশ্বরবাদী মানব-উপাসক, ব্রহ্মানন্দ আমার জীবন্ত ঈশ্বর-বিশ্বাসী ঈশ্ব
প্রাণ অখণ্ড-মানব-সন্তান। কোমৎ শিষ্যদিগের অখণ্ড মানব পূজা কে
ভাব মাত্র, ব্রহ্মানন্দ সে ভাব নিজ জীবনে ব্যক্তিত্বে সমাধান করিয়াছে
সুতরাং তাঁহাকে গ্রহণ করিলেই মানব মণ্ডলীর একত্ব বা এক-ভ্রা
সমাহিত হইবে।

প্রাচীন বিধানে ঈশ্বরের পিতৃত্ব।

ইতিপূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে Fatherhood of God ঈশ্বরের পিতৃত্বই প্রচারিত হইয়াছে। ঈশা বা গৌরাঙ্গের ভক্তগণ যে তাঁহাদিগকে ঈশ্বর পদবাচ্য করিয়াছেন তাহাতেও কেবল ঈশ্বরের পিতৃত্বই সাব্যস্ত হইয়াছে। ঈশ্বর যে আছেন এবং তিনি যে সকল মানবের পূজনীয় পিতা, মানুষকে ঈশ্বর বলাতে ইহাই কেবল প্রমাণ হয়। পূজনীয় এক ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই, তাই যিনিই মহৎ যিনিই উচ্চ, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই ভগবান পদবাচ্য, ইহাতে ভগবানেরই মহত্ব বা যিনি ঈশ্বর তাঁরই ঈশ্বরত্ব প্রচার হইল বই আর কি। ঈশা যে বলিলেন "আমাকে প্রভু বলোনা, এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ভাল নাই।" তাঁর সে কথা কে মানিল! লোকে বলিল "তুমিই ত ঈশ্বর।"

আমাদের সমসাময়িক কালেও রামকৃষ্ণ দেবকে দেখিলাম। তিনি আমার ন্যায় অধমকেও "তুমিত সেই আচার্য্য গো" বলিয়া কতই আদর করিতেন এবং এক দিন আমাদের উপাসনার স্থানে আসিয়া তাহাতেও যোগদান করেন। আমার বাল্যবন্ধু নরেন্দ্র যিনি পরে বিবেকানন্দ হন, তাঁর গান শুনিয়া সেখানেই তিনি সমাধি মগ্ন হন। মৃত্যুকালে যিনি মুক্তকণ্ঠে আমার সম্মুখেই বলিলেন "ওরে আমি গলার ঘায়ে মরচি, আমায় তোরা ভগবান বলিস কেন? ভগবান কি গলার ঘায়ে মরে?" কিন্তু তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যগণ তাঁর ত সে কথা কেহই মানিলেন না, সেটা তাঁর মিথ্যা বিনয় মনে করিয়া তাঁরা বলিলেন, "তুমিই স্বয়ং ভগবান।" এই বলিয়া কতই তাঁর অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত কল্পনা করিলেন, কতই তাঁর অলৌকিক শক্তি উদ্ভাবনা করিলেন, শেষে তাঁর ছবিকে পর্য্যন্ত ভোগ দিয়া

পূজা করিতেছেন এবং শুনিতে পাই আমার সহযোগী বন্ধু বিবেকানন্দও নাকি সেইরূপে পূজিত হইতেছেন। এইরূপ কত মানুষই আমাদের চোখের সামনে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন। ইহাতে সকলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বই বাড়াইতেছেন বা সর্ব্বত্র যে ঈশ্বরকে দেখিতেছেন ইহাই প্রমাণ হইতেছে। ইহাতে মানবের প্রকৃত মহত্ব, মানবের দেব-ভ্রাতৃত্ব আর কিছুই প্রমাণিত হইতেছে না।

ব্রহ্মানন্দের বিশেষ কার্য্য ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা।

তাই এই মানবের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ব্রহ্মানন্দের বিশেষ কার্য্য। এক্ষণে দেখাযাক তিনি এই ভ্রাতৃত্ব কি ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাই একজন, আমিও একজন ব্যক্তি, এই স্বাতন্ত্র্য স্বীকারে প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব হয় না। মানুষ মানুষকে ভাই বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে প্রথমতঃ এক মা কি এক বাপ স্বীকার করিতে হয়। এক মা বাপের ছেলে মেয়েরাই ভাই বোন। এক মা বাপ না হইলে কেহই ভাই বোন সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইতে পারে না। নিরীশ্বরবাদী কোমৎ-শিষ্যগণ যে ভাই ভাই বলেন, অথচ এক পিতার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, ইহা তাঁহাদের গাজুয়ারী ভিন্ন কিছুই নহে, অথবা তাহা কেবল তাঁহাদের ভাব বা মত মাত্র। বাস্তবিক ইহাতে ভ্রাতৃভাব ঠিক বাঁধিতে পারে না।

ব্রহ্মপুত্র শ্রীঈশাই সকল মানুষকে এক পিতার সন্তান বলিয়া সর্ব্বপ্রথমে এই ভ্রাতৃভাবের সূত্রপাত করেন। কিন্তু এক পিতামাতার সন্তান হইলেও এক পরিবার হইলাম, এক বংশ হইলাম সত্য, তথাপি স্বাতন্ত্র্য ঘুচিল না। বস্তুতঃ আমরা যে এক এক স্বাধীন ব্যক্তি, পরস্পর হইতে বিভিন্ন, এ বিষয়ে ভুল নাই, কিন্তু এই এক একজন ভিন্ন ব্যক্তি পরস্পরের ভাই হইলেই

কি ভ্রাতৃসম্মিলন সম্যকরূপে নিশ্চয় সাধিত হইবে? কই তাহা হইলে এক মা বাপের সন্তান হইয়াও লোকে পরস্পরের সহিত এত ঝগড়া বিবাদ করে কেন? ভাই ভাইয়ের গলায় ছুরী দিতেও ত কই ছাড়ে না! ধর্ম্মমণ্ডলীর লোকেও ত পরস্পরকে ভাই বলিতেছে অথচ পরক্ষণেই পরস্পরের সহিত কত বিবাদ বিসম্বাদ করিতেছে। সুতরাং কেবল এক মা বাপের সন্তান, ইহা বলিলেও ভাই ভাইএ মিলন অবশ্যম্ভাবী হয় না। তাই ঈশা যে বলিলেন "ভাইকে আপনার ন্যায় ভালবাস" ইহাতে কুলাইল না বলিয়া ব্রহ্মানন্দ বলিলেন "ভাইকে আপনাপেক্ষা অধিক ভালবাস।"

এইজন্য ব্রহ্মানন্দ এই ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের এক নূতন পথ আবিষ্কার করিলেন। তিনি বলিলেন "ভাই ও আমি এক শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।" এই এক শরীরের অঙ্গ বলিয়া অনুভূতিই যথার্থ ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের উপায়। অঙ্গ যেমন অঙ্গের সহিত গাঁথা, তেমনি মানব মানবে পরস্পরের সহিত গাঁথা। অঙ্গ আর অঙ্গকে ছাড়িতে পারে না, অঙ্গ আর অঙ্গের সুখ দুঃখ সহ সম্ভোগ না করিয়া পারে না, অঙ্গ আর অঙ্গকে হত্যা করিতে পারে না, অতএব এই পরস্পরে এক শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিয়া উপলব্ধি করা ভিন্ন যথার্থ ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের এমন প্রকৃষ্ট পথ আর কি হইতে পারে? এই জন্যই ব্রহ্মানন্দ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, I and my brother are one "আমি আর আমার ভাই এক।" এবং অন্য স্থানে বলিলেন "আমরা একজন।"

"আমি" নয়—"আমরা"।

এই "আমরা"ই যথার্থ ব্রহ্মানন্দ জীবনের প্রকৃত ভাব। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন "সম্পাদকের ন্যায় আমি চিরদিন আমরা" Like an editor I am always we ; তিনি নিজ জীবনে নিত্যব্রহ্ম ও মানবের একত্ব যোগ অনুভব করিয়াই এই কথা বলেন। ব্রহ্ম-যোগের সহিত মানবযোগ তাঁর জীবনের চিরসাধন। এই সাধন প্রকাশ পায় যখন তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাহির হন। আদি ব্রাহ্মসমাজে যে বৈদান্তিক মন্ত্র "অসতোমাসদ্গময়," "অসত্য হইতে আমাকে সত্যেতে লইয়া যাও" উচ্চারিত হইত এবং এখনও হয়, ব্রহ্মানন্দ যখন সে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হন, তখন ঐ মন্ত্র বদলাইয়া প্রার্থনা করিলেন, "অসত্য হইতে "আমাদিগকে" সত্যেতে লইয়া যাও।" এই "আমাকে" বদলাইয়া "আমাদিগকে" করাই ব্রহ্মানন্দের জীবনের নিগূঢ় ভাব।

নববিধানে প্রতিদিনের সাধনও তাই আর আমি একা করিলে চলে না, যখনই ব্রহ্মপদে বসিব তখনই সকলকে লইয়া বসিতে হইবে। বাহিরে একাধিক লোক না পাইলেও অন্তরে সকল মানবকে লইয়া সাধন করিতে হইবে, ইহাই ব্রহ্মানন্দের শিক্ষা; নতুবা অসত্য হইতে "আমাদিগকে" সত্যেতে লইয়া যাও এ কথার সত্যতাই থাকে না। এইরূপে মানবযোগ সাধন একেবারে নিত্য সাধনের ভিতর ব্রহ্মানন্দ প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে আমিত্ব, ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্যের মূলে একেবারে কুঠারাঘাত করিয়াছেন।

ব্রহ্মপুত্র শ্রীঈশা বলিলেন I and my Father are one. "আমি এবং আমার পিতা এক।" ব্রহ্মানন্দ কেশব বলিলেন I and my brother are one "আমি এবং আমার ভ্রাতা এক" এবং ইহা দ্বারাই তিনি মানব জগতে

ভ্রাতৃযোগের মহামন্ত্র প্রবর্ত্তন করিলেন। ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার যোগস্থাপনেই ঈশার বিশেষত্ব, মানবের সহিত মানবের যোগস্থাপনই ব্রহ্মানন্দের বিশেষত্ব। অখণ্ড মাতার অখণ্ড সন্তান, ইহা প্রতিষ্ঠা করাই ব্রহ্মানন্দের বিশেষ কার্য্য। এবং ইহাতেই শ্রীঈশা প্রবর্ত্তিত বিধানেরও পূর্ণতা।

এ সম্বন্ধে ব্রহ্মানন্দের প্রার্থনা এই :—"মা তুমি সন্তান কোলে ভগবতী; তুমি বল যে যোগী সে আমাতে যোগী জীবেতে যোগী। যখন যোগে বসব তখন দেখবো সমস্ত মানব আমাতে আর আমি তোমাতে। আগে মনে করতাম তোমার পায়ে দুটো ফুল ফেলে দিলেই হলো, আদি ব্রাহ্ম সমাজে এই শিখিয়াছিলাম, এখন অনাদি ব্রাহ্মসমাজে এসে দেখি এক হয়ে যেতে হবে। তাও ভাবিলাম ভগবানের সঙ্গে এক হবো, ভালইত বড় লোক হবো। আবার তাও নয়, পাপী চণ্ডাল শত্রু মিত্র সবার সঙ্গে এক হতে হবে।"

কি মধুর এবং কি গভীর মানবযোগ! এই যোগ ভিন্ন কিছুতেই মানবের ভ্রাতৃত্ব স্থাপন হইতে পারে না। তবে এখন বেশ প্রতিপন্ন হইল যে ভাইকে স্বতন্ত্র মনে করিলে, যথার্থ ভ্রাতৃযোগ বা ভ্রাতার সহিত যোগস্থাপন হয় না। ব্রহ্মের সহিত যোগ যেমন, ভাইয়ের সহিত তেমনই যোগ সাধনই মানবের যথার্থ ভ্রাতৃত্ব সাধন এবং এই সাধনের পথ ব্রহ্মানন্দ যেমন সহজে দেখাইয়া দিলেন তেমন আর কে? এ সাধনের উপায় প্রণালী কি তাহাও তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন। তাহা কি পরে আলোচ্য। এক্ষণে তিনি যে সকল মানবকে আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া স্বয়ং এক-ভ্রাতৃত্ব-মূর্ত্তিমান অখণ্ড-মানব হইয়াছেন ইহা নিঃসন্দেহ। ইহাই তাঁহার প্রধান পরিচয়। এবং এইজন্যই তিনি বলিয়াছেন Behind this visible I there is an invisible We. "এই দৃশ্যমান আমির পশ্চাতে অদৃশ্যমান আমরা।"•

ভাই ভগ্নী।

এইখানেই বলা আবশ্যক ব্রহ্মানন্দ যে মানবের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহার মানে কেবল নরের ভ্রাতৃত্ব নয়, কিন্তু নারী-গণেরও ভগ্নীত্ব তাহাতে নিহিত। এক ঈশ্বর যদি পিতা মাতা হন, নরনারী পরস্পরে তাঁর সন্তান সন্ততি বলিয়া ভ্রাতা ভগ্নী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এই সম্বন্ধ যে অতি পবিত্র সম্বন্ধ ইহা ব্রহ্মানন্দই প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে নারীকে মাতৃভাবে দর্শনই তাঁর সম্বন্ধে পবিত্র ভাব রক্ষার উপায় এইরূপ শিক্ষা আছে। তাহাতে প্রথমতঃত ঠিক সত্য বলা হয় না; কারণ ঈশ্বরকে মাতৃভাবে দেখা যদি সমুচিত হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের অধিকার মানবে আরোপ করা কখনই উচিত নয়। মানব চিরদিনই ঈশ্বরের সন্তান, সুতরাং সন্তানের যাহা প্রাপ্য সেই মর্য্যাদাই তাহার পাওয়া উচিত, সেই জন্য নারী মাতৃপদবাচ্য না হইয়া ভগ্নীপদবাচ্য হওয়াই কি ঠিক নয়? তা ছাড়া নারীকে মাতৃ সম্বোধনে পবিত্র ভাব মনে আনা কেবল দুর্ব্বল চিত্তার পরিচায়ক মনে হয়। তাহাতে যেন ভয়ে ভয়ে নারীকে দেখা হয়। তাই নারীকে ব্রহ্মকন্যা জানিয়া ভগ্নীরূপে পবিত্র ভাবে দর্শন, ইহাই নববিধানে ব্রহ্মানন্দের নূতন শিক্ষা। এইরূপ নারী-গণও পুরুষকে ব্রহ্মপুত্ররূপে দেখিয়া ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে পবিত্রভাবে দেখিবেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে মানবের ভ্রাতৃত্ব যে প্রতিপাদন করা হইয়াছে তাহা পূর্ণই হয় না যদি নারীর ভগ্নীত্বও তাহার সহিত প্রতিষ্ঠিত না হয়, কারণ নরনারী উভয়কে লইয়াই মানব সমাজ গঠিত।

পাপী মানব।

তাঁহার তৃতীয় আত্মপরিচয়ে ব্রহ্মানন্দ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন "আমি পাপী, কিন্তু আমার জীবন দেখিলে পাপী মানুষের আশা হইবে।"

তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন "হে প্রেমস্বরূপ, আমাদের মধ্যে ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গের মত কি কেউ হয়েছে, এমন কি একজন আমাদের ভিতর হয়েছে, যার বুকে হাত দিয়ে বুঝিতে পারিবে লোকে, ইহার ভিতর চার বেদ এক হয়েছে? এ গরীব বলিতে চায়, পাপী বাঙ্গালী সিদ্ধ হইয়া আসে নাই, মহাপুরুষদের সঙ্গে কিছুতেই তুলনা হয় না, কিন্তু সে অপ্রেমিক ছিল প্রেমিক হইল, সাম্প্রদায়িক ছিল হইল সার্ব-ভৌমিক, কাল মলীন ছিল ক্রমে জ্যোতির্ময় হইল, কঠিন ছিল কোমল হইল। আমি অবিশ্বাসী পাপী অপ্রেমিক ছিলাম। পরিবর্তিত পাপী এই বিধানে কেবল দেখা যায়, অন্য বিধানে তা হয় না। সকলকে সুধাও আমাপেক্ষা বড় পাপ আর কে? তবু আমায় এ পথে তিনি আনিতে পারেন। আমার জীবনে যেমন নববিধানের বিরোধ ছিল এমন আর কার জীবনে আছে? আমার জীবনের পরিবর্তন, সকলের পক্ষে আশা-প্রদ, আমি নিশ্চয় বলছি বিপদ অন্ধকারে কেশবচন্দ্র চন্দ্র হবে। পাপীর উদ্ধার হইতে পারে তা যদি দেখিতে চাও বন্ধুগণ, এই ব্যক্তিকে সঙ্গে লও।

অতএবের বন্ধু কয়জন, একটী বন্ধু একা আসে নিয়ে যাচ্ছি। যখন ফিরে পাবে একটী মিঠাইয়ের দানা আমাকে দাও। সর্বজনীন নববিধানের দৃষ্টান্ত দেখাতে চাই। আমি কেবল মেঠাইর চেষ্টায় আছি।

স্বদেশ বিদেশকে, হিন্দু মুসলমানকে, সকল ধর্ম্মকে মিলাইতে চাই। আমি এই একটী আশার কথা বলিতে চাই যে একটী খুব পাপী ছিল মার প্রসাদে তার জীবনে খুব পরিবর্ত্তন হয়েছে, একটী কাল ছেলে সুন্দর হয়েছে।"

কেশবচন্দ্র যে পাপী জগতের আশাচন্দ্র তাহা এই প্রার্থনায় তিনি নির্ভয়ে এবং স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অপর স্থলে বলিয়াছেন "আমার মত মানুষ কাছে আসিলনা বলিয়া আমি পারিলাম না [illegible]। আমার মত পাপী আসিলে তাহাদের লইয়া আমি কাজ করিতে পারিতাম।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেবতা কখনই মনুষ্যের আদর্শ হইতে পারে না। মানুষই মানুষের যথার্থ আদর্শ হইতে পারে। আবার যিনি আপনাকে পাপী বলিয়া স্বীকার করেন এবং নিজ জীবনের পরিবর্ত্তন দেখান তিনিই যে মানবের যথার্থ আদর্শ হন তাহাতে আর সন্দেহ কি? ব্রহ্মানন্দ এই আদর্শ দেখাইবার নিমিত্তই প্রেরিত।

তিনি বলিলেন "আমি একটী কাল ছেলে যার কাছে জোড়া বসিছি।" ইহা দেখিলে আর সকল কাল ছেলেরাও যেমন উৎসাহ হইবে এমন কি আর কিছুতে হইতে পারে? সুন্দর সাধু যিনি, তাঁকে দেখে যা আশা করিবেন, কিন্তু যার প্রসাদে একজন কাল সুন্দর হইল, [illegible] শুচি হইল, ইহা অপেক্ষা পাপী জগতের পক্ষে আশার কথা আর কি হইতে পারে। তাই ব্রহ্মানন্দের জীবন এই জন্যই [illegible] [illegible] আশার জীবন।

তাঁহার অন্য [illegible] সকল কথাই প্রসিদ্ধ, পাপী আমাদের যে [illegible] যা [illegible] নাই, ব্রহ্মানন্দ ইহা যে উপলব্ধি করিয়াছেন, উপরোক্ত [illegible] তাহাই পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি আমাদের সকল মানব প্রকৃতি

ঘাড়ে স্বীকার করিলেন [illegible] পাপীদের সহিত [illegible] হইলে তাহাদের পাপেরও যে ভার বহিতে হয় ইহাও দেখাইলেন। সুতরাং তিনি পাপী মানব জাতিকে আপন করে গাঁথিয়া [illegible] যোগে তাহার পাপকেও আপনার বলিয়া স্বীকার করিলেন।

এই পাপ বোধই মানবের ধর্মজীবনের আরম্ভ। আমি পাপী এই বোধ না হইলে পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী হওয়া হয় না। পাপবোধ হইলেই পরিত্রাণের পথ খুলিয়া যায়। ছেলে যেমন ক্ষুধা পাইলেই কাঁদে এবং কাঁদিলেই মা তাহাকে খাবার দিয়া তার ক্ষুধা নিবারণ করেন। পাপী মানবের তেমনি পাপের জ্বালা অনুভব হইলেই তার প্রাণ প্রার্থনাশীল হয় এবং মাকে অনুসন্ধান করে আর মাও পাপী সন্তানের সে জ্বালা নিবারণ করেন। পাপের জ্বালা অনুভব হইলেই পাপ বোধ হয় এবং দীনতা আসে এবং তাহা হইতেই ব্রহ্মকৃপায় সমুদয় নিরানন্দ নিরাকরণ হয় ও ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ হয়।

শ্রীব্রহ্মানন্দও এইরূপে আপনাকে পাপী বলিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিলেন, তাই তিনি নিজ জীবনে নববিধান ধর্ম প্রতিফলিত করিয়া তদ্বারা পাপী জগতের পরিত্রাণের উপায় উদ্ভাবন করিলেন। যেমন সূর্য্যের আলো যদি স্বচ্ছ কাচে প্রতিবিম্বিত হয়, যেখানে সূর্য্যালোক যায় না এমন কি সূর্য্যের বিপরীত দিকেও তাহা প্রতিফলিত হইয়া আলোকিত করে, তেমনি [illegible] পাপী [illegible] তিনি [illegible] তাদৃশ [illegible] [illegible]

জীবনের আখ্যায়িকা।

তিনি যে আপনার দীনতা কেবল মতে প্রকাশ করিয়াছেন, তা নয়, কার্য্যতঃ সমস্ত জীবন ভরিয়া তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি আপনাকে "দীন জাতি" বলিয়া মনে করিতেন, তাই শাকান্নেই সর্ব্বদা তুষ্ট থাকিতেন এবং সকল খাদ্যের মধ্যে শাক মুড়ি ইত্যাদিরই অধিক আদর করিতেন ও তাহাই খাইতে ভাল বাসিতেন; অথচ আহারে তাঁর কিছুই আসক্তি ছিল না। নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে যিনি যাহা কিছু দিতেন তাই আদরপূর্ব্বক আহার করিতেন, আহারীয় দ্রব্য খারাপ হইলেও তাহা নিমন্ত্রণ কর্ত্তাকে জানিতে দিতেন না, পাছে তাঁর মনে কোনরূপ কষ্ট হয়; এই কারণে একবার একজন তাঁহাকে পেঁয়াজের খিচুড়ি রাঁধিয়া দেন, যদিও পেঁয়াজ তাঁর পক্ষে অত্যন্ত দুর্গন্ধজনক তথাপি তিনি তখনি নিমন্ত্রণকারীকে সন্তুষ্ট করিতে অম্লান বদনে তাহা আহার করেন।

আর একবার একজন অনেক কষ্টে সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দুধ আনিয়া দেন, দুধে একটী প্রদীপের পোড়া সলিতা পড়িয়া যায়; সে দুধ তিনি ফেলিয়া না দিয়া অনায়াসে পান করেন একবার একজন পরমান্ন খাইতে দেন; কিন্তু পরমান্ন এমনি ধরিয়া যায় যে কেহ তাহা মুখে করিতে পারেন নাই, তিনি কিন্তু অম্লান বদনে তাহা আহার করেন। একবার এক বাড়ীতে আহার করিতে করিতে দেখিলেন শাকে একগাছি ছেঁড়া চুল জড়াইয়া রহিয়াছে, শাক টুকু না ফেলিয়া ধৈর্য্য সহকারে অনেক কষ্ট করিয়া চুলটী খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া তাহাই আহার করেন।

তিনি রাজরাজেশ্বরী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দীনভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁকে অভিবাদন করেন। লাট সাহেবের বাড়ীতে কিম্বা কোন রাজদরবারে গিয়া প্রায়ই দীনের ভাবে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, লাট সাহেব বা উচ্চ রাজকর্মচারীরা খুঁজিয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করিতেন। লাট সাহেবের প্রাসাদ থেকে ফিরিয়া আসিয়াই একবার এক গরীব বৈষ্ণবের কুটীরে যান। একবার একস্থানে বড় বড় সাহেবদের সহিত আলোচনাদি করিয়া আসিয়াই খালী পায়ে সেই বাড়ীতে দীনের বেশে কীর্ত্তন করিতে যান।

একবার এক ধনাঢ্য ব্যক্তির নিজ বাড়ীতে তাঁকে এক পালঙ্কোপরি দুগ্ধ-ফেন শয্যায় শয়ন করিতে দেন এবং তাঁর সঙ্গীদিগকে অপর একটী ঘরে শয়ন করিতে দেওয়া হয়। তিনি কতক রাত্রে উঠিয়া আসিয়া দেখিলেন সঙ্গীদের মধ্যে একজন গৃহস্থ সহচর জাগিয়া রহিয়াছেন আর সকলে নিদ্রিত হইয়াছেন, জাগ্রত সহচরকে তিনি বলিলেন "তোমার ঘুম হচ্ছে না বুঝি, প্রচারক না হলে যেখানে সেখানে পড়লেই ঘুম আর কারো হয় না, আমারও তেমন ঘুম হচ্ছে না, তোমার জায়গাটুকু আমায় দেবে আর আমার জায়গায় তুমি শোবে?" এই বলিয়া নিজ পালঙ্ক শয্যায় সহচরকে শয়ন করিতে দিয়া সকলের সঙ্গে আপনি তাঁর জায়গায় শয়ন করিলেন কোন রাজপ্রাসাদেও তাঁর সেইরূপ পৃথক শয্যা করিয়া দিলে তিনি সে শয্যা ত্যাগ করিয়া বন্ধুদের সঙ্গে আসিয়া এক শয্যায় শয়ন করেন।

একবার বন্ধুদের সঙ্গে প্রচার করিতে গিয়া পথে রেল গাড়ীতে আহারে পৃথক পাত্র না থাকায় এক পাত্রেই তাঁহাদের সঙ্গে আহার করিতেন এবং একদিন একটু তাঁর অসুখ বোধ করাতে তাঁকে

সঙ্গে আহার করিতে না পারিয়া, তাঁহারা আহার করিলে সেই পাত্রে তাঁহা-দের আহারের অবশিষ্ট অন্ন অনায়াসে আহার করেন।

তিনি রেলে তৃতীয় শ্রেণীতেই সর্ব্বত্র গতিবিধি করিতেন। একবার তিনি রাত্রে এক তৃতীয় শ্রেণীর বেঞ্চের এক ধারে শুইয়া আছেন এমন সময়ে একজনের পা তাঁর মাথায় বার বার লাগিতে লাগিল, তিনি যত সরিতে লাগিলেন ততই সেই পা তাঁর উপর প্রসারিত হইয়া ক্রমে সমস্ত রাত্রিই তাহা প্রসারিত রহিল। সেই পদাঘাত সহ্য করিয়া তিনি কোন প্রকারে এক কোণে পড়িয়া রহিলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখেন যাঁর পায়ের লাথি খাইয়া তাঁর রাত্রি কাটিয়াছে, তিনি তাঁর জামাতা মহারাজা কোচবেহারের সহিস!

এইরূপ কতই যে তাঁহার আত্মত্যাগ ও দীনতার আখ্যায়িকা আছে তাঁহার ইয়ত্তা নাই। যাহাহউক এই চরিত্র বলেই তিনি মানবের আদর্শ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন।

এক মানবাদর্শ।

বাস্তবিক এক এক ধর্ম্মের এক এক ভক্ত আছেন। এক এক ধর্ম্মের এক এক আদর্শ আছেন। এক একজন, কেহ যোগ, কেহ ভক্তি, কেহ বৈরাগ্য, কেহ জ্ঞান, কেহ বিজ্ঞান, কেহ দর্শন, কেহ সংসার, কেহ রাজনীতি, কেহ ধর্ম্মনীতি, কেহ সমাজনীতি, কেহ কিছু, কেহ কিছুতে উৎকর্ষ লাভ করিয়া সেই সেই বিষয়ে বা সাধন বা ধর্ম্মে আদর্শস্থানীয় হইয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু এ সকলকে একত্র লইয়া জীবনস্থ করিয়া একাধারে ঈশা মুশা, গৌরাঙ্গ হইতে নিকৃষ্টতম মানব পর্য্যন্ত আপনার ভিতর

যিনি গ্রহণ করিয়াছেন তিনিইত নিশ্চয় সকলকার আদর্শ। তাই নববিধানের সর্ব্ব সম্মিলন মূর্ত্তিমান হইয়া ব্রহ্মানন্দ যে এই এক মানবাদর্শ হইলেন তাহাতে আর সন্দেহ কি?

তাঁর নিজ জীবন সম্বন্ধে তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন—"আমি সকলকার কাছে সকল রকম। আমাকে খৃষ্টান বলেন তুমি একজন খৃষ্টান, তুমি স্বর্গ রাজ্য থেকে দূরে নও। হিন্দু বলেন তুমিই খাঁটি হিন্দু, তোমার ভিতর ঋষিগণ আছেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলেন তুমিত আমাদেরই একজন, তোমার মুখে নির্ব্বাণ প্রতিভাত হইতেছে। য়িহুদি বলেন তুমি একজন আসল একেশ্বরবাদী এবং খাঁটী য়িহুদি, জিহোবাই তোমার ঈশ্বর। মুসলমান বলেন তোমাকে আমরা ইসলাম বিশ্বাসী বলিয়া স্বীকার করি এবং তুমি আমাদের প্যাগম্বরের অনুচর। যোগী বলেন, তুমি একজন মহাযোগী, যোগেই তুমি সদা মগ্ন। ভক্ত বলেন, তুমিত ভক্তিতে একজন আসল বৈষ্ণব, তুমি হরি প্রেমে মাতোয়ারা। জ্ঞানী বলেন তোমার জ্ঞান খুব গভীর এবং দার্শনিকদিগের মধ্যে তোমাকে উচ্চস্থান দেওয়া যায়। কর্ম্মী বলেন নিশ্চয়ই তুমি কর্ম্মী এবং সেবকদিগের মধ্যে একজন, এবং দয়াতে তুমি অক্লান্ত ও পরসেবায় সদাই তৎপর। বৈরাগী বলেন তুমি আত্মত্যাগী বৈরাগী ভিন্ন আর কিছু নও, তোমার জীবন দেখিয়া তোমাকে একজন ফকীর বলিয়া বিবেচিত হয়। এইরূপে সকলেই আমাকে তাঁদের একজন বলিয়া মনে করেন, ধন্য নববিধান।" "আমি আমার ঈশ্বরকে দেখিয়াছি ও তাঁহার বাণী শুনিয়াছি এবং তাঁহাতেই আমি আনন্দিত।" যদিও নববিধানের আদর্শ চরিত্র বলিতে গিয়া তিনি এইরূপ বলিয়াছেন কিন্তু বস্তুতঃ তিনি ইহাতে আপনারই জীবন চরিত্রের কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

এক্ষণে এমন সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ চরিত্র যদি সকল মানুষের আদর্শ না হয় তাহা হইলে আর কে আদর্শ হইতে পারে? এক চরিত্রে যেখানে সব, একজনের কাছে গেলে যেখানে সকলকার ক্ষুধা মেটে, এমন এক ব্যক্তি ভিন্ন সকলকার এক আদর্শ কিরূপে হইবে? স্বর্গে এক ভগবানের কাছে সকলকার সব পাই, কিন্তু পৃথিবীতে এক মানবের কাছে সব না পাইলে ত আর তাঁকে সকল মানবের আদর্শ বলা যাইতে পারে না। এক ব্রহ্মানন্দই তাই সেই মানবাদর্শ।

প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে মানুষ ঈশ্বরের আদর্শ বা প্রতিকৃতিতে গঠিত সুতরাং ঈশ্বরের প্রতিকৃতিতে গঠিত মানুষই আদর্শ মানুষ। শ্রীব্রহ্মানন্দ একস্থানে বলিয়াছেন "ঈশ্বর কেবল ঈশ্বরত্বেরই দৃষ্টান্ত হইতে পারেন। ঈশ্বরকে কি করিয়া ভক্তি করিতে হয় তার দৃষ্টান্ত ঈশ্বর হইতে পারেন না। মাতৃভক্তি শিখাইতে হইলে পুত্র চাই"। বাস্তবিক মানবের আদর্শ মানব বিনা আর কে হইতে পারে। এখানে আদর্শ মানে যাহা আমি তুমি অনুসরণ করিতে পারি। ব্রহ্মানন্দের চরিত্র সর্ব্বসাধারণ মানবেরই আদর্শ, কেন না তিনি আপনাকে পাপী মানব বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যদি আপনাকে ভক্ত বলিতেন, কি মহাপুরুষ বলিতেন তাহা হইলেও হয়ত পাপী মানুষের নাগাইলের অতীত হইয়া যাইতেন। তাই পাপী মানুষ যে আদর্শ অবলম্বনে পাপ মুক্ত হইয়া ব্রহ্মেতে আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারে তারই উপায় ব্রহ্মানন্দ করিয়াছেন। তিনি আপনাকে পাপী মানুষ বলিয়া পরিচয় না দিলে কখনই সর্ব্বমানবের আদর্শ হইতে পারিতেন না।

তিনি আবার আদর্শরূপে যদি স্বতন্ত্র একজন হইতেন তাহা হইলেও তাঁহার আদর্শ তত আশাপ্রদ হইত না। তিনি আপনাকে সকল মানবে

বিলীন করিয়া দিয়া এবং সকলকার "আমি" আত্মস্থ করিয়া লইয়াই বলিয়াছেন " আমি এঁরা একজন।" ইহাতে তিনি প্রত্যেক মানবের সহিত এমন আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছেন যে প্রত্যেকে তাঁহাকেই আমার আমি বলিতে পারেন, এবং তাঁহার সহিত সকল মানবকে আত্মস্থ করিয়া এক মানব হইতে পারেন ; এইরূপে তিনি এক নূতন প্রকারের মানবাদর্শ হইয়াছেন। তাঁহাকে কেবল আদর্শ বলিলেও তিনি স্বতন্ত্র থাকিতেন, ও তাহাতে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করা সাধন সাপেক্ষ থাকিত, তাই তিনি এই অতি সহজ আত্মযোগের পথ দেখাইয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ আমাকেও তাঁর আত্মার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন ইহা প্রকৃতরূপে কেবল বিশ্বাস করিলেই আমি তাঁর ব্রহ্মানন্দত্বের অধিকারী হই এবং তাঁহার যে অধ্যাত্ম সম্ভোগ তাহারও অংশ পাই। কি সহজ এবং কি নূতন বিধান!

সংসার ধর্ম্ম।

তাঁর ধর্ম্ম তাই সকলকার উপযোগী সহজ সাধারণ ধর্ম্ম। তাঁর ধর্ম্ম সংসার ধর্ম্ম। সংসারে থাকিয়া পাপী মানুষ কি করিয়া ধর্ম্ম সাধন করিতে পারে এবং কি করিয়া ব্রহ্মানন্দলাভ করিতে পারে ইহাই দেখাইতে তিনি অতি সহজ বিধান নিজ জীবনে প্রচার করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে সংসার ত্যাগ না করিলে ধর্ম্ম হয় না। কিন্তু নববিধানে ব্রহ্মানন্দ সকল অবস্থাতেই ধর্ম্ম, সকল কার্য্যেই ধর্ম্ম, সকল বিষয়েই ধর্ম্ম ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া জগতের এক মহা নূতন পরিত্রাণের পথ আবিষ্কার করিয়া দিয়াছে। তিনি প্রার্থনায় বলিলেন " আমরা ঘর ছাড়িয়া শ্মশানে যাব না, যাব কোথায় ? ঘর পাব, সংসার পাব, সুখী হব।

মা, তুমি কেবল আমাদিগকে নবজীবন দিয়ে জীবিত কর। তখন আর সংসার ছুঁতে হবে না, যে বস্তু ছোঁব সে তোমার; এ বিধানে একটী খড়কে ব্রহ্মময়। তোমার স্পর্শে সব শুদ্ধ। কি সে জীবন তা পৃথিবী এখনও দেখে নাই। যেখানে হাঁড়ীর ভিতর ব্রহ্ম যেখানে তেল ঘি পর্য্যন্ত ব্রহ্মময়। আমরা ভাত ডাল হইতে তোমাকে তাড়াইয়া দিয়াছি। প্রাতঃকাল থেকে রাত্রিতে শোবার সময় পর্য্যন্ত যা কিছু সব যে ব্রহ্মময়।"

এই নববিধানের সংসার, ইহাই ব্রহ্মানন্দের সংসার-যোগ ধর্ম্ম। ইহাতে ব্রহ্মানন্দ দেখাইলেন সংসারেতেই পূর্ণ যোগ হয়, তাহাতে কিছুই ত্যাগ করিতে হয় না। কেবল আত্মত্যাগ আমিত্ব-ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের সংসার বলিয়া সংসার করিলেই এই সংসার-যোগ সাধন করিতে পারা যায়।

আমরা সংসার করি, স্ত্রী পুত্র পরিবারের সেবা করি, সংসারের সুখের জন্ত, আমরা সব কাজ কর্ম্ম করি, টাকা উপার্জ্জনের জন্ত, দেশ হিতকর কার্য্য করি, মান সম্ভ্রম পাইবার জন্ত কিন্তু সংসারের এ সকল নীচ উদ্দেশ্য ছাড়িয়া সকলই ভগবানের গৌরবার্থে পরিত্রাণের আকাঙ্খায় যদি করি তাহা হইলে সংসারই ধর্ম্ম হয়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মাচার্য্যগণ সংসার ত্যাগী হইয়া কেবল নিজ নিজ আত্মা বা আপনাদের দেবার্দ্ধ বিকশিত করেন, তাহাতে তাঁদের মানবীয় বা সংসারের দিকটা অপূর্ণই রাখিয়া যান। কিন্তু ইহাতে ত পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় নাই। সংসার ধর্ম্ম সাধন দ্বারায় ভাগবতী তনুলাভ করিয়া যে সশরীরে স্বর্গ ভোগ করিতে হইবে বা পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য দেখাইতে হইবে তাহা তাঁহারা তেমন দেখাইয়া যান নাই। ব্রহ্মানন্দ তাই সংসার ধর্ম্ম মিলাইয়া সেই অপূর্ণ মানবত্বের পূর্ণতা বিধান করিলেন এবং পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য কি তাহাই দেখাইলেন।

সংসারে আমিত্ব-ত্যাগ।

ব্রহ্মানন্দ তাই আপনাকে সংসারী বলিয়াই পরিচয় দিতেন। গৃহস্থ বৈরাগী ব্রতধারী সাধক দিগকে ব্রত দিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন "ইহাই আমার জীবনের ব্রত, আমার ব্রতই তোমাদিগকে দিতেছি।" বাস্তবিক সংসারী লোকের যাহা কিছু কার্য্য কিছুই তিনি ত্যাগ করেন নাই। এমন কি গোঁফ ছাঁটা, চুল কাটা, সাবান মাখা পর্য্যন্ত সমস্তই তিনি ধর্ম্ম কার্য্য বলিয়া সম্পাদন করিতেন। পারিবারিক সম্বন্ধও তিনি কিছুই ছাড়েন নাই। যখন তিনি পবিত্র উদ্বাহ ব্রত লইয়া স্ত্রীর সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধ বিশেষ ভাবে সংস্থাপন করিলেন, তখন কোন প্রেরিত স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক নীচ ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিলে, তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন, "তবে কি আমি এতদিন বদমাইসী করিতে ছিলাম?" তিনি যোগশিক্ষার্থীকে উপদেশকালে বলিয়াছেন 'যোগীর কাছে স্ত্রী আসিবে, তার পুত্রাদিও হইবে, গৃহধর্ম্ম পালন করিবে, সমুদয় যোগী ভাবে, অর্থাৎ কিছু নাই এই ভাবে।" ব্রহ্মানন্দের ধর্ম্মের ইহাই বিশেষত্ব। সংসার ত্যাগ বা সংসারের কোন সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম করা তাঁর ধর্ম্ম নহে। তাঁর ত্যাগ কেবল আমিত্ব-ত্যাগ।

এখানে ব্রহ্মানন্দ কিরূপ আমিত্ব ত্যাগী ছিলেন তাহার একটী আখ্যায়িকা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। একবার তাঁর কমল কুটীরে নববৃন্দাবন অভিনয়ে অনেক বড় বড় লোক নিমন্ত্রিত হন। যদিও টিকিট দিয়া সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয়, অনিমন্ত্রিত বহুসংখ্যক লোক আসিয়া নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া ফেলে এবং নিমন্ত্রিত অনেক বড় বড় লোককেও হয় দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় নয় স্থানাভাব বশতঃ চলিয়া যাইতে হয়, এই দেখিয়া

কোন প্রচারক মহাশয় তাঁকে বলিলেন "এবার ভাল করে পুলিষের বন্দোবস্ত না কল্লে হবে না, বাজে লোক না আস্‌তে পারে এরূপ কত্তে হবে।" ব্রহ্মানন্দ তাহা শুনিয়া বলিলেন "হাঁ তা বটে, কিন্তু তারা যদি প্রাচীর টপ্‌কে আসে!" প্রচারক বল্লেন "তাহলে তাদের পুলিষে দেওয়া হবে।" তাতে তিনি বল্লেন "কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা যদি বলে এ তাদেরই বাড়ী তখন কি করবে?" প্রচারক মহাশয় নিরুত্তর। ব্রহ্মানন্দ সত্যই আপনার বাড়ীকেও আপনার মনে করিতেন না, সর্ব্বসাধারণের মনে করিতেন। এইরূপ আমিত্ব-ত্যাগী হইয়া আসক্তি ও বিরক্তি বিরহিত চিত্তে ঈশ্বরের গৌরবার্থে সংসার করা ইহাই তাঁর ধর্ম্মের মূল শিক্ষা।

ত্যাগের ধর্ম্ম ব্রহ্মানন্দের ধর্ম্ম নহে। তাঁর ধর্ম্ম গ্রহণের ধর্ম্ম। সংসারের যাবতীয় পদার্থ, যাহা কিছু অবস্থা, সব ব্রহ্মময় ইহা দর্শনই তাঁর ধর্ম্ম। স্বামী স্ত্রী পরস্পরের ভিতর ব্রহ্মকেই দেখিবেন। খড়কেটীকেও ব্রহ্মময় দেখিতে হইবে এই ত তাঁর শিক্ষা। এই দেখিয়াই তিনি সংসারী মানবের উপযোগী সহজ বিধান নববিধান ঘোষণা করিলেন।

প্রাচীনকালে একমাত্র জনক ঋষির সম্বন্ধেই শুনা যায় যে তিনি এইরূপ সংসারে থাকিয়া যোগধর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা কতদূর ঐতিহাসিক সত্য তাহা বলা যায় না। যাহাহউক বর্ত্তমান যুগে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার ভিতর যে সংসারের বিভিন্ন প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যেও উক্ত যোগধর্ম্মসাধন সম্ভব তাহা ব্রহ্মানন্দ কার্য্যতঃ নিজ জীবন দ্বারায় প্রমাণ করিয়াছেন। জনক রাজা ছিলেন, ব্রহ্মানন্দও ধনীর সন্তান। তিনি নিজ "জীবনবেদে" বলিয়াছেন "ধনাঢ্য পিতা, পিতামহের দ্বারা পালিত ও বাহ্যিক ঐশর্য্য সম্পদে বেষ্টিত হইয়াও মন স্বাভাবিক দৈন্যের পরিচয় দিতে লাগিল। প্রাণেশ্বর ধনীর ঘরে জন্ম দিলেন;

ঘনীভূত স্নেহ অন্তরে, দরিদ্রের প্রকাণ্ড সংসার চক্ষের সম্মুখে রাখিলেন। এই বিজাতীয় ভাবের মধ্যে থাকিয়া ধনীরও পক্ষপাতী হইলাম দুঃখীরও পক্ষপাতী হইলাম, সকল প্রভেদ ভুলিলাম। বর্ণভেদ জাতিভেদ ভুলিয়া সকলকেই প্রেম দিলাম।" তিনি ধনী হইয়াও দীন হইলেন, তাই ধনী দরিদ্র সকলকেই সমভাবে আদর করিলেন। ধনীকেও নববিধানে আনিলেন এবং দীনকেও আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া আনয়ন করিলেন। "সকলেই আসিয়া নববিধানের ঘর পূর্ণ করিতেছেন।"

ব্রহ্মানন্দ চরিত্রই নববিধান।

ব্রহ্মানন্দ চরিত্রও যা নববিধান ধর্ম্মও তা। এক্ষণে নববিধান ধর্ম্ম কি তাই কিছু বলা আবশ্যক। নববিধান কি এক কথায় বলিতে হইলে এই বলা যায় যে, সকল ধর্ম্ম, সকল কর্ম্ম, সকল শাস্ত্র, সকল সাধন, সকল বিজ্ঞান, সকল দর্শন, সকল ভক্ত, সকল মানব, এমন কি স্বর্গ ও পৃথিবীর অথবা পবিত্রাত্মা-যোগে মাতা সন্তানের যাহাতে মিলন সম্পাদন হইয়াছে তাহাই নববিধান। ব্রহ্মানন্দ চরিত্রে এই মহামিলনের নূতন বিধান উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। তাই আমার ব্রহ্মানন্দই মূর্ত্তিমান নববিধান।

ধর্ম্ম যদি না চরিত্রে জীবনে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিফলিত ও প্রদর্শিত হয় তাহা কেবল মত, ভাব বা কথামাত্র। তাই নববিধানের সমুদয় তত্ত্ব ব্রহ্মানন্দ নিজ জীবনে প্রমাণিত করিয়া স্বয়ং নববিধান মূর্ত্তিমান হইয়াছেন। নববিধানের জীবন্ত পরিচয় এই ব্রহ্মানন্দ জীবন। ব্রহ্মানন্দ-কেই ব্যক্তিরূপে নববিধান অবতারণা করিয়া ভগবান প্রেরণ করিয়াছেন।

নববিধানের মতসার।

এক ব্রহ্ম, এক শাস্ত্র, একই মণ্ডলী; আত্মার অনন্তোন্নতি; সাধুভক্ত সমাগম; ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব; মানবের ভ্রাতৃত্ব ও ভগ্নীত্ব; জ্ঞান, পুণ্য, প্রেম কর্ম্ম, যোগ বৈরাগ্যের পূর্ণতার সমন্বয় এবং রাজভক্তি," ইহাই নববিধানের সার মত।

নববিধানের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ব্রহ্মানন্দ নিজ মুখে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই ইহার তত্ত্ব কতক বুঝা যাইবে। তিনি বলেন :—" এখন গগনে সার্ব্বভৌমিক নববিধানের নিশান উড়িল। নববিধানানুসারে যেমন বেদ বেদান্ত পবিত্র তেমনি বাইবেল কোরাণ ও বৌদ্ধশাস্ত্রও পবিত্র। নববিধান পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মকে আপনার ভিতরে বিলীন করিলেন। ইনি সমুদয় ধর্ম্ম হইতে ঈশ্বরের সম্পত্তি আপনার অধিকার বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আদিম অবস্থা হইতে পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত যত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, নববিধান সমুদয় হইতে সার ব্রহ্মতত্ত্ব গ্রহণ করিতে লাগিলেন। নববিধান ইহকাল পরকাল, এবং সমস্ত স্বর্গ মর্ত্ত্য আলিঙ্গন করিয়াছেন। এখনকার বেদ সত্য, নববিধান মতে সত্যই বেদ, সুতরাং সত্যের অন্ত নাই। পূর্ব্বে দশ অবতার ছিল, এখন অপরাপর ধর্ম্মের সমুদয় অবতারও ঐ দলে সন্নিবিষ্ট হইল। নববিধানের সকলই অসীম। ইহাতে কিছুই সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক নাই। যখন বেদ বাইবেল ছিলনা, তখনও নববিধান ছিল এবং যখন বেদ বেদান্ত কিছুই থাকিবে না, যখন সমস্ত পৃথিবী চলিয়া যাইবে তখনও ইহা থাকিবে।

"পৃথিবীর সকল বিধান যাহার মধ্যে নিহিত তাহাই নববিধান। ইহা একটী বিধান, সুতরাং ইহার সঙ্গে অন্যান্য বিধানের সাদৃশ্য আছে। ইহা নূতন বিধান, সুতরাং অপরাপর সমুদয় বিধান হইতে ইহা বিভিন্ন। নববিধান কিছুই ভাঙ্গিতে আসেন নাই। ইনি সমুদয় ধর্ম্মবিধান পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। ইহাঁর নিকটে কোন ধর্ম্মাবলম্বী এবং কোন জাতি অপদস্থ বা উপেক্ষিত হইবে না। যাহার যে অভাব তাহা ইনি পূর্ণ করিবেন। বস্তুবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, রাজ্যবিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞান, সকল প্রকার বিজ্ঞান নববিধানের অন্তর্গত। ইনি যোগ ভক্তি, জ্ঞান, সেবা, ফকীরি, বৈরাগ্য প্রভৃতি ধর্ম্মের সমুদয় অঙ্গকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করেন। নববিধান সজন, নির্জ্জন, পারিবারিক সামাজিক, সকল প্রকার সাধন ভজনের প্রতি অনুরাগী। ইনি ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, সাধু, অসাধু, অসভ্য, সুসভ্য, সকলকেই আপনার আশ্রয় দেন। ইনি ঈশ্বর, পরলোক, বিবেক প্রভৃতি ধর্ম্ম বিজ্ঞানের যত গূঢ় সত্য আছে সমুদয় স্বীকার করেন। নববিধান বিজ্ঞানের ধর্ম্ম, ইহাঁর মধ্যে কোন প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার অথবা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কোন মত স্থান পাইতে পারে না।

"হে নববিধান, তুমি অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মবিধানের চাবি। নববিধান সমুদয় ধর্ম্মের সার লইয়া জগৎকে প্রকৃত ধর্ম্মবিজ্ঞানের সামঞ্জস্য ও মিলন বুঝাইয়া দিবেন। ইনি সকল শাস্ত্রকে এক মীমাংসা শাস্ত্রে পরিণত করিবেন। ইনি পৃথিবীর সমুদয় মহাপুরুষ এবং ভক্ত যোগীদিগকে এক আসনে আদর করিয়া বসাইবেন। সকলেই নববিধানের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া ইহাঁকে এক দিন প্রণাম করিবে।

"নববিধান, ভগবান তোমাকে যথাসময়ে পাঠাইলেন। তোমার আগমনে পৃথিবীর আশা ও আনন্দ হইল। তোমার প্রভাবে পৃথিবীর চারিদিক হইতে দলে দলে লোক আসিয়া পরস্পরের হস্ত ধারণ করিতে লাগিলেন। জয় নববিধানের জয়, জয় নববিধানের জয়।"

মাতৃত্ব।

এই নববিধানের নবতত্ত্ব বিষয়ে এখন দুএকটী কথা বলিতে চাই। নববিধানের প্রধান তত্ত্ব—মাতৃত্ব। মহর্ষি ঈশা ঈশ্বরের পিতৃত্ব ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরের একভাব মাত্র ব্যক্ত হইয়াছে। ঈশ্বর কেবল আমাদের পিতা বলিলে সম্যক বলা হইল না, তিনি পিতা মাতা দুই। বরং পিতা অপেক্ষা মাতার সহিত সন্তানের সম্বন্ধ যে অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও নিকট ইহা বলা বাহুল্য; তাই ব্রহ্মানন্দ ঈশ্বরে মাতৃত্ব আরোপ করিয়া এক নূতন সত্য জগতে প্রচার করিলেন।

অধিক কি, এই নববিধানে ব্রহ্মানন্দ প্রাচীন ধর্ম্মের শাস্ত্রই একেবারে উল্টাইয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে এক নূতন ধর্ম্ম শাস্ত্র ধর্ম্মবিজ্ঞান আবিষ্কার করিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্ম বিধানে মানুষ পুরুষকার বা সাধন বলে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইয়া ইহলোকে বা পরলোকে তাহার ফল পাইবে, এই সংস্কারেই ধর্ম্ম ক্রীয়াকলাপ করিতেছে। সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ভিতরই অল্লাধিক এই ভাব রহিয়াছে এবং ঈশ্বর সম্বন্ধেও পরোক্ষ জ্ঞানেরই প্রাধান্য সর্ব্বশাস্ত্রে লক্ষিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ আবিষ্কার করিলেন ব্রহ্ম যিনি তিনি মা হইয়া জীবন্ত রূপে বর্ত্তমান; মা যেমন সন্তানের জন্য ব্যস্ত তেমনি তিনি মানবের পরিত্রাণের জন্য ব্যস্ত, সুতরাং মানুষ অধিক

আর কি তাঁকে চাহিবে, তিনি নিজেই মানবকে পরিত্রাণ দিবার জন্য খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। সন্তানের চেয়েও সন্তানের কিসে মঙ্গল হয় মা যে চান।

তাই এক মাতৃভাব ব্রহ্মেতে আরোপিত হওয়াতে সকল ব্যাপারটাই পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। এই মাকে মা বলিয়া বিশ্বাস করিলে এবং আমি কিছুই পারিনা, তাঁর কৃপা ভিন্ন আমার উপায় নাই এই বলিয়া তাঁর উপর নির্ভর করিয়া পড়িয়া থাকিতে পারিলেই এবার সর্ব্ব হইবে; নববিধানে ব্রহ্মানন্দের ইহাই নূতন আবিষ্কার।

মাতৃ-সন্তানত্ব।

ঈশা যে ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন এবং প্রতিষ্ঠিত করেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পিতা অপেক্ষা মাতৃ হৃদয় কোমল, অধিকতর সন্তান বৎসল বলিয়াই ব্রহ্মানন্দ নববিধানে মা বলিয়া নবাকারে পরব্রহ্মকে সম্বোধন এবং প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পিতৃত্ব এবং মাতৃত্ব একই, বরং মাতৃত্ব পিতৃত্বেরই পূর্ণতা বলা যাইতে পারে। সন্তানত্বও ঈশারই প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু মাতৃ-সন্তানত্ব ব্রহ্মানন্দই নববিধানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ব্রহ্ম-সন্তানত্বের নিগূঢ়ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়াই ব্রহ্মানন্দ তাহা নববিধানে প্রচলিত রাখিলেন।

বিভিন্ন ধর্ম্মে ব্রহ্মের সহিত ভক্তের বা সাধকের বিভিন্ন ভাবের প্রাধান্য দেখা যায়। কোন বিধানে সখ্যভাব, কোন বিধানে মধুর ভাব, কোন বিধানে দাস্য ভাব বা রাজাপ্রজার সম্বন্ধের ভাব ইত্যাদি যত ভাবই আছে তাহার মধ্যে কোন ভাবই কিন্তু পূর্ণ নহে। মাতৃ-সন্তানত্ব ভাবেই সকল ভাবের পূর্ণতা রহিয়াছে। তা ছাড়া অন্যান্য ভাবে ভক্ত ভগবানের পার্থক্য চিরস্থায়ী।

মাতা সন্তানের সম্বন্ধে স্বাতন্ত্র্যে একত্ব যেমন মিলিত এমন আর কিছুতেই নহে। প্রভু একজন দাস অন্য জন, রাজা একজন প্রজা একজন, স্বামী একজন স্ত্রী আর একজন, কিন্তু মাতা সন্তান পৃথক ব্যক্তি হইলেও সন্তান মাতারই অঙ্গজাত, সন্তানের যাহা কিছু তাহা সকলই মাতার এবং সন্তান মাতাপিতারই প্রতিরূপ। মানুষ যে ঈশ্বরের প্রতিকৃতি বা স্বরূপে গঠিত এবং মানুষ ঈশ্বরের পূর্ণতার পথে যে অগ্রসর হইবে ইহাই তার আত্মোন্নতি বা ধর্ম্মোন্নতির পরিনতি, ইহা মাতা সন্তানের সম্বন্ধ দ্বারায় যেমন সাধিত হইতে পারে এমন আর কিছুতেই নহে, সুতরাং মাতৃ-সন্তানত্ব সম্বন্ধের ন্যায় ভক্ত ভগবানের পূর্ণ সম্বন্ধ আর কিছুই নাই এবং ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্রহ্মানন্দ পূর্ণ ধর্ম্ম ভাবই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তা ছাড়া সন্তানের পক্ষে মাতা, প্রভু রাজা, সখা, ভর্ত্তা সকল ভাবেই প্রকাশিত হইতে পারেন, অন্য কোন এক ভাবে এরূপ সকল ভাবের সমাবেশ কখনই দেখা যাইতে পারে না। এই মাতৃ-সন্তানত্বে মানব-ভ্রাতৃত্বও নিহিত রহিয়াছে। তাই নববিধানে নবভাবে ব্রহ্মানন্দ এই মাতৃ-সন্তানত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজেই তাহা মুর্ত্তিমান হইয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দের এ সন্তানত্ব কেবল সন্তানত্ব অপেক্ষা শিশু-সন্তানত্ব বলিলেই ঠিক সত্য বলা হয়। কেননা তাঁর সন্তানত্ব সম্পূর্ণ আমিত্ব-বিহীন সন্তানত্ব। মাতৃগর্ভস্থ শিশু সন্তান যেমন নিজ চেষ্টার দ্বারায় আপন পুষ্টিসাধনের উপায় করেনা, কিন্তু মার অমৃত নাড়ীর সুধা পান করিয়া মায়েরই রক্তমাংশে পুষ্ট হয়, ব্রহ্মানন্দ-শিশু-আত্মার পুষ্টিসাধনও সেই প্রকার। পৃথিবীর মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়া পুষ্টিবিধান করেন, ব্রহ্মানন্দের মা আত্মার আত্মা হইয়া শিশু মানব-আত্মাকে পরিপুষ্ট করেন। তাই বলি ব্রহ্মানন্দের এ সন্তানত্বও সম্পূর্ণ নূতন।

পবিত্রাত্মার নেতৃত্ব।

শ্রীব্রহ্মানন্দ বলিলেন "নববিধান পবিত্রাত্মার বিধান।" এবিধানে স্বয়ং বিধাতার পবিত্রাত্মাই মধ্যবর্ত্তী গুরু ও পরিচালক। পবিত্রাত্মা বিবেকের ভিতর দিয়া যাহা আদেশ করিবেন তাহা পালন করাই একমাত্র ধর্ম্ম।

তিনি বলেন "এবারকার গুরু সে যে বলে আমার কথা কিছু শুনিও না, আমার শিক্ষা মানিও না যদি না পবিত্রাত্মার সহিত মিলে বুঝিতে পার" তাই সকলের নিজ নিজ বিবেকের পথ পরিষ্কার থাকে এজন্য ব্রহ্মানন্দ তাঁর অনুচরদিগের কাহাকেও কখনও কোন বিষয়ে বড় একটা পরামর্শ সহজে দিতেন না, কেহ তাঁহাকে কিছু পরামর্শ চাহিলে বলিতেন "ভগবান গুরু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর।" একবার একজন তাঁকে বলিলেন, "আমি অত কিছু বুঝি না, আপনি যা বল্‌বেন আমি তাই করব।" ইহাতে ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "কেমন ঠিক তো আমি যা বলব তাই করবে?" প্রশ্নকর্ত্তা হাঁ বলিলে, তিনি বলিলেন "তবে আমি বুলি আমার কথা শুন না, ভগবান যা বল্‌বেন তাই শুনো।" তিনি আপনাকে মধ্যবর্ত্তী বা গুরু করিতে চান নাই এবং কখন কাহাকেও শিষ্য বলিতেন না। বর্ত্তমান যুগে এক পবিত্রাত্মাই মানবের সহিত মানবের এবং মানবের সহিত ঈশ্বরের মিলন সম্পাদনের মধ্যবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অনুসরণ করাই নববিধানে বিশ্বাস।

স্বয়ং পবিত্রাত্মাই গুরু হইয়া সকলকে দিব্যজ্ঞান দান করেন এবং তিনি স্বয়ং পরিচালক হইয়া সত্যের পথে ধর্ম্মের পথে লইয়া যান, তিনি না লইয়া গেলে কাহারও যাবার যো নাই। তিনি যাকে যা আদেশ করেন

সে সেই আদেশ শুনিয়া চলিলেই তার পরিত্রাণ। মানুষ স্বভাবতঃই ত নিজ বিবেকালোক বা পবিত্রাত্মার আলোকের সহিত না মিলিলে কাহারও কথা শুনিয়া চলে না। নিজ বুদ্ধি বিচার ত্যাগ করিয়া এই পবিত্রাত্মার উপর নির্ভরশীল হইলে কেহ কখনও ঠকেও নাই। সংসারের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় হইতে যাবতীয় বিষয়েই এই পবিত্রাত্মা যে সুপথে পরিচালন করিতে পারেন ও সুপরামর্শ দিতে পারেন, ইহাই ব্রহ্মানন্দ নিজ জীবনের দ্বারায় প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করিলেন।

কোচবিহারের মহা বিবাহ ব্যাপার তাহারই এক প্রধান প্রমাণ। সর্ব্বতোভাবে আত্মবলিদান দিয়া কিরূপে পবিত্রাত্মার আদেশ পালন করিতে হয় তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি এই বিবাহ ব্যাপারে দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে এক একটী ব্রাহ্ম যায় আর আমার এক একখানি বুকের হাড় ভাঙ্গিয়া যায়, এতগুলি ব্রাহ্ম যে চলিয়া গেল তাহাতে আমার হৃদয়ের হাড় চূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু কি করিব আদেশ মানিতে গেলে এইরূপই সহ্য করিতে হয়।

কোচবিহার মহারাজের রাজ্যাভিষেক কালেও তিনি প্রার্থনায় বলিলেন, "তুমি যখন বলিলে চাই, আর কিছু শুনিলাম না। বিপদের মধ্যে অন্ধকারে সেই কন্যাকে ফেলিয়া দিলাম। তুমি যখন চাহিলে বলিলে আমি দুই দেশের মিলন করিব, আমি নবরক্ত দিয়া নব উজ্জ্বল এই বেহারকে নির্ম্মল করিব; তুমি কাণে কাণে বলিলে, আর আমি ধাক্কা দিলাম, দুর্ব্বলা কন্যা দিলাম। আমি এক দিনের জন্যও মনে করি নাই মান সম্পদ ঐশ্বর্য্যের জন্য দিয়াছি। আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিলাম। আজ পৃথিবীতে আমার যা পাবার পাইলাম, কারণ আজ বিবাহ পূর্ণ হইল। সুনীতির সঙ্গে সুনীতি, আলোক, পরিত্রাণ কোচবিহারে প্রবেশ করিবে।"

[illegible] তুমি [illegible] করিতে পারিলে না, [illegible]
[illegible]"

তিনি আরো বলিলেন "এবার ভক্ত বিধি, উপদেষ্টা বিধি, ঠাকুর বিধি বলে দিয়েছেন যে এবার ভগবানকে বড় করা হবে না পবিত্রাত্মাকে বড় করিতে হইবে। পিতা তুমি নিজেই বলিলে, আমাকে কেবল ডাকিলে পরিত্রাণ পাবে না; আপনি পেছিয়ে গেলে, পবিত্রাত্মাকে পাঠিয়ে দিলে বলিলে তুমি এবার রাজ্য কর। একবার ব্রহ্ম ব্রহ্ম হাজার বার বলিলেও কিছু হবে না। আর সাধুদের জুতো নিয়ে টানাটানি করলেও কিছু হবে না। পবিত্রাত্মার অগ্নিতে পাপ রিপু সব পুড়ে দিয়ে নূতন ভাব নূতন শুদ্ধ জীবন হবে এটা চাও ভগবান।" সুতরাং এবার পবিত্রাত্মার চরণে শরণাগত হওয়াতেই নববিধান।

ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান।

ব্রহ্মানন্দ নববিধানকে এই জন্য পবিত্রাত্মার বিধান বলিয়াছেন যে "এ বিধানের স্বয়ং পবিত্রাত্মাই পরিচালক। ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি হইতেই এই পবিত্রাত্মারই প্রভাব প্রতীয়মান হইতেছে। রাজর্ষি রামমোহন রায় পবিত্রাত্মার আত্মায় পরিচালিত হইয়াই এই সমাজ স্থাপন করেন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও পবিত্রাত্মার আলোকেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ হিন্দুধর্ম শাস্ত্র হইতে উদ্ধার করিয়া রচনা করেন, কেন না হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে যা সত্য বলিয়া তাঁর নিজ ধর্মজ্ঞানে উপলব্ধ হইয়াছে তাহাই তিনি ইহাতে সংকলিত করেন, তিনি তো সমস্ত শাস্ত্র গ্রহণ করেন নাই; এই নিজ ধর্মজ্ঞান

পবিত্রাত্মার প্রেরণা ভিন্ন আর কি? তৎপরে দেবর্ষি ব্রহ্মানন্দ তো ঈশ্বরবাণী বা পবিত্রাত্মাকেই এই সমাজের গুরু রূপে বরণ করিলেন।

ব্রহ্মানন্দ যখন দেখিলেন পবিত্রাত্মার অপেক্ষা মানব বুদ্ধির প্রাধান্য ব্রাহ্ম সমাজকে অধিকার করিল, যখন সম্পূর্ণরূপে আমিত্বত্যাগী হইয়া ব্রাহ্ম সমাজ পবিত্রাত্মার পরিচালনায় আত্ম সমর্পণ করিতে আর প্রস্তুত নহেন, যখন বুদ্ধির আটির গণ্ডীতে এই সমাজ আপনাকে সীমাবদ্ধ করিল এবং ব্রাহ্ম সমাজ ব্রহ্মের সমাজ না থাকিয়া ব্রাহ্মদিগের সমাজ হইয়া দাঁড়াইল অর্থাৎ যাবতীয় বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারায় এ সমাজ পরিচালিত হইতে চলিল; তিনি যখন আরও দেখিলেন তাঁহার মুক্ত উদার ভাব ইহাতে বাধা পাইতে লাগিল তিনি একেবারে আপনাকে পবিত্রাত্মার হাতেই ছাড়িয়া দিলেন, কারণ তখন তাঁর নিকট ঈশ্বরবাণী বলিলেন, Brahmo Somaj is not yet my Church, "ব্রাহ্মসমাজ এখনও আমার মণ্ডলী নহে।" পূর্ব্ব হইতেই যখন "ভারতে স্বর্গীয় জ্যোতি" বিষয়ে তিনি বক্তৃতা করেন তখনই ইহা যে এক নূতন বিধান ইহা তাঁহার প্রতীতি হয় এবং তাই যথা সময়ে আপন জীবন্ত বিশ্বাস বলে ইহাকে নূতন বিধান বলিয়াই ব্রহ্মানন্দ ঘোষণা করিলেন।

কাজেই তখন ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান আরত ঠিক এক রহিল না, ব্রাহ্মসমাজের সংকীর্ণ আবর্ত্তের মধ্যে অনন্ত নববিধান আর আটকাইয়া থাকিতে পারিল না। তাই ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "হরি, তুমি দিলে অনন্ত প্রত্যাদেশের আগুন, এরা সব পা দিয়ে থুতু দিয়ে নিবিয়ে দিলে, আর বিবেকজলা জেদবাদের মিটমিটে প্রদীপ জ্বালালে। তুমি এই দেখে স্বর্গ হইতে ফুঁ দিলে দিয়ে গেল, তাদের দর্প চূর্ণ হল।" তাই "কোথায় আমার জোগাড় ধর্ম্ম কোথায় গেল," এই বলিয়া তিনি প্রত্যাদেশেরই বাতাস ভিক্ষা

করিলেন এবং সেই আন্দোলনে-ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আগুন নববিধানের প্রজ্বলিত হুতাশনে পরিণত হইল।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধানের ভিন্নতা তখন উপলব্ধি করিয়াই তিনি বলিলেন, "যখন কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম মানিতাম তখন অবস্থা এক রকম ছিল, দায়িত্ব কম ছিল, এখন নববিধান বিশ্বাস করি এখন আর এক অবস্থা দায়িত্ব বড়। বিধান মানা ভয়ানক ব্যাপার!" ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধান যে এখন আর ঠিক এক নয় ব্রহ্মানন্দের এই উক্তিতে তাহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে। তিনি অন্য স্থানে বলিলেন "ব্রাহ্মসমাজের সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ইঁহারা পারিলেন, নববিধানে ইঁহারা আর পারিলেন না।" আমাদের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধান একই বলিতে চান তাঁদের এই সকল উক্তি গূঢ়ভাবে চিন্তা করা উচিত। তা ছাড়া ব্রহ্মানন্দ যখন ব্রাহ্ম বিবাহ আইন প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করেন তখনও ব্রাহ্ম সমাজের তৎকালীন নেতাগণ তাঁহাকে সে আইন ব্রাহ্ম বিবাহ আইন নামে অভিহিত করিতে দেন নাই, কারণ তাঁরা বলিলেন তাঁদের সমাজই ব্রাহ্ম সমাজ, "ব্রাহ্ম" নামে কেশবচন্দ্রের কর্ত্তৃত্ব নাই। কাজেই তখন হইতেই ব্রাহ্ম সমাজ আর উন্নত নীতির পক্ষপাতী রহিল না তাহা হইতে পিছাইয়া পড়িল। তবে আর ব্রাহ্ম সমাজ ও নববিধান এক রহিল কি করিয়া বলিব?

ব্রাহ্ম সমাজ ও নববিধানের ধর্ম্ম পার্থক্য।

এক্ষণে, ব্রাহ্ম সমাজ ও নব বিধানের ধর্ম্ম ভাবের যে পার্থক্য কি তাহাও ব্রহ্মানন্দ "নববিধান পত্রিকায়" উক্ত ও নিম্ন লিখিত প্রবন্ধে এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন:—"ব্রাহ্মসমাজ সকল প্রকারের একেশ্বর-

বাদীকে অন্তর্ভূত করে, হেতুবাদী এবং শুষ্ক ব্রহ্মবাদীও বহির্ভূত নহে। এক ঈশ্বর ও পরলোকে যে কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করে, সেই আপনাকে ব্রাহ্ম শ্রেণীভুক্তও করিতে পারে। তিনি সাম্প্রদায়িক হইতে পারেন, হিন্দু ও খ্রীষ্টানিকে, মহম্মদীয় ও বৌদ্ধকে শত্রু এবং তাঁহাদিগের মত ও বিশ্বাসকে অবিমিশ্র ভ্রান্তি বলিয়া ঘৃণা করিতে পারেন। তিনি যোগ ও প্রত্যাদেশ এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চ উচ্চ অবস্থার প্রতি পরাঙ্‌মুখ হইতে পারেন, তথাপি তিনি ব্রাহ্ম হইতে পারেন। তিনি সমুদয় জীবন শুষ্ক ব্রহ্মবাদের বিশ্বাস ও জীবনের নিম্নতম অবস্থায় থাকিতে পারেন। তিনি সমুদয় জীবন বিধাতৃত্ব ও অনুগ্রহ সম্বন্ধে প্রতিবাদ এবং খ্রীষ্ট ও পলকে বঞ্চক বলিয়া নিন্দা করিতে পারেন। অথচ ভারতবর্ষের সমুদয় ব্রাহ্মমণ্ডলী বিখ্যাত শিক্ষিত ব্রাহ্ম বলিয়া তদুপরি সম্মান রাশিকৃত করিতে পারে। এই সকল লোক সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে ইহারা শুষ্ক ব্রহ্মবাদের নিম্নতম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং আজও ইহারা ঈশ্বরের রাজ্য নববিধানের মণ্ডলী হইতে অধিক দূরে অবস্থিত। ইহারা ধর্মের উচ্চ সত্য এখনও বুঝিতে পারে না এবং ইহার দর্শন শাস্ত্র ও ইহার গভীর ভক্তির আস্বাদ পায় নাই।

"তাহাদিগের রক্ষণশীলতা, ক্ষুদ্রতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং অনাধ্যাত্মিকতার বিষয়ে অতীব দুঃখ প্রকাশ করি। অধিকাংশ ব্রাহ্মের এই প্রকার লক্ষণ :—

একেশ্বরে বিশ্বাস।
পাঁচ মিনিটের কতক প্রার্থনা।
পরলোক স্বীকার।
সাধু ও মহৎলোকের প্রতি সম্মান।

সামান্যতঃ নৈতিক চরিত্র।

সামাজিক বেশভূষাদি সম্পন্নতা।

নববিধান বিশ্বাসীগণের প্রেরিতোচিত লক্ষণ এইরূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে :—

বিশ্বাস চক্ষে জীবন্ত ঈশ্বর দর্শন।

গভীর ভাবের উপাসনা, কখন অর্দ্ধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা হইতে দুইঘণ্টা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

স্বর্গস্থ ঋষিগণ সহ যোগ অথবা তাঁহাদিগের নিকট তীর্থযাত্রা।

সমুদয় ভবিষদ্যশী এবং ঋষিগণের জীবন আত্মস্থকরণ।

আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধি এবং নবজীবন।

কোটি লোকের জন্য আত্মাকে বলিদান।"

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম্ম এবং নববিধানের মধ্যে যে সুমহৎ প্রভেদ আছে তাহা অনায়াসেই উপলব্ধ হইবে।

তিনটী ব্রাহ্ম সমাজের মিলন সম্বন্ধেও বম্বে "প্রার্থনা-সমাজ" যখন পত্র লেখেন, তাহার উত্তরে ব্রহ্মানন্দ স্পষ্ট বলেন যে "উপযুক্ত কালে সকলেই নববিধানে এক হইবে ঈশ্বর ইহাই বলিয়াছেন। সত্যই ঈশ্বর সকল প্রকৃত বিশ্বাসী ভক্তদিগকে এক করিবেন। সন্দিগ্ধমনা স্বপ্রিয় অল্প বিশ্বাসী লোকদিগকে তিনি ইহার মধ্যে বিদায় দিয়াছেন।" ইহাতেও বেশ বুঝা যাইবে যে তাঁহারও মতে ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান এখন এক নহে এবং সাধারণ ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে নববিধান যে অনেক উচ্চতর অবস্থায় উন্নত হইয়াছে তাহাও সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইবে।

ভগবান ভক্ত ও বিধান, এই তিনের সমাদর, তেমনি ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম দুই অবস্থাকে কাশী বৃন্দাবনের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে এবং শ্রীক্ষেত্রে নববিধানেরই পত্তন ভূমি যেন নিহিত দেখা যায়। নববিধানে যেমন শ্রীক্ষেত্রেও তেমনি সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়েরই স্থান আছে, সেখানেও আনন্দবাজারে জাতিভেদ নাই এবং দেব মূর্ত্তিতেও এক দিকে ভগবান এক দিকে ভক্ত, মধ্যে সুভদ্রারূপী ধর্ম্ম বিধানকে রক্ষা করিতেছেন। ভগবান চিরদিনইত ভক্তকে বাড়াইয়া থাকেন, তাই বলে জগন্নাথ অপেক্ষা বলরাম বড়। যাহাহউক ইহাকে নববিধানের পূর্ব্বাভাষ বেশ বলা যাইতে পারে।

বস্তুতঃ ব্রাহ্মসমাজ কেবলমাত্র একেশ্বর-বাদেই পরিতুষ্ট হইয়া তাহাতেই নিবদ্ধ রহিল, নববিধান এই একেশ্বর বাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহাকে প্রতিফলিত করিলেন এবং তাহাতে এক-ভ্রাতৃত্ববাদ এবং পবিত্রাত্মার নেতৃত্ববাদ সংযুক্ত করিয়া একটী পূর্ণাবয়ব জীবন সম্পন্ন ধর্ম্ম-বিধানরূপে বিকশিত হইলেন। ফলতঃ য়িহুদীধর্ম্ম এবং খ্রীষ্টধর্ম্মে যে পার্থক্য, ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং নববিধানে ঠিক সেইরূপ পার্থক্য রহিয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজে মতেরই প্রাধান্য, নববিধানে কিন্তু নবজীবন চাই।

রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধানের ধর্ম্ম পার্থক্য বিষয়ে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে এই সমাজের নেতাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়েও কিছু আলোচনা করা উচিত মনে হয়। ব্রাহ্মসমাজের অবতারণা যদিও বিধাতার পবিত্রাত্মার দ্বারাই হইয়াছে সত্য, কিন্তু তিনি মানবের ভিতর দিয়াই সকল

কার্য্য করিয়া থাকেন। সুতরাং এই সমাজের প্রতিষ্ঠাতা যদিও স্বয়ং ব্রহ্ম, কিন্তু তিনি যে রাজা রামমোহনের দ্বারায় ইহা প্রকাশ্যে প্রতিষ্ঠা করেন কে অস্বীকার করিবে?

রাজা রামমোহন তাঁর মহা পাণ্ডিত্য প্রভাবে হিন্দু শাস্ত্র সমুদ্রমন্থন করিয়া প্রাচীন একেশ্বরবাদ প্রতিপাদন করিলেন ও নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা পুনরায় এ দেশে প্রবর্ত্তন করিলেন। তিনি মুসলমান শাস্ত্র এবং খ্রীষ্ট শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়াও এই একেশ্বরবাদই সমর্থন করেন। যদিও তিনি "ব্রাহ্মীয় সমাজ" নামে এই ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত করেন, কিন্তু তিনি সমাজ গঠন কিছুই করিতে পারেন নাই। হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান যিনি যাই মতে জীবনযাপন করুন না কেন সমাজ মন্দিরে আসিয়া একেশ্বরবাদ প্রতিপাদক উপাসনা একত্রে করিলেই তিনি এই সমাজের সভ্য হইবেন, রাজা রামমোহন রায় ইহাই নিয়ম করিয়া যান। ফলে তাঁর সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মও কি তাহা পরিস্কৃতরূপে সিদ্ধান্তই হয় নাই। তাই তাঁর ধর্ম্মকে কেবল একেশ্বরবাদ বলা যাইতে পারে এবং ইহা জ্ঞান বা শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারায় এক ব্রহ্ম নিরূপণ চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। দেশের উপর যে পৌত্তলিকতা বা জড়পূজা ঘোর আধিপত্য করিতেছে শাস্ত্রজ্ঞান বিচার দ্বারায় তাহা নিরাকরণ করিয়া একেশ্বরবাদ প্রচারই রাজা রামমোহনের উদ্দেশ্য। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানই তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষণ। দেশকে ব্রহ্মজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করিতেই তিনি আসেন। তাই ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে এই নবমণ্ডলীর "ধর্ম্মপিতামহ" বলিয়া সম্মান করিলেন এবং নিম্নলিখিতভাবে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন :—

"কোথায় থাকিত এই ব্রাহ্মসমাজ যদি ব্রহ্মসন্তান রামমোহন না আসিতেন? তিনি বড় লোক কি রাজা ছিলেন তাহার আমরা বিচার করিব না।

আমরা তাঁহার নিকট একটী বিস্তীর্ণ জমীদারী পাইয়াছি, সেই তালুকের প্রজা আমরা। ভয়ানক পৌত্তলিকতার বন কাটিয়া তিনি এক খণ্ড ভূমি আবাদ করিলেন। এই যে সামান্য ভূমিখণ্ড ইহা হইতে ব্রহ্ম আরাধনা এই দেশে আবার প্রবল হইল, আবার কএকটী লোক এক ব্রহ্মকে পূজা করিতে লাগিল।"

"ভগবান তাঁহার পুত্র রামমোহনকে পাঠাইলেন। এই ব্রাহ্মসমাজের তিনি ধর্ম্মপিতামহ, তিনি পরলোকে আছেন, তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিব। তাঁহার জন্য ভারতে ব্রাহ্মসমাজ আপনার মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। তাঁহার স্তব স্তুতিতে বিদ্যা বুদ্ধিতে পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল, এই জন্য তাঁহার নাম কৃতজ্ঞতাফুলে গলায় জড়াইয়া রাখি। যিনি সহস্র লোকের তীব্র নির্য্যাতনে ব্যথিত হইয়া "জয় জগদীশ, জয় জগদীশ!" বলিয়া কেবল ঈশ্বরের মুখের পানে তাকাইলেন, ব্রহ্মের ঘর প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তিনি জয়ী হইলেন, ভগবান তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন বলিলেন, "প্রিয় সন্তান, ঘরে এস" তিনি ভবে ঈশ্বরের কার্য্য করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন।"

পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান সমাজপতি হইয়া এই সমাজকে গঠন করেন এবং ইহার ধর্ম্মমত হিন্দু শাস্ত্র হইতে নিজ ধর্ম্মজ্ঞান ও ধ্যান যোগে নির্দ্ধারণ করিলেন। তিনিই রাজা রামমোহন প্রদর্শিত একেশ্বরবাদকে একেশ্বরের উপাসনা বা পূজায় পরিণত করিলেন এবং এই ব্রহ্মোপাসকদিগের একটী সমাজ গঠন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুসারে অনুষ্ঠানাদি সম্পাদনের প্রথম ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু কেবল হিন্দু জাতির উপযোগী করিবার জন্য হিন্দুভাব বজায় রাখিয়া যতদূর হইতে পারে তিনি তাহাই করিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজকে একটী সুসংস্কৃত হিন্দুসমাজরূপে প্রতিষ্ঠিত

করিলেন। প্রাচীন আর্য্যঋষিভাব এবং ব্রহ্মধ্যানই দেবেন্দ্রনাথের জীবনের বিশেষত্ব। সেইভাবই তিনি এই নবমণ্ডলীতে সঞ্চার করিতে চেষ্টা করেন, তাই ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে ধর্ম্মপিতা বলিয়া সমাদর করিলেন এবং নিম্নলিখিতভাবে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন :—

"আমাদিগের ধর্ম্মপিতা পরে আসিলেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের নিকট যাহা পাইয়াছিলেন, তাহার তিনি নিয়মাদি স্থির করিলেন। একটী অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসক মণ্ডলীর রাজ্য স্থাপিত হইল। রামমোহন রায়ের সময়ে মণ্ডলী গঠিত হয় নাই। তাঁহার কার্য্যের অবশিষ্ট অংশ যিনি পরে আসিলেন তিনি করিলেন। হিন্দু শাস্ত্র হইতে আলোচনা দ্বারা অমৃতময় সত্য উদ্ভাবন করিলেন। হিন্দুর আচার ব্যবহার হইতে উদ্ধার করিয়া একটী সংস্কৃত হিন্দুসমাজ গঠিত হইল।"

"ইনি বর্ত্তমান ভারতবর্ষের ঋষি আত্মা। এই পবিত্র ঋষি আত্মা দেবেন্দ্র নাথের আত্মা বঙ্গবাসীর মন সবল ও সুস্থ করিল। যখন ইনি স্বর্গ হইতে আইসেন তখন ঈশ্বর ইহাঁকে দীক্ষিত করিয়া দেন। ইনি ব্রহ্ম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিয়া দুই এক বৎসর নয়, কিন্তু যৌবন হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত ইহাঁর সমস্ত শরীর মন উদ্যম তোমার আমার ন্যায় জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন।"

"যদিও তোমাদের সঙ্গে তোমাদের ধর্ম্মপিতা ও ধর্ম্মপিতামহের সকল মতের ঐক্য না হয়, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ কর। যদি হৃদয়-বন্ধুদিগকে কৃতজ্ঞতা না দিবে তবে তোমরা নববিধানের উপযুক্ত নও। যাঁহাদিগের নিকট বিন্দুমাত্র উপকার পাইয়া থাক করযোড়ে কৃতজ্ঞ হও। আমাদিগের উপকারী বন্ধুর কালো দিক যে দেখিতে নাই, ইহা আমাদিগের সৌভাগ্য। আমরা ধর্ম্মপিতা ধর্ম্মপিতামহকে কৃতজ্ঞতা দিব।

ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া ইহাঁদিগের দুই জনের চরণে মস্তক নত করিব।"

অতঃপর মহর্ষির দ্বারাই ব্রহ্মানন্দ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত হন। মহর্ষি বলেন, "একদা শুসকরার একটা আম্র কাননে বাস করিতেছিলাম, সেখানে আমার মনে হইল যে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্রই ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য-পদে বরিত হইবার উপযুক্ত। আমি ইহা প্রত্যাদেশের ন্যায় অনুভব করিলাম। এবং তৎক্ষণাৎ তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিলাম।" তাহার পূর্ব্ব হইতেই উভয়ের মধ্যে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক যোগ সংস্থাপিত হইয়াছিল।

ব্রহ্মানন্দ ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া ইহার সংকীর্ণ হিন্দুভাবকে উদার সার্ব্বভৌমিকতায় পরিণত করিতে চেষ্টা করেন এবং জাতিভেদাদি নিবারণ করিয়া নানা প্রকার সমাজ সংস্করণে প্রবৃত্ত হন।

কাজেই ব্রহ্মানন্দের ক্রমোন্নতিশীল জীবনকে মহর্ষির রক্ষণশীলভাব প্রণোদিত ব্রাহ্মসমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে অধিকদিন আটকাইয়া রাখিতে পারিল না। তবে যদিও মহর্ষির সহিত তাঁর মতের অমিল হইল ও পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিল, তথাপি ব্রহ্মানন্দ কখনও মহর্ষিকে হৃদয় হইতে পরিত্যাগ করেন নাই এবং কিরূপ উচ্চভাবে তাঁহাকে দেখিতেন, তাহা উপরোক্ত কয়েকটী কথা ও অন্যান্য স্থানে যাহা বারম্বার বলিয়াছেন তাহাতেই বুঝা যাইবে।

আবার মহর্ষিদেবও যদিও ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে বাহ্যতঃ ত্যাগ করেন বলিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহতই হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে কি গভীর প্রেম চক্ষেই দেখিতেন, তাহা তাঁর এই নিম্নলিখিত কএকটী কথাতেই বুঝা যাইবে:—"এক্ষণে ব্রহ্মানন্দের কথা আর কি বলিব। তিনি মান অপমান

স্তুতি নিন্দাতে অটল থাকিয়া ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছেন। তিনি রাজভবনে, তিনি দরিদ্রের কুটীরে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সমভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। যতক্ষণ তিনি তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন, ততক্ষণ তাঁহার জীবন সেই ধর্ম্মের জন্য মরণও তাঁহার আদরণীয়। মধ্যাহ্নকালের সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার প্রতাপ, অথচ প্রসন্নতা, মৃদুতা, নম্রতা, ভগবদ্ভক্তি তাঁহার মুখশ্রীকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। যদি আমার এই মনে কাহারও প্রতিমা থাকে, তবে সে তাঁহারই প্রতিমা। যদি কাহারও জন্য আমার প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন হইয়া থাকে, তবে সে তাঁহারই নিমিত্তে। ব্রহ্মানন্দ এত উচ্চ পদবীতে উঠিয়াছেন যে আমরা আর তাঁহার নাগাইল পাই না। তাঁহার মনের ভাব সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি না। আমরা কেবল এক জন্মভূমির অনুরাগে ঋষিদিগের বাক্যেই তৃপ্ত হইয়াছি। তিনি অসাধারণ উদার প্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া এই ভারতবর্ষের ব্রহ্মবাদীদিগের সঙ্গে পালেস্তাইন ও আরববাসী ব্রহ্মবাদীদিগের সমন্বয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।”

বাস্তবিক ব্রহ্মানন্দ এক উদার প্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়াই ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মের সহিত জগতের অন্যান্য ধর্ম্মের এবং ভারতবর্ষের ব্রহ্মবাদীদিগের সহিত অন্যান্য দেশের ব্রহ্মবাদীদিগের সমন্বয় করিয়া এই ব্রাহ্মধর্ম্মকেই নববিধানে পরিণত করিলেন। মহর্ষির ধ্যান যোগ প্রধান জীবন স্বভাবতঃই রক্ষণশীল, ব্রহ্মানন্দের কর্ম্মযোগ প্রধান অগ্নিময় জীবন স্বভাবতঃই উন্নতিশীল, এই রক্ষণশীলতা ও উন্নতিশীলতার বাহ্যতঃ চিরএকতা সম্ভবপর হয় না। তাই মহর্ষিতে ও ব্রহ্মানন্দে যে বিচ্ছেদ তাহা ধর্ম্মভাবগত,

ব্যক্তিগত নহে। এবং এই জন্যই তাঁহাদের আধ্যাত্মিক যোগ শেষ দিন পর্য্যন্ত ভঙ্গ হয় নাই এবং কখনও হইবার নহে।

আমাদের চক্ষের সাম্‌নেই একদিন দেখিলাম যখন ব্রহ্মানন্দের শেষ কঠিন পীড়ার সময় মহর্ষি তাঁহাকে দেখিতে আসেন, ব্রহ্মানন্দকে দেখিয়াই মহর্ষি "বাবা কেশব" এই বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং তাঁহাকে কৌচে আগে বসাইয়া তবে আপনি বসিলেন, এবং প্রথম ভাবোচ্ছাস সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমার গুণেই ব্রাহ্মধর্ম্মবিধান দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হইতেছে।"

যাহা হউক রাজা রামমোহনকে ধর্ম্মপিতামহ ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে ধর্ম্মপিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ ব্রহ্মানন্দ আপনি তাঁহাদের সন্তান স্থানীয় হইলেন ও সকলকার জ্যেঠ ভাই হইলেন। পিতামহ ও পিতা হইতেই এই সমাজ জন্মগ্রহণ করিল, কিন্তু ব্রহ্মানন্দই ইহাকে ফল ফুলে শোভিত নববৃক্ষরূপে পরিণত করিলেন। যাহা রাজা ব্রহ্মজ্ঞানে উপলব্ধি করিলেন এবং যাহা মহর্ষি ধ্যানে আয়ত্ত করিলেন, ব্রহ্মানন্দ তাহা জীবনে দর্শন ও প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মানন্দরসে আপনি মগ্ন হইলেন এবং সকলকার তাহা সম্ভোগের ব্যবস্থা করিলেন। বিধান যাহা রামমোহনের হৃদয়ে বাষ্পাকারে উত্থিত হইল, এবং যাহা মহর্ষির সাধনায় কেবল মেঘের আকারে পরিণত হইল, তাহা ব্রহ্মানন্দ-জীবনে বারিধারারূপে বর্ষিত হইয়া জগতকে সিঞ্চিত এবং শস্যশালিনী করিল।

বাস্তবিক এই তিন জনের সম্বন্ধ অতি গভীর এবং নিগূঢ়, রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নববিধানেরই পূর্ব্বদেবদূত এবং ব্রহ্মানন্দ তাহার ঘোষয়িতা এবং প্রতিষ্ঠাতা। রাজা রামমোহন এ বিধানের বীজস্বরূপ, মহর্ষি ইহার মূল বিশেষ এবং ব্রহ্মানন্দ ইহার ফল ফুল শোভিত শাখা প্রশাখা সম্পন্ন

মহাবৃক্ষ। বৃক্ষ, বৃক্ষমূল এবং বীজের সহিত যেরূপ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তেমনি ইহাঁদের তিনজনের পরস্পর সম্বন্ধ।

অতএব এই তিন জনকে কখনই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বর্ত্তমানকালে যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে কেহ বা রাজা রামমোহনকে বাড়াইয়া, কেহ বা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে বাড়াইয়া, ব্রহ্মানন্দকে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত এবং তাঁহাদের সে চেষ্টা পরিণামে নিশ্চয়ই বিফল হইবে। তিন জনকে নিত্য যোগযুক্ত একই বিধানের মধ্যবিন্দুরূপী অখণ্ড-মানব বলিয়া যাঁহারা সমাদর করিবেন এবং কৃতজ্ঞতা-হারে হৃদয়ে জড়াইয়া রাখিবেন তাঁহারাই ঠিক করিবেন।

নব বিধানে নূতন কি ?

এক্ষণে এই ধর্ম্ম যে বিধান এবং ইহাকে ব্রহ্মানন্দ কেন নববিধান বলিলেন, ইহাও আলোচনা করা আবশ্যক। বিধান মানে যা বিধাতা ব্যবস্থা করেন। ব্রহ্ম যদি সর্ব্বময় হন তাহা হইলে যাহা কিছু অবস্থা আসিতেছে তার মধ্যে আমি যা না করিতেছি তাতেই তাঁর ব্যবস্থা আছে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আমি যদি পাপ করি, অন্যায় করি, তা নিশ্চয় তাঁর বিধান নহে, কেন না তাহা আমাদ্বারা কৃত, কিন্তু পাপের ফল যা ভুগিতে হয়, আর সংসারে আমাছাড়া অন্য হইতেও আমার উপর যা অবস্থা আসে বা ঘটনা ঘটে তাহাতেও বিধাতার বিধান দেখিতে হইবে।

বাস্তবিক সংসারের যাবতীয় ঘটনা অবস্থা সকলের মধ্যেই বিধাতার ব্যবস্থা আছে। এইরূপে ধর্ম্মও যাহা প্রচলিত আছে, তাহাও সকলই বিধান।
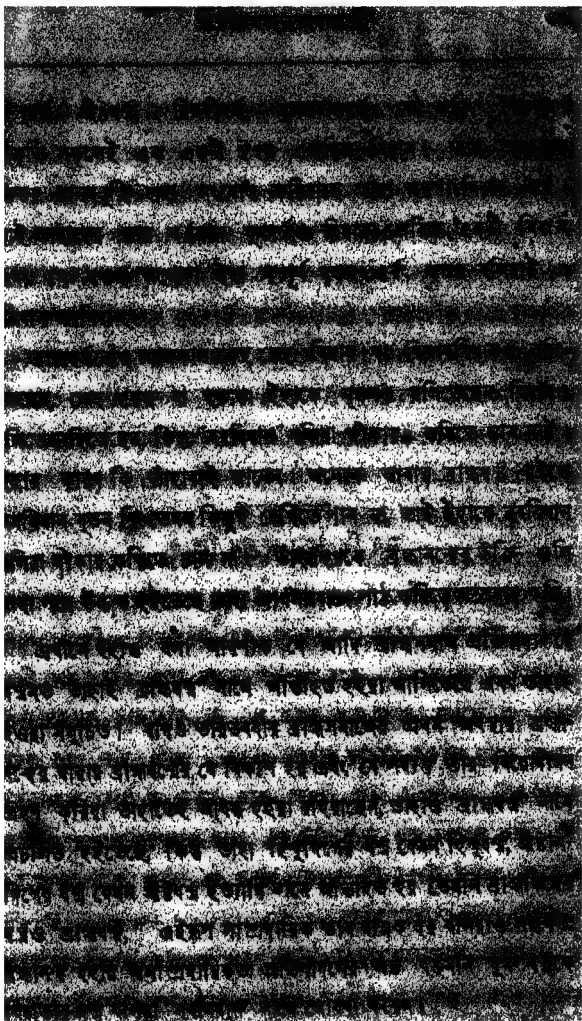
একণে এই নববিধানে নূতন কি এ সম্বন্ধে তিনি "নববিধান" পত্রিকায় এইরূপ বলিয়াছেন :—"নিরাকার ঈশ্বরকে দর্শন কি নূতন নয়? তাঁর আস্তিক মৃদুবাণী শ্রবণ কি নূতন নয়? পরমাত্মাকে মাতৃরূপে পূজা করা কি নূতন নয়? মুষা সক্রেটিসের সহিত দেখা শুনা করা কি নূতন নয়? কারাগে ও কার্লা-ইলের নিকট তীর্থযাত্রা কি নূতন নয়? ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার মধ্যে কল্যকার জন্য চিন্তা না করা কি নূতন নয়? যে যোগে সর্ব্বক্ষণ দৈত-জ্ঞান থাকে তা কি নূতন নয়? "আমি ও আমার ভ্রাতা এক" এই মত কি নূতন নয়? অন্তের নিকট যে ব্যবহার চাও তাহা অপেক্ষা তাহার প্রতি অধিক কর এই স্বর্ণ নীতি কি নূতন নয়? সাধু ভক্তদিগকে আত্মস্থ করা কি নূতন নয়? সকল বিধান যে এক নৈয়ায়িক পর্য্যায় শৃঙ্খলে বাঁধা ইহা কি নূতন নয়? নববিধানের হিন্দু সাধকদিগকে ঈশা এবং পলের আধ্যাত্মিক বংশধর এবং প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করা কি নূতন নয়? সেই সর্ব্বমিলনবাদ কি নূতন নয় যাহাতে গভীরতম যোগ, উচ্চতম দর্শন-শাস্ত্র, মহোৎসাহপূর্ণ পরসেবা, মধুরতম প্রেম এবং কঠোরতম বৈরাগ্য পূর্ণ মিলনে সংবদ্ধ করে? সে ধর্মবিজ্ঞান কি নূতন নয় যাহাতে সকল ধর্মের প্রার্থনা এবং ভবিষ্যৎবাণী, বৈরাগ্য এবং প্রত্যাদেশকে সাধারণ বিধি এবং সর্ব্বজনীন নীতিতে নিবদ্ধ করে? এক ঈশাতে কাথলিক, প্রটেষ্টাণ্ট, ব্যাপ্তিষ্ট এবং মেথডিষ্ট সম্প্রদায় সকলকে এক যোগ করা এবং আবার ঈশ্বরেতে সেই ঈশা, মুষা এবং সক্রেটিসকে এক করা কি নূতন নয়? বৈরাগী পুরুষ হওয়া, অলৌকিক-তত্ত্ব-বাদী বৈজ্ঞানিক হওয়া, জ্ঞানী কর্ম্মোৎসাহী হওয়া এবং প্রত্যাদিষ্ট কর্মী হওয়া কি নূতন নয়?"

যদিও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধান অপেক্ষা এই সমুদয় তত্ত্বগুলি নববিধানে সম্পূর্ণই নূতন সংগ্রথিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু কেবল এই নূতন তত্ত্বের

জন্যও যে ইহা নূতন তাহা নহে, ইহার আগাগোড়া সবটাই নূতন; ইহার কিছুই পুরাতন নহে। তবে স্বর্ণকার যেমন পুরাতন গহনা পাইলে তাহার খাদ বাদ দিয়া তাহাকে ভাঙ্গিয়া পুড়িয়া পিটিয়া নূতন গঠন করিয়া গহনা তৈয়ারী করেন, তাহাতে কিছুই আর পুরাতন থাকে না, কিম্বা তাহা অপেক্ষাও অষ্টধাতু মিলাইয়া সম্পূর্ণ এক নূতন গঠন করিলে যেমন নূতন গহনা হয় ইহাও সেইরূপ।

তাই নববিধানের নূতনত্ব সম্বন্ধে ব্রহ্মানন্দ আরো প্রার্থনায় বলেন:—

"বর্ত্তমান বিধিতে কি নূতন? হরি নূতন, পূজা নূতন, নাম নূতন, সাধন নূতন, জল নূতন বায়ু নূতন, পাহাড় নূতন, সমুদ্র নূতন; আর, পৃথিবী নূতন, স্বর্গ নূতন; ঈশা নূতন, মুষা নূতন, শাক্য নূতন, গৌরাঙ্গ নূতন, বেদ কোরাণ বাইবেল পুরাণ সমুদয় নূতন। আর কি হরি! পিতা মাতা নূতন, ভাই ভগ্নী নূতন, পুত্র কন্যা নূতন, স্বামী স্ত্রী নূতন। ভৃত্যেরা নূতন, প্রভুরা নূতন। এই যাবতীয় নূতন একত্র করিলে কি হয়?—নূতন বিধান। যার পিতামাতা ভার্য্যা পুরাতন তারা কখন নববিধানবাদী নয়। কিন্তু সমুদয় যার নূতন সেই নূতন বিধিতে দীক্ষিত।" ঈশা যেমন স্নান করিলেন এবং স্বর্গের প্রকাশ হইল ও পবিত্রাত্মা অবতীর্ণ হইলেন তেমনি পরিবর্ত্তিত দৃষ্টিতে সব দেখাই নববিধান।

আরও ইহার সর্ব্বসমন্বয়কারিতাই নববিধানের সর্ব্ব প্রধান নূতনত্ব। এ সম্বন্ধেও অনেকের অনেক প্রকার ভ্রম আছে দেখা যায়। কেহ কেহ হিন্দু জাতির অত্যুদার ভাব প্রণোদিত হইয়া মনে করেন যে হিন্দু ধর্ম্মের, কালী, কৃষ্ণ, ওলাবিবির সহিত মুসলমান ধর্ম্মের, বৌদ্ধ ধর্ম্মের, বৈষ্ণব ধর্ম্মের এবং আর আর সকল ধর্ম্মের গোটাগুটী সত্য মিথ্যা নিরাকার সাকার, একেশ্বরবাদ, বহু ঈশ্বরবাদ সব মতে মেলাইলেই বুঝি মহা সমন্বয় ও ভারি উদারতা

হইল ; কিন্তু এ মিলন ঠিক যেন চাল, ডাল, ঘি, নুন, আলু, কড়াইশুটি ও নানা প্রকার মসলা কেবল একত্র করিলেই যেমন তাহা আহারোপযোগী হয় না, যদি কেহ তাহা খাইতে চান তাহা হইলে তাহাতে উদরের পীড়াই উৎপত্তি হয়, ইঁহাদেরও সর্ব্বমিলন বাদ সেইরূপ। কিন্তু এই সকল দ্রব্যকে সপরিমাণে লইয়া অগ্নির উত্তাপে জলে সুসিদ্ধ করিলে তবে সর্ব্বমিলিত উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয় ; নববিধানের সমন্বয় কতকটা এইরূপ।

নববিধান যদি কেবল মত হইত তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সমন্বয়বাদে চলিত। কিন্তু নববিধান যে জীবন, তাই ব্রহ্মানন্দ সকল ধর্ম্ম, সকল সাধন, সকল শাস্ত্রকে একত্র করিয়া প্রেমের জলে গুলিয়া ব্রহ্মাগ্নির উত্তাপে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ করিয়া জীবন রক্ষার উপযোগী নবান্নে পরিণত করিয়া নববিধানে সন্নিবিষ্ট করিলেন ; তিনি বলিলেন সমুদয় সত্যকে রাসায়নিক মিলনে এক সত্যে পরিণত করাই নববিধান। যেমন ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ রাসায়নিক প্রক্রীয়া দ্বারা এক করিলে এক সম্পূর্ণ নূতন পদার্থে পরিণত হয়, চুণ ও হলুদকে মিশাইলে যেমন চুণেরও রং থাকে না হলুদেরও রং থাকে না আর একটী নূতন রং হয় ইহাও ঠিক সেইরূপ। নববিধান সকল সত্যের সকল ধর্ম্মের মিলনে এক নূতন সত্য, এক নূতন ধর্ম্ম।

যাহাহউক সকল ধর্ম্ম ও সকলভাবের সামঞ্জস্য, সর্ব্বভাবের মিলন, সকলেই যিনি যা চান তাই যাহাতে পাইতে পারেন এমন ধর্ম্ম আর কখনও কোনও কালেইত আবিষ্কৃত বা অবতীর্ণ [illegible] নাই। আবার এমন অলৌকিক ধর্ম্ম হইলেও ইহা অতি সহজসাধ্য। সংসারে থাকিয়া স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া যথার্থ পবিত্র ধর্ম্মের আনন্দ সম্ভোগ করা অপেক্ষা সহজ ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে ? তাই সর্ব্ব বিষয়ে ইহা সম্পূর্ণ নূতন।

[illegible], পূর্ণ [illegible] নিরাকার ঈশ্বরকে দেবতাজ্ঞানে ও তাঁর পরিচালনায় চলিয়া সংসারের যাবতীয় কর্তব্য কর্ম সাধন করা, এবং সকল ধর্মের সকল ভাবের সর্ব প্রকার পুণ্য শান্তির একত্র সম্ভোগ করিয়া নিত্য নব নব জীবনের ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হওয়া যে ধর্মের মহাভাব তাহার নূতনত্ব কি আর বুঝাইতে হয় ? ব্রহ্মানন্দ নিজ জীবনে নববিধানের এই নূতনত্ব প্রমাণ করিয়াছেন।

নববিধানের বিশ্বাস।

ইতিপূর্ব্বে এই নববিধানের সার মত কি এবং নববিধানের উদ্দেশ্য কি শ্রীব্রহ্মানন্দের উক্তিতেই প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে নববিধান সাধন করিতে হইলে কি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহাও তাঁহার "নব-সংহিতা"র আচার্য্য-দীক্ষার্থীর প্রশ্নোত্তর হইতে সংকলন করিয়া উদ্ধৃত করিতেছি :—

ঈশ্বর—ঈশ্বর এক, অসীম, পূর্ণ, সর্ব্বশক্তিমান, অনন্ত জ্ঞানময়, পূর্ণ দয়াময়, পূর্ণ পবিত্র, পূর্ণানন্দ, নিত্য এবং সর্ব্বব্যাপী, এবং তিনি আমাদের স্রষ্টা, পিতা, মাতা, বন্ধু, নেতা, বিচারক এবং পরিত্রাতা।

আত্মা—আত্মা অমর এবং চির উন্নতিশীল।

নৈতিক নিয়ম—ঈশ্বরের নৈতিক নিয়ম বিবেকের বাণী দ্বারা প্রকাশিত হইয়া সকল বিষয়ে পূর্ণধর্ম্ম পালনার্থ আদেশ করে। ঐকান্তিকভাবে আপনার নানাবিধ কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ জন্য

আমরা ঈশ্বরের নিকট দায়ী এবং ইহ পরকালে আমাদের পাপ পুণ্যের জন্য বিচারিত, পুরস্কৃত এবং দণ্ডিত হইব।

ধর্ম্মসমাজ—যে ধর্ম্মসমাজ সমস্ত প্রাচীন জ্ঞানরত্নের ভাণ্ডার এবং সমুদয় আধুনিক বিজ্ঞানের আধার; যাহা সমস্ত মহাজন এবং সাধুগণের মধ্যে সামঞ্জস্য, তাবৎ ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিতরে একতা এবং সমস্ত বিধানের মধ্যে পূর্ব্বাপর যোগ স্বীকার করে; যাহা সকল প্রকার পার্থক্য এবং বিভিন্নতা-সম্পাদক বিষয় পরিত্যাগ করে এবং সর্ব্বদা একতা এবং শান্তির মহিমা ঘোষণা করে; যাহা জ্ঞান এবং বিশ্বাস, যোগ এবং ভক্তি বৈরাগ্য এবং সামাজিক উচ্চতম কর্ত্তব্যের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করে; যাহা পূর্ণ সময়ে সকল জাতি এবং সমস্ত সম্প্রদায়কে এক রাজ্যে এবং এক পরিবারে বদ্ধ করিবে, তাহাই বিশ্বজনীন ধর্ম্মসমাজ।

সাধারণ ও বিশেষ আদেশ ও করুণা।—সাধারণ এবং বিশেষ নৈসর্গিক প্রত্যাদেশ এবং বিধাতার সাধারণ ও বিশেষ করুণা আছে।

ধর্ম্মশাস্ত্র।—ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে যে পরিমাণ প্রত্যাদিষ্ট প্রতিভাশালী মহাজনদিগের জ্ঞান, ভক্তি ও ধর্ম্মাচরণ, এবং মানবজাতির পরিত্রাণার্থ বিধাতার বিশেষ কৃপাবিধান লিপিবদ্ধ আছে, যাহার ভাবই কেবল ঈশ্বরের, কিন্তু অক্ষর মনুষ্যের, তাহাই (নববিধান) স্বীকার করেন ও শ্রদ্ধা করেন।

মহাজনগণ।—পৃথিবীর প্রত্যাদিষ্ট মহাজন এবং সাধুগণ যে পরিমাণে ব্রহ্মচরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন গুণ আয়ত্ত এবং প্রতিবিম্বিত করেন এবং পৃথিবীকে শিক্ষিত ও শোধিত করিবার

জন্য জীবনের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করেন, সেই পরিমাণে তাঁহা দিগকে গ্রহণ করিতে নববিধান বলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাহা কিছু ঐশ্বরিক গুণ আছে তৎপ্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি করা এবং তাহার অনুসরণ করা আমাদের উচিত; এবং সে সকল আমাদের আত্মার সহিত একীভূত করা এবং যাহা কিছু তাঁহাদের ও ঈশ্বরের তাহা আপনার করিয়া লইতে যত্ন করা আমাদের উচিত।

ধর্ম্মমত।—সেই ব্রহ্মবিজ্ঞান যাহা সকলকে জ্ঞান দান করে।

ধর্ম্মবার্ত্তা।—সেই ঈশ্বরপ্রেম যাহা সকলকে পরিত্রাণ করে।

স্বর্গ।—সকলের অনায়াসলভ্য ব্রহ্মগত জীবনই স্বর্গ।

মণ্ডলী।—সমস্ত সত্য, সমস্ত প্রেম, সমস্ত পবিত্রতার আধার ঈশ্বরের যে অদৃশ্য রাজ্য তাহাই (নববিধান) মণ্ডলী।

নববিধান মণ্ডলীতে কেহ প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে এই সকল বিশ্বাস স্বীকার পূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বেও কিছুদিন পিতা মাতা বা কোন ধর্ম্ম উপদেষ্টার নিকট নিয়মিত-রূপে শিক্ষা লইতে হইবে। উপদেষ্টা দীক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত বলিয়া আচার্য্যের নিকট অর্পন করিলে তবে আচার্য্য দীক্ষা প্রদান করেন।

প্রার্থনা সাধন।

এরূপে অনেক কষ্ট সাধ্য সাধনের দ্বারা যে এই নববিধান সাধন করিতে হইবে তাহা নহে, এক ব্যাকুল প্রার্থনাই ব্যক্তিগত ভাবে নব-বিধান সাধনার সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্ব প্রথম উপায়। ব্রহ্মানন্দও ধর্ম্মজীবনের

তাই প্রার্থনাই নববিধান সাধনের প্রধান উপায়। কিন্তু এ প্রার্থনা কেবল মুখের কথা নয়। প্রার্থনা কি ভাবে করিতে হয় ব্রহ্মানন্দ নবসংহিতায় নিম্নলিখিতরূপে অতি সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন :—

"অসাবধানতার সহিত কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে নহে, কিন্তু ব্যাকুলতা, সরলতা, জ্ঞান ভক্তি ও প্রেমের লালিত্য সহকারে (প্রার্থনা করিবে)।

"প্রতিদিন প্রার্থনা নূতন হইবে। নব প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় তাহা মিষ্ট ও সুন্দর হইবে; নূতন চিন্তা, নূতন ভাব এবং উচ্চ অভিলাষ প্রতিদিনই তাহাতে থাকিবে।

"আমাদের ঈশ্বর বৃথা বাক্যবিন্যাসে সন্তুষ্ট হন না। অভ্যস্ত বাক্যের বারংবার পুনরুক্তি, ধর্ম্মহীন অসার কথা, কৃত্রিম বিনয় ও দীনতা, বা অঙ্গভঙ্গী বা স্বরভঙ্গীতে তিনি সন্তুষ্ট নহেন। এ সকল বাস্তবিকই মহান্ পরমেশ্বরের প্রতি উপহাস এবং অবমাননা; এই সমুদয় জঘন্যতাকে তিনি ঘৃণা করেন।

"পারিবারিক দেবালয়ের প্রাত্যহিক উপাসনা সাতিশয় সারবান্ হউক! এবং প্রার্থিগণ যেন ভক্তিপূর্ণ রসনায়, জীবন্ত এবং নবভাবপূর্ণ হৃদয়ে সত্যেতে এবং ভাবেতে প্রার্থনা করেন।

"ঈশ্বরের গৃহে যাঁহারা প্রার্থনা করেন তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন, কেবল চাহিলে হইবে না, পাইতে হইবে; কেবল অন্বেষণ করিলে হইবে না, ঈশ্বরকে দেখিয়া তাঁহা হইতে পুণ্য, শান্তি, এবং তাঁহার শ্রীমুখের প্রত্যাদেশ ও আনন্দ লাভ করিতে হইবে।

"কারণ, তোমরা যদি দিবসের পর দিবস কেবল প্রার্থনাই কর, আর ভিক্ষাই চাও, তাহাতে তোমাদের কি পুরস্কার লাভ হইল? প্রভু পরমেশ্বর বলিয়াছেন, আমি প্রার্থনার উত্তর দিব, এবং প্রার্থীর মনোবাঞ্ছা

পূর্ণ করিব, ও দীন-হীন পাপীর প্রত্যেক সরল প্রার্থনা আমি সফল করিব।

"অতএব প্রার্থনান্তে যে পর্য্যন্ত ঈশ্বর কিছু কথা না কহেন, এবং স্বীয় করুণাগুণে প্রত্যেক হৃদয়কে জ্ঞান, প্রত্যাদেশ, পুণ্য ও আনন্দে পরিপূর্ণ না করেন, ততক্ষণ বিশ্বাসের সহিত অপেক্ষা করিয়া থাক।"

বাস্তবিক এই ভাবে না করিলে প্রার্থনা কেবল মৌখীক ব্যাপারই হইয়া থাকে, কিছুই ফলদায়ক হয় না। প্রার্থনা সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রবঞ্চনা না থাকে এজন্য ব্রহ্মানন্দ তাঁর জীবনবেদে এইরূপ বলিয়াছেন :—

"প্রার্থনা সম্বন্ধে প্রবঞ্চনা দূর করা আবশ্যক। যে প্রার্থনা করিয়া আদেশের জন্য অপেক্ষা করে না সে প্রবঞ্চক ; যার উপরে ভিতরে সমান নয়, যে বহুভাষী হয়, মনটাকে সে সময় ঠিক করে না সে প্রবঞ্চক। যে বহুভাষার স্রোতে ভাসিয়া যায় সে প্রবঞ্চক।

"সকালে প্রার্থনার সময় কি বলিয়াছে, বৈকালে মনে নাই, রবিবারে কি বলিয়াছে, মঙ্গলবারে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আর বলিতে পারে না সে প্রবঞ্চক।

"ধনমানের জন্য, সংসারের জন্য কিম্বা চৌদ্দ আনা ধর্ম্ম আর দুই আনা সংসারের জন্য অথবা সাড়ে পনের আনা পারত্রিক সদ্গতি আর আধ আনা সংসারের জন্য যে কামনা করে প্রার্থনা সম্বন্ধে সে প্রবঞ্চক। পরীক্ষাতে শিখিয়াছি, একটা পয়সা সংসারের জন্য যে চাহিবে তার সমস্ত প্রার্থনা বিফল। এই জন্য প্রার্থনা বিমল রাখিবে। শেষে ইহলোক পরলোক সমস্ত পৃথিবীর অধিকারী হইবে।

"যার বাড়ীতে রোগ বিপদ, কি টাকা কড়ির জন্য কষ্ট হইতেছে তার প্রার্থনার বড় ভাল অবস্থা। বিপদের সময় প্রার্থনা খুব হয়। পারত্রিক

মঙ্গলেরই কামনা করিবে, অথচ হইবে সকলই। যখন গৃহে বিবাদ, মত লইয়া কলহ, ঈশ্বরের সন্তানগণ তখন কেবল প্রার্থনাই করিবে। আসিবে প্রার্থনা করিয়া আর শান্তি স্থাপন হইবে। তাই বন্ধুদিগকে কেবল প্রার্থনাই করিতে বলি। সকলেই স্ত্রী পুত্র অপেক্ষা প্রিয় জানিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ জানিয়া, ধর্ম্ম ও সংসারের সম্বন্ধে সার বস্তু জানিয়া এই প্রার্থনাকে যেন আদর করেন।"

ব্রহ্মানন্দ যে প্রার্থনাকে কি আদরই করিতেন এই উক্তিতে বেশ বুঝা যায়। এই ভাবে প্রার্থনা করিলে তাহার সুফল যে অবশ্যম্ভাবী কে অস্বীকার করিবে?

উপাসনা সাধন।

প্রার্থনাই যদিও এই নববিধান সাধনের সহজ উপায়, কিন্তু ইহা সাধনের জন্য ব্রহ্মানন্দ আরও এক নূতন উপাসনা প্রণালী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই প্রণালী অনুসারে প্রথমে উদ্বোধন করিতে হয়, অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংযত করিয়া উপাস্য দেবতাকে সম্মুখস্থ উপলব্ধি করিয়া পূজা আরম্ভ করিতে হয়। তৎপরে বেদান্তোক্ত এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়,—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি শান্তং শিব মদ্বৈতং শুদ্ধমপাপ বিদ্ধং।" ইহা উচ্চারণ করিয়া নিম্নলিখিতরূপে এক একটী স্বরূপ প্রাণে উপলব্ধি করিতে হয়। তুমি সত্য আছ, তুমি জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যদাতা, তুমি অনন্তস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম, তুমি প্রেমময় মঙ্গলস্বরূপ, তুমি অদ্বিতীয় রাজা এবং প্রভু, তুমিই পুণ্যময় পরিত্রাতা এবং তুমি আনন্দময়ী জননী।

এই এক এক স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া পরে সকল স্বরূপের মিলন ধ্যান যোগে দর্শন করিতে হয়। আরাধনায় যে দর্শন তাহা অপেক্ষা ঘনীভূত দর্শন জন্য পুনরায় চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করার নিয়ম আছে।

ধ্যানের পর সকলকার সহিত এক সুর একাত্মা হইয়া এই বলিয়া সাধারণ প্রার্থনা করা হয়,—"অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও, হে সত্যস্বরূপ আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও, দয়াময় তোমার যে অপার করুণা তাহা দ্বারায় আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর, শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।" তার পর পারিবারিক দেবালয়ে ব্যক্তিগত অভাবের জন্য প্রার্থনা ও প্রকাশ্য মন্দিরে জগতের জন্য আচার্য্য কর্ত্তৃক প্রার্থনা করা হয়। তৎপরে ব্রহ্মের এক শত আট নাম পাঠ করিয়া, পরে শাস্ত্র পাঠ এবং শেষে প্রার্থনা করা হয়। পূর্ব্বে যেমন ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন, প্রার্থনা আধ্যাত্মিক অভাবের জন্যই করিতে হয়। বৈষয়িক কোন অভাবের জন্য প্রার্থনা করা উচিত নহে, কেন না বৈষয়িক অবস্থা যাহা আসে, তাহা সকলই বিধাতার মঙ্গলবিধান আমাদের বিশ্বাস করিতে হইবে। উপাসনাকালে মধ্যে মধ্যে সঙ্গীতেরও ব্যবস্থা আছে।

"ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানে" ব্রহ্মানন্দ বলেন অন্যূন দুইবার প্রতিদিন উপাসনা করিবে। কিন্তু ইদানীন্তন পূর্ণ উপাসনা তিনি দিনে একবারই করিতেন। উৎসবাদি উপলক্ষে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। দেহের পক্ষে আহার যেমন আত্মার পক্ষে উপাসনা তেমন। শরীর রক্ষার্থ পূর্ণ ভোজন দিবসে একবারই প্রকৃষ্ট, তবে সাধনের জন্য আত্মার ক্ষুধা অনুসারে মাঝে মাঝে অল্পাহার হইতে পারে। কিন্তু পৌরহিত্যে জন্য যাঁরা বার বার

দিবসে উপাসনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে উপকার না হইয়া অপকারই হইবার সম্ভাবনা।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্যক্তিগত সাধনের উপায় প্রার্থনা। কিন্তু নববিধান সাধন কেবল ব্যক্তিগত সাধনায় হয় না। মণ্ডলীগত সাধন বিনা নববিধান সাধন পূর্ণ হয় না; কেন না নববিধান সর্ব্বমিলন বিধান। পরিবার স্ত্রী পুত্র এবং মণ্ডলীর ভাই ভগ্নীগণ সহিত মিলিত হইয়া এই সাধন করিতে হয়। পাঁচ জনে একজন, এক মন, এক প্রাণ, এক দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হওয়াই নববিধানের উদ্দেশ্য। তাই করিবার প্রকৃষ্ট উপায় এই উপাসনা সাধন।

উপাসনাকালে যদিও পাঁচ জন একত্র বসেন, কিন্তু একজনই সকলের মুখপাত্র হইয়া উপাসনা করেন, সুতরাং যিনি করেন তিনিই যে একা করেন তাহা নহে। যেমন দেহের মধ্যে মুখ আহার করিলে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরও আহার করা হয়, ইহাও ঠিক সেইরূপ। একজন উপাসনা করেন সত্য, কিন্তু আর আর সকলকে তাঁহার সহিত একমন একপ্রাণ হইতে হয়। যিনি উপাসনা করিতেছেন তিনি আমিই করিতেছি প্রত্যেককে এইরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। আচার্য্যের সহিত কথায় কথায় ভাবে ভাবে একযোগ যাহাতে হয় এইরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। উপাসনার কতক অংশে যোগ দিলাম কিম্বা যোগ দিতে দিতে উঠিয়া গেলাম কদাপি এরূপ করা উচিত নহে। সমগ্র উপাসনায় যোগ না দিলে যোগ দেওয়াই হয় না, বরং তাহাতে উপাসনা অপরাধ হয়। উৎসব বা অনুষ্ঠান আদিতেও যাঁহারা আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যোগ না দিয়া আংশিক ভাবে যোগ দেন, তাঁহারাও ভয়ঙ্কর সাধন-অপরাধে অপরাধী হন। হিন্দু বা অন্যান্য প্রাচীন ধর্ম্মমণ্ডলীতে যেমন পুরোহিত পূজা করিয়া

ব্রহ্মানন্দ নিজ জীবনের সাধন দ্বারায় উপরোক্তরূপে যে পর্য্যায় স্থির করিয়াছেন তাহা সাধক মাত্রেরই সাধনের পক্ষে যে অতি উৎকৃষ্ট তাহা সাধন করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

প্রথমে ব্রহ্মকে সত্য বলিয়া তাঁর অস্তিত্ব উপলব্ধি, তার পর তিনি জড় নন চিন্ময়, তাঁর চিন্ময় প্রকাশ দেখিয়া তাঁর জ্ঞান দৃষ্টি যে আমাদের উপর আছে ইহা উপলব্ধি, তার পর তাঁকে দেখিলে তাঁর অনন্ত আকর্ষণ অনুভব ও আপনার সংকীর্ণতা ছাড়িয়া তাঁর পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য হইবেই, তার পর আপনার অপূর্ণতা দেখিয়া তাঁরই প্রেমরূপ স্মরণ ও তাঁর কৃপার উপর আত্মার নির্ভর চেষ্টা স্বাভাবিক, তার পর তিনিই যে একমাত্র গতিমুক্তি ভরসা উপলব্ধি করিয়া তাঁর একত্বের স্মরণাপন্ন হওয়া এবং তার পর তাঁর স্মরণাগত হইলেই তিনি তাঁর মনের মত করিতে আত্মাকে শুদ্ধ করিয়া লইবার জন্য তাঁর শুদ্ধরূপ প্রকাশ করেন, অতঃপর আত্মা শুদ্ধ হইলে তবে তাঁর আনন্দস্বরূপ উপলব্ধি করিবার অধিকার হয় এবং ব্রহ্মই যে একমাত্র আনন্দ ও প্রাণারাম তাহা উপলব্ধ হয়। এই যে পর্য্যায় ইহার ন্যায় সাধনের সহায় আর কি প্রণালী হইতে পারে? এই স্বরূপ সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য ব্রহ্মসহবাসে ব্রহ্মের এক এক স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাহার প্রভাব লাভে আত্মারও বৃত্তি সকলকে পরিপুষ্ট করা; তাহা করিতে হইলে এই পর্য্যায়ক্রমে স্বরূপ-সাধন যে আত্মার বিশেষ উপকারী বলা বাহুল্য।

তা ছাড়া উপাসনায় এক সাধন প্রণালী বাঁধা থাকিলে যাঁহারা উপাসনায় যোগ দিবেন তাঁহাদেরও এক উপাসনা করিবার বিশেষ সুবিধা হয়। এক ভ্রাতৃমণ্ডলী হওয়াই যখন উপাসনা সাধনের গূঢ় উদ্দেশ্য, তখন এক প্রণালী না হইলে কখনই উপাসনায় পরস্পরের যোগ হইতে পারে না,

একত্র উপাসনা করিতে হইলে, ভাবে ভাবে কথায় কথায় যত পরস্পরের মিলন হয় ততই এক-প্রাণতা সাধনের উপায় হয়। সেই জন্য এ সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করিয়া সকলেরই এক প্রণালী অবলম্বন করা উচিত।

একত্র উপাসনা সাধন জন্য ব্রহ্মানন্দ নবসংহিতাতে আরো কএকটী নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, তিনি বলেন :—

"প্রতিজন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আপনার আসনে উপবেশন করিবে; যাহা পরের অথবা যাহা প্রাত্যহিক ব্যবহার দ্বারা সুপরিচিত বা নিজস্ব হয় নাই, তদুপরি উপবেশন করিয়া আসনসম্বন্ধে স্বেচ্ছাচারী হইও না।

"যে আসনে বসিয়া উপাসনা কর তাহাকে প্রীতি ও সম্মান করিবে, সাধনের সহচর ও বন্ধু বলিয়া তাহাকে জানিবে, এবং বিদেশ ভ্রমণকালে উহা তোমার সঙ্গে লইয়া যাইবে।

"দেবালয়ে পারিবারিক বেদীর চারি পার্শ্বে স্বামী স্ত্রী, ভ্রাতা ভগ্নী, পিতা পুত্র, মাতা কন্যা, সকলে আপনাপন নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিবেন। যদি অভ্যাগত বা বন্ধুগণ উপাসনায় যোগ দান করেন, তাহা হইলে এক দিকে পুরুষ ও অপর দিকে মহিলাগণ স্বতন্ত্র ভাবে বসিবেন।"

এই নিয়মগুলী যে সাধনের পক্ষে বিশেষ সহায় বলা বাহুল্য।

এক্ষণে ব্রহ্মানন্দ আরাধনার পর ধ্যানের যে উদ্বোধন বিধি করিয়া দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধেও কাহারও কাহারও কিছু কিছু আপত্তি শুনা যায়। এই উদ্বোধনে তিনি আরাধনায় ঈশ্বরকে দ্বিতীয় পুরুষে অর্থাৎ "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করিতে করিতে আবার, "যাঁহার উপাসনা করিলাম এক্ষণে তাঁহার ধ্যান করি, তিনি তাঁহার সহবাসে রাখিয়া আমাদের সকলকে শুদ্ধ করুন" এইরূপ বলিতেন। ইহা অস্বাভাবিক বলিয়া অনেকে নাকি আজ কাল এরূপ উদ্বোধন পরিত্যাগ করিতেছেন।

এ সম্বন্ধে একটু নিগূঢ়ভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে আরাধনার ব্রহ্মদর্শন ও ধ্যানের ব্রহ্মদর্শন একই নহে। আরাধনায় দর্শন ব্রহ্মস্বরূপকে বিশ্লেষণ করিয়া দর্শন, তাহা বাক্যযোগে দর্শন; ধ্যানে দর্শন সর্ব্বস্বরূপের মিলন ঘনীভূত ভাবে দর্শন। আরাধনায় দর্শন সবে মিলে দর্শন; ধ্যানে দর্শন, একা একা নির্জ্জনে দর্শন। সুতরাং যাহা বাহিরে আরধনায় দেখিতেছিলাম তাঁহাকে ঘনীভূত ভাবে দেখিবার জন্য মনকে আরো অধিকতর প্রস্তুত করা স্বাভাবিক, এবং আরাধনায় যতটুকু ব্রহ্ম দেখিতেছিলাম ধ্যানে ততটুকু নন, তখন পূর্ণ তিনি, সুতরাং আরাধনার দর্শন ছাড়িয়া ধ্যানের দর্শনে তাঁহার পূর্ণ ব্যক্তিত্ব দেখিতে হইল নিশ্চয়ই তিনি সে "তুমি" আর থাকেন না, তাই তখন "তিনি" বলিয়াই উদ্বোধন করিতে হয়। সর্প যেমন ভেককে ধরিয়া তাহাকে ভাল করিয়া উদরস্থ করিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়া আবার লাফাইয়া ধরে, আরাধনায় যে দেখা দেখিতেছিলাম ধ্যানে তাহা অপেক্ষা ভাল করিয়া দেখিতে আরাধনাকৃত ব্রহ্মকে ছাড়িয়া দিয়া নূতন করিয়া তাঁহাকে তাঁর সেই পূর্ণভাবে ধরা ইহাই ধ্যানের সাধন।

যাহাহউক শ্রীব্রহ্মানন্দ প্রবর্ত্তিত এই উপাসনা সাধন প্রণালী যে এক নবাবিষ্কৃত উৎকৃষ্টতম ধর্ম্মসাধন প্রণালী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন দ্বারায় ঈশ্বর উপাসনা বা ঈশ্বরের নাম গান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, আমাদের ব্রহ্মানন্দ প্রবর্ত্তিত এই উপাসনাও অনেকটা সেই সঙ্গীতের গদ্যরূপ বাক্য যোগে মনকে ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করান বা ব্রহ্মসঙ্গ করা বলা যাইতে পারে।

এই উপাসনা পদ্ধতি আরো গভীর ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখাযায় নববিধানের ক্রমবিকাশ যাহা রাজা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া মহর্ষির মধ্য দিয়া ব্রহ্মানন্দ দ্বারায় প্রস্ফুটিত হইয়াছে, ইহাতেও

তাহার অনুরূপ ভাব নিহিত রহিয়াছে। ইহাতেও রাজা রামমোহনের ব্রহ্মজ্ঞান, মহর্ষির ব্রহ্মধ্যান এবং ব্রহ্মানন্দের ব্রহ্মানন্দরসপান সাধন সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে।

উপাসনা প্রণালীতে যে উদ্বোধন ইহা রাজা রামমোহনেরই ভাব। যথার্থ উপাসনার উদ্বোধন করিবার সময় প্রাণে রামমোহনের উদ্বোধিনী সঙ্গই অনুভূত হয়। বেদান্ত মন্ত্র পাঠে মহর্ষির ভাবে তাহা পাঠ করিলেই ব্রহ্ম দর্শন সহজ হয়, এবং আরাধনা সাধনে ব্রহ্মানন্দ আচার্য্য হইয়া আমায় লইয়া তাহা করিতেছেন ইহাই উপলব্ধ হয়।

তারপর ধ্যানে সর্ব্বজনে একজন হওয়া হয়। নাম পাঠে যেখানে যত ভক্ত আছেন যাঁহারা ব্রহ্মকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ভক্তি যোগে অভিহিত করিয়া দর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের সহিত যোগ হয়। শাস্ত্রপাঠে বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র ও বিভিন্ন ধর্ম্মের সহিত যোগ হয়। পরিশেষে সাধক সকলকে লইয়া আপনাতে আপনি আসিয়া প্রার্থনা করেন। মধ্যে মধ্যে সঙ্গীতের ধারায় সকল ভাব মধুর করিয়া দেয়।

অধুনা শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দের প্রার্থনাও নববিধান সাধনের এক নূতন পরম উপাদেয় সহায় রূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধেও অনেককে অনেক কথা বলিতে শুনা যায়। কেহ ইহাকে শাস্ত্রের মত মনে করিয়া পাঠ করেন, কেহ ইহাকে উপদেশের উদ্বোধন বা Text সাধুবচন-রূপে গ্রহণ করেন, কেহ বা ইহাতে নববিধ কুসংস্কার আসিতে পারে এইরূপ ভয় করিয়া কখনও বা পড়েন, কখনও পড়েনও না; আবার কেহ কেহ হয় তো ইহা পড়াই একটা কুসংস্কার মনে করেন। কিন্তু এ সকল প্রকার ভাবই আমরা একান্ত দূষিত মনে করি। শ্রীব্রহ্মানন্দের প্রার্থনা একেবারেই আমাদের কেবল পাঠের বিষয় নয়। প্রার্থনা পড়িলে তাহা আর প্রার্থনাই রহিল না। প্রার্থনা

পড়িতে হয় না, করিতে হয়। ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন তিনি বাল্যকালে লিখিয়া প্রার্থনা করিতেন। তিনি প্রার্থনা লিখিয়া পড়িতেন না, তিনি লিখিয়া প্রার্থনা করিতেন। সেইরূপ ব্রহ্মানন্দের লিখিত প্রার্থনা আমাদের কেবল পড়িলে হইবে না, তাঁহার সহিত মিলিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে। ব্রহ্মানন্দ আমাদিগকে তাঁহারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছেন বিশ্বাস করিয়া আমাতেই তিনি আমার "উচ্চ আমি," আমার "উপাসনাকারী আমি" হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন এই উপলব্ধি করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই তাঁহার প্রার্থনা আমার হইবে।

বাস্তবিক এই উপাসনা প্রণালীর ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সাধন প্রণালী জগতে আর কোথাও আছে কি না জানি না। ব্রহ্মানন্দ এই সাধন প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া এবং নিজ জীবন দ্বারায় তাহা প্রতিষ্ঠা করিয়া সত্যই জগতে এক নূতন পরিত্রাণের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন।

নবসংহিতা সাধন।

উপাসনাও কেবল ভাবমাত্র, যদি না জীবনে তাহা পরিণত ও প্রতিফলিত হয়। তাই উপাসনা সাধনই যদিও নববিধানের নবজীবন লাভের সর্ব্বপ্রধান উপায়, কিন্তু উপাসনা ছাড়া কার্য্যতঃ কতকগুলি নিষ্ঠা অবলম্বন বিনা জীবনে ও পরিবারে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয় না। এই জন্য সমগ্র সমাজে একনিষ্ঠা এক ধর্ম্ম সাধন প্রবর্ত্তনের জন্য ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মালোক প্রাপ্ত হইয়া "নবসংহিতা" প্রচার করিয়াছেন। এই নবসংহিতা অবলম্বনে সমগ্র ভারত এক ধর্ম্মাবলম্বী হইবে

এই তাঁর বিশ্বাস। তিনি এই সংহিতা সম্বন্ধে তাই প্রার্থনা করিয়াছেন:—"হে অনন্তজ্ঞান, এই পুণ্য ভূমিতে ভ্রাতা এবং ভগ্নীর যে অভিনব মণ্ডলী তুমি সংস্থাপন করিয়াছ তাহার পরিচালনার্থ তোমার নূতন বিধান যথাযথরূপে প্রচারের জন্য তোমার প্রেরিত সেবককে আলোক প্রদান কর। প্রত্যেক হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে তোমার বিধি তুমি লিখিয়া দাও, দেশের সীমা হইতে সীমান্তরে বজ্রধ্বনিতে তাহা ঘোষণা কর।"

"মা, সমস্ত ভারতবর্ষের লোক তোমার এই বিধি লউন। একবার তুমি মহারানী হইয়া সিংহাসনে বসিয়া আদেশ প্রচার কর। আমরা যেন তোমার আশীর্ব্বাদে সমুদয় স্বেচ্ছাচার অবিশ্বাস দূর করিয়া তুমি যাহা বলিবে লিখিয়া দিবে সব গ্রহণ করিয়া সদাচারের পথে থাকিয়া দিন দিন শুদ্ধ হই।"

তবে তিনি অন্য স্থানে ইহাও "স্পষ্ট বলিয়াছেন যে "এই সংহিতা যেন নূতন প্রকারের কুসংস্কার প্রণোদিত অভ্রান্ত পুস্তক না হয়, ইহার ভাবই ভগবানের, কিন্তু ভাষা যেন মানুষের বলিয়া মনে থাকে।" তাই বলিয়া আবশ্যক না হইলেও কেবল মিথ্যা উদারতা দেখাইবার জন্য বা পাছে ইহার নির্দ্দিষ্ট ভাষাও,—যাহা ব্রহ্মানন্দের কলমে আসিয়াছে বলিয়াই তিনি লিখিয়াছেন, নিজে ভাবিয়া চিন্তিয়া টানিয়া বুনিয়া রচনা করেন নাই,—তাহা বদল না করিলে কুসংস্কার হইবে এই ভয়ে যে তাহা বদলাইতেই হইবে ইহাও স্বেচ্ছাচারিতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যাহাহউক এই নবসংহিতায় প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রতি জনকে যে ভাবে জীবনযাপন করিতে হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানাদি ও ব্রতাদি সাধনেরও সুন্দর ব্যবস্থা আছে। সকল পরিবার এক ভাবে ইহা সাধন করিলে ইহাতে ব্যক্তিগত জীবনও

উ..ত হয়, এবং পরিবারস্থ এবং মণ্ডলীস্থ সকল ব্যক্তিরই পরস্পরের সহিত একতা বন্ধনও হয়।

নবসংহিতার মূল বিধি এই:—বি াসী ব্যক্তি তাঁর বাস গৃহকে পরিষ্কার ও সুশৃঙ্খলা সম্পন্ন করিয়া রাখিবেন। বাস ূহ এবং অন্তর্গত সামগ্রী সমস্ত ঈশ্বর হইতে সমাগত এবং পবিত্র দান স্বরূপ জনিয়া শ্রদ্ধা করিবেন, এবং দ্রব্যাদিসহ তাঁহার বাসভবনকে ঈশ্বরের পদে উৎসর্গ করিবেন।

সাত ঘণ্টার অধিক কেহ নিদ্রা যাইবেন না, প্রত্যেককে প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিতে হইবে, উঠিয়াই ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া এই ভাবে প্রার্থনা করিতে হইবে, "হে মঙ্গলময় পরমেশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ যে আর একটী দিবস দেখিবার জন্য আমি জীবিত রহিলাম। আমাকে আশীর্ব্বাদ কর এবং পরিচালন কর যেন অদ্যকার দিন আমার পক্ষে পুণ্য ও শান্তির দিন হয়।"

তারপর দৈনিক সংবাদ পত্রাদি পাঠ এবং যে সকল কর্ম্ম করিলে নয় তাহা সম্পন্ন করিয়া ভক্তিভাবে স্নানাবগাহন করিতে হইবে। স্নানের সময় ঋগ্বেদের এই শ্লোক স্মরণপূর্ব্বক স্নান করা বিধেয়:—

"আপোঽস্মান্ মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু
রিপ্রং হি বিপ্রং প্রবহন্তি দেবীঃ
উদিদাভ্য শুচিরাপূতা এমি।"

"মতাজল আমাদিগকে শুদ্ধ করুন। আমাদের সমুদয় মালিন্য ধৌত করিয়া লইয়া হউন। এই জল হইতে বিশুদ্ধ হইয়া বাহির হইয়া আসি।" দেবনন্দন ঈশার জলসংস্কার মন্ত্রও স্মরণীয়।

স্নানের পর প্রতিদিন নিষ্ঠার সহিত প্রণালীমত উপাসনা করিতে হইবে, সে উপাসনা যেন সারবান, ভক্তিপূর্ণ রসনায় জীবন্ত এবং নবভাব পূর্ণ হয়ে সত্যেতে এবং ভাবেতে করা হয়।

উপাসনার পর আহারও শান্তভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে, আহার সামগ্রী সম্মুখে পাইলে এইরূপে প্রার্থনা করিয়া তাহা আহার করিতে হইবে, "হে মঙ্গলময় ঈশ্বর সম্মুখস্থ এই ভোজন সামগ্রীকে আশীর্ব্বাদ কর যেন ইহা আমাদিগকে পবিত্র করে।"

"ভোজ্য বস্তুতে ঈশ্বরের পুত্রকেও স্মরণ কর, তাঁহার জীবনকে আহার কর তাঁহার মাংসকে তোমার মাংস এবং তাঁহার রক্তকে তোমার রক্ত কর এবং আমাদিগকে চিরকালের জন্য তোমার মধ্যে বাস করিতে দাও," এই ঈশ্বর বাণীও শ্রবণ করিয়া সেই ভাবে আহার করিবে।

পূর্ব্বাহ্ণ ভোজনান্তে গৃহস্থ কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া কার্য্যালয়ে যাইবেন। প্রত্যেককে অন্ততঃ প্রতিদিন সাত ঘণ্টাকাল সমান ভাবে স্থির উদ্যমের সহিত পরিশ্রম করিতে হইবে। দৈনিককার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি প্রভু পরমেশ্বরকে স্মরণ করিবেন। ঈশ্বরকেই প্রভু জানিয়া তাঁহার চক্ষের সম্মুখে বসিয়া সকল কার্য্য পবিত্রভাবে সম্পাদন করিবেন। কার্য্য স্রোতে পড়িয়া যদি কখনও তাঁহার প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয় তিনি "আমাকে রক্ষা কর" ইত্যাদি বলিয়া মনে মনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রার্থনা করিবেন।

দিবসের কার্য্য সমাধা করিয়া গৃহী ব্যক্তি নির্দ্দোষ আমোদ এবং সুখের অনুসরণ করিবেন। কেন না পরিশ্রম এবং আমোদ, কর্ম্ম এবং বিশ্রাম উভয়ই অতি পবিত্র এবং স্বর্গীয়। তবে আমোদ যেন বিশুদ্ধ হয় আমোদ যেন দেবানন্দের পূজা হয়। সুরাপান বারবনিতাসঙ্গ বা বিলাস-সুখান্বেষণে যেন কেহ আমোদ অনুভব না করে।

সায়ংকালীন ভোজনান্তে বা তৎ পূর্ব্বে যখন অবসর পাইবে সৎগ্রন্থ কিংবা সাময়িক পত্রিকা পাঠ করিবে। তবে অধ্যয়ন যেন বৃথা বা নিস্ফল না হয় এবং তাহা যেন নীতিকে বিকৃত না করে। অতিরিক্ত উপন্যাস পাঠ, নাস্তিকতার পুস্তক ও অশ্লীল গ্রন্থ পাঠে যেন কেহ সুখানুভব না করে। সর্ব্বাপেক্ষা শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠই আত্মোন্নতির উৎকৃষ্ট উপায়।

গৃহস্থ ব্যক্তি নিস্বার্থ হইয়া দয়াব্রত সাধন করিবেন। দরিদ্রকে অর্থদান, ক্ষুধার্ত্তকে ভোজ্য, তৃষ্ণাতুরকে পানীয় বস্ত্রহীনকে বস্ত্র রোগীকে শুশ্রুষা, গৃহহীনের জন্য গৃহনির্ম্মাণ, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা, বিধবা ও অনাথ বালকদিগের দুঃখমোচন, দরিদ্র ছাত্রদিগকে পাঠ্য পুস্তক দান, এবং চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, উপাসনালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য দান ইত্যাদি সাধারণ দাতব্য কার্য্যেও তিনি মনোযোগী হইবেন। ইহা ব্যতীত দুর্ভিক্ষ মহামারী ইত্যাদিতেও বিশেষ বিশেষ সময়ে সাধ্যমত সাহায্য করিবেন।

এতব্যতীত স্বজন, ভাই ভগ্নী, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা, দাসদাসী ইত্যাদির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে এবং ক্রীয়াকলাপ ও ব্রতাদি কিরূপে সাধন করিতে হইবে নবসংহিতায় তাহা বিশেষরূপে বিবৃত রহিয়াছে। এ সমুদয় সাধনই যে জীবনে, পরিবারে ও মণ্ডলীতে নববিধান প্রতিষ্ঠার উপায় বলা বাহুল্য। সুতরাং ইহা অবলম্বনে যেন কেহ পরাঙ্মুখ না হন।

নবসংহিতায় যে অনুষ্ঠান পদ্ধতি ব্রহ্মানন্দ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার ন্যায় অপৌত্তলিক ও কুসংস্কার বিবর্জ্জিত উৎকৃষ্ট পদ্ধতি বর্ত্তমান সময়ে কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু একথা সকলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেও, পাছে কেশবচন্দ্রের গৌরব বাড়ান হয় বা পাছে কেহ কোন কালে এই পদ্ধতিকেই অভ্রান্ত করিয়া ফেলে এই ভয়ে এদিক ওদিককার

দুএক কথা অদল বদল করিয়া কেহ কেহ আপনাদের স্বাধীন বা স্বেচ্ছাচারী মত বজায় করিতে চান দেখা যায়। প্রথমতঃ তুমি আমি যে যা খুসি করিব তাহাও ভাল, তথাপিও কেশবচন্দ্রের ন্যায় ধর্ম্মাচার্য্য প্রত্যক্ষ ঈশ্বর প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা লইব না, ইহার ন্যায় দৃষ্টতা আর কি হইতে পারে জানি না। আরও দেখা যায় যাঁরা সে পদ্ধতিকে বিশুদ্ধ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছেন এবং কেবল "নবসংহিতা" নামটি বাদ দিলেই সে পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠানও করিতে অস্বীকার করেন না, কেবল নামটি করিলেই অমনি মহাসর্ব্বনাশ হইবে যেন মনে করিতেছেন। ইহাও কি তাঁহাদের এক প্রকার কুসংস্কার নয়? এবং ইহাতে তাঁহারা যে কত দূর ঠিক সত্যের আদর করেন তাহা তাঁহারই সংযতচিত্তে ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া আপনারাই বুঝিয়া লউন। বালকের মুখ হইতেও সত্য শিক্ষা করিবে যাঁহাদের আদি শাস্ত্র তাঁহাদের পক্ষে ইহা সত্যদ্রোহীতা ভিন্ন আর কি বলিব এবং ইহা যে নিতান্তই অধর্ম্ম কে অস্বীকার করিবে? নবসংহিতায় যদি সত্য থাকে কেন ইহা পরিত্যাগ করিব? সত্যের জয় যে অবশ্যম্ভাবী।

ব্রত ও অনুষ্ঠানাদি।

শ্রীব্রহ্মানন্দ কোন সত্যানুসন্ধানকারীর প্রশ্নোত্তরে "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রে একবার লেখেন:—"ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সাধারণ লোকের বোধগম্য হইবে না, কেবল শিক্ষিত এবং উন্নত ব্যক্তিরাই তাহা বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে পারিবে। সাধারণ লোকের জন্য ইহাতে বাহ্যিক ব্রত অনুষ্ঠানাদি প্রবর্ত্তন করিয়া

আহাদের হৃদয়গ্রাহী করিতে হইবে। কিন্তু সে সকল বাহ্য অনুষ্ঠানও সম্পূর্ণ অপৌত্তলিক ও নির্দ্দোষ হইবে। সাধারণ লোকের গ্রহণোপযোগী করিতে ইহার ভক্তির ভাব, কর্ম্মানুষ্ঠান ভাব, ক্রীয়াকলাপের ভাব অধিক-রূপে প্রদর্শন করিতে হইবে। এ ধর্ম্মে শিশু-আত্মা ও বিজ্ঞ-আত্মা উভয়েরই সমান খাদ্য রহিয়াছে।"

এই জন্য ব্রহ্মানন্দ কতকগুলি ব্রত সাধন বিধি ও কতকগুলি বাহ্য অনুষ্ঠানপদ্ধতি নববিধানে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বালক বালিকাদের জন্য, যুবক যুবতীদের জন্য, স্ত্রীলোকদিগের জন্য এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন সাধক সাধিকাদের জন্য তিনি নানাপ্রকার ব্রত নিয়মিত করেন। এক দিকে যেমন উচ্চ আধ্যাত্মিকতা যোগ ভক্তি সাধনের ব্যবস্থা, অপরদিকে তেমনই বিবিধ প্রকারের কর্ম্মানুষ্ঠান বিধান করিয়া তিনি নববিধানকে সর্ব্বপ্রকার অবস্থা-পন্ন ব্যক্তিরই উপযোগী ধর্ম্ম করিয়াছেন।

তিনি যে কেবল লোক সাধারণের জন্যই বিধি করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহা নহে। নিজেও যেমন যোগ ভক্তি জ্ঞান ইত্যাদি উচ্চ আধ্যাত্মিকতা সাধন করিয়াছেন, তেমনি সামান্য সামান্য ব্রতও সময়ে সময়ে লইয়া ধর্ম্মসাধন কিরূপে করিতে হয় তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার দেহে অবস্থানকালে বোধ হয় এমন দিনই ছিল না, যে দিন না কিছু না কিছু নূতন ব্রত তিনি সাধন করিয়াছেন। কখনও নিজ হস্তে রন্ধন, কখনও পাদুকা ত্যাগ, কখনও মস্তক মুণ্ডন, কখনও প্রচারকদিগের পাদোদক গ্রহণ, কখনও প্রচারকদিগের কাপড় যোগান ইত্যাদি কতই ব্রত তিনি সাধন করেন।

প্রচারক মহাশয়দিগকেও কাহাকেও রন্ধন ব্রত, কাহাকেও বাসন মাজিবার ব্রত, কাহাকেও পান সাজিবার ব্রত, কাহাকেও ঘর ঝাট

দিবার ব্রত, কাহাকেও বা আহারের পূর্ব্বে প্রত্যেকের পদ প্রক্ষালনের ব্রত ইত্যাদি কত প্রকার ব্রতই সময়ে সময়ে দিতেন। যুবকদিগকেও কখনও নিজ নিজ দৈনিক দোষ স্মরণপূর্ব্বক তাহা লিপিবদ্ধকরণ ব্রত, কখনও আকাশ-সাধন ব্রত, কখনও তৃণ-সাধন ব্রত প্রদান করিতেন। নারীদিগকেও মাঝে মাঝে সরবত দান ব্রত, পাখাদান ব্রত ইত্যাদি দিতেন। শিশুদিগকেও পশু পক্ষী সেবা, বৃক্ষ সেবা ইত্যাদি তাহাদের উপযোগী ব্রত দিতেন, এমনই কার্য্যতঃ ধর্ম্ম সাধনের কতই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

তিনি নবসংহিতাতে প্রধানতঃ এই কয়েকটী ব্রত আদর্শরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ—বালক বালিকাদিগের চিত্রসাধন ব্রত, রিপুসংহার ব্রত, আধ্যাত্মিক উদ্বাহ ব্রত, চিরকৌমার ব্রত, বৈধব্য ব্রত, গৃহস্থ বৈরাগী ব্রত এবং প্রচারক ব্রত। এতদ্ভিন্ন সময়ে সময়ে যাঁহার যেমন সাধনের আবশ্যক হইবে, তিনি ঈশ্বরাদেশে ক্ষুদ্র বৃহৎ যে কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হউক সেই রূপ ব্রত লইবেন ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। এই ব্রতাদি গ্রহণ সম্বন্ধে তিনি নবসংহিতায় এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন ঃ—

"ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে, ব্রত সকলের নিজের কোন গুণ নাই ; কিন্তু তাহাদের ফলবত্তা এবং প্রত্যেকেরই যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে তৎপক্ষে কেহ যেন তর্ক উত্থাপন না করেন।

"কেবল মাত্র উপকারলাভার্থ ব্রত গ্রহণ প্রয়োজন, তদ্ভিন্ন কোন প্রকার সম্মান বা গৌরব বৃদ্ধির অনুরোধে কখনও তাহা গ্রহণ করিবে না।

"যে ব্রত একজনের পক্ষে কল্যাণকর, অন্যের পক্ষে তাহা তদ্রূপ কল্যাণকর বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইবে না ; যে সকল ব্রত সময় বিশেষে শুভকর তাহা সকল সময়েই শুভকর বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

"কারণ ব্রত সকল বাস্তবিকই ব্যক্তিবিশেষের জন্য; ঔষধ সেবনের ন্যায় তাহা কেবল জীবনের বিশেষ অবস্থায় এবং বিশেষ প্রয়োজনে অবলম্বনীয় হয়।"

শরীরকে অধিক কষ্ট দিয়াও ব্রতগ্রহণ ব্রহ্মানন্দের অনুমোদিত নহে। তিনি প্রচারক মহাশয়দিগকে ইন্দ্রিয় সংযম সাধন জন্য যখন নানাপ্রকার ব্রত লইবার ব্যবস্থা করেন তখনও প্রচারক সভার নির্ধারণে বলেনঃ—"শরীরকে সুস্থ রাখিয়া শারীরিক কষ্ট গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ এরূপ করিলে শরীর বহুদিন সাধনের উপযোগী থাকিবে, অন্যথা সাধনেই ব্যাঘাত পড়িবে।"

এই ব্রত গ্রহণ সম্বন্ধে তিনি নবসংহিতায় আরো বলেনঃ—

"যেখানে কার্য্যতঃ কোন প্রয়োজন নাই সেখানে ব্রত গ্রহণ অধিকন্তু এবং অনর্থক বাহ্যাড়ম্বর মাত্র।

"আত্মার যতগুলি অভাব এবং প্রয়োজন আছে সেই পরিমাণে তাহার পরিশুদ্ধির জন্য মণ্ডলী ব্রত ব্যবস্থাপিত করিবেন।

"কিন্তু ঈশ্বরের বল ব্যতীত কোন মনুষ্যই ব্রত উদ্‌যাপনে সক্ষম নহে। কারণ মনুষ্য কেবল সঙ্কল্প করে এবং শুদ্ধতা লাভের জন্য প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা তাহাতে সফলতা দান করে।

"প্রার্থনাই সমস্ত ব্রত সাধনের প্রাণ, এবং প্রার্থনাতেই কেবল সে সমুদয়ের সফলতা। সুতরাং ঈশ্বরের নিকট আন্তরিক সরল এবং বিনীত প্রার্থনা ভিন্ন ব্রতসম্বন্ধীয় পদ্ধতি অনুষ্ঠান বা কালব্যাপ্তিতে কোন গুণ নাই।

"অতএব যখন তুমি ব্রত গ্রহণ করিবে তখন যাবতীয় অহঙ্কার অভিমান পরিহার করিয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর কর; এবং

একাগ্রহৃদয়ে তোমার স্বর্গস্থ পিতার প্রদত্ত সাহায্য এবং আলোকের জন্য ভিখারী হও।"

ব্রত গ্রহণকালে সাধক মাত্রেরই যে এই সকল নিয়মপালন করা নিতান্ত আবশ্যক বলা বাহুল্য।

বাস্তবিক প্রার্থনা এবং উপাসনাই ব্রত গ্রহণের প্রাণ। তাই সর্ব্ব-প্রকার ব্রত গ্রহণের প্রারম্ভে উপাসনা করিয়া প্রার্থনাপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিতে হইবে ব্রহ্মানন্দ ইহাই বিধি করিয়াছেন। এই উপাসনা প্রার্থনা কি ভাবে করিতে হইবে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ উপাসনা সম্বন্ধেও সকলের কোনরূপ গাম্ভীর্য্যের অভাব না হয়, এজন্য প্রচারকদিগের সভায় ব্রহ্মানন্দ নির্দ্ধারণ করেন ঃ—

"(১) উপাসনার সময় হাঁচি, কাশী, গলার শব্দ, ও ঢেঁকুর যতদূর সম্ভব দমন করিতে হইবে। (২) উপাসনান্তে অবনত মস্তকে নমস্কার করিবার সময় মুখে প্রার্থনা বা সঙ্গীত করা অবিধেয়। (৩) যদি কাহারও উপাসনা শেষ না হইয়া থাকে সে স্থলে গল্প বা আমোদ করা বা কোন প্রকারে যোগভঙ্গ করা নিষিদ্ধ। (৪) উপাসনার পর গম্ভীরভাবে চলিয়া যাওয়া আবশ্যক।"

এই সকল কুঅভ্যাস বা উপাসনা কালে নিদ্রা বা অঙ্গভঙ্গী করা যাহাদের অভ্যাস আছে তাঁহাদের এ সমুদয় ত্যাগ করিবার জন্যও বিশেষ ব্রত লওয়া কর্ত্তব্য।

এই ব্রতাদি ব্যতীত মণ্ডলীর শিক্ষা সাধনের জন্য ব্রহ্মানন্দ কয়েকটী বাহ্য অনুষ্ঠানও সম্পাদন করেন। তাহার মধ্যে জলসংস্কার, হোম, সাধু-ভোজন, দণ্ডধারণ, আরতি ও নিশান বরণ প্রধান। ব্রহ্মানন্দ প্রাত্যহিক স্নানের সহিত জলসংস্কার এবং প্রাত্যহিক ভোজনের সহিত সাধু-ভোজন সাধন বিধি নবসংহিতায় বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। অন্যান্য

অনুষ্ঠানের মধ্যে এখন উৎসবের সময় মন্দিরে "আরতি" ও তাঁহার আলয়ে মহিলাগণ কর্ত্তৃক "নিশান বরণ" হইয়া থাকে।

প্রকাশ্যভাবে ব্রহ্মানন্দ একবারমাত্র কমল সরোবরে "জলসংস্কার" অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন, তাহাতে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মের জলসংস্কার এবং হিন্দুধর্ম্মের স্নানযাত্রার স্নান মিলাইয়া পিতা পুত্র পবিত্রাত্মা বা সচ্চিদানন্দকে স্মরণপূর্ব্বক আপনিও স্নাত হন এবং অনুগামী প্রচারক ও সাধকদিগের মস্তকেও অভিষেক প্রদান করেন। জলে যেমন মলীনতা ধৌত হয়, তেমনি পবিত্রাত্মার শান্তিজলে মনের ও আত্মারও মলীনতা ধৌত হউক এই কামনাই ইহার সাধন।

সেইরূপ একবার অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহাতে ছয় খণ্ড কাঠ ও ঘৃত নিক্ষেপ করতঃ "হোমানুষ্ঠান" করেন এবং প্রার্থনা করেন এই অগ্নিতে যেমন এই ছয়খান কাঠ পুড়িয়া গেল, এইরূপ আমার মনের ষড়রিপুও ব্রহ্মাগ্নিতে পুড়িয়া ধ্বংস হউক।

একবার বিশেষ ভাবে বন্ধুবর্গকে লইয়া "সাধু-ভোজন" অনুষ্ঠান করেন; তাহাতে সম্মুখস্থ অন্নে ও জলে ব্রহ্মের আবির্ভাব দেখিয়া এবং তাহার মধ্যে ভক্তগণকে, বিশেষ ভাবে দেবনন্দনকে স্মরণ করিয়া, তাঁহাদের রক্ত মাংস অন্নরূপে পরিণত করতঃ তাহা ভোজন করেন। সম্মুখস্থ অন্নপানে যেমন শরীরে রক্ত ও মাংস হইবে, সেই রক্ত মাংস যেন ভক্তের রক্ত মাংস হয় এবং এই তনু যেন তদ্দারায় ভাগবতীতনু হয়, এইরূপ কামনাই এই অনুষ্ঠানের মর্ম্ম।

একবার তিনি মস্তক মুণ্ডন করিয়া "দণ্ডধারণ" ব্রত গ্রহণ করেন। বৈরাগ্য সাধনই এই ব্রতের উদ্দেশ্য। এই ব্রত ধারণ করিয়া তিনি নিজে ভিক্ষা করিয়া আহার করেন।

"আরতি" উপলক্ষে নববিধানের নিশানতলে সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্র রক্ষা করতঃ ব্রহ্মানন্দ পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া প্রার্থনাযোগে তাহাদিগকে "পুণ্যের প্রদীপ, প্রেমের প্রদীপ, ভক্তির প্রদীপ, বিশ্বাসের প্রদীপ বিবেকের প্রদীপরূপে" পরিণত করিয়া তদ্বারায় ব্রহ্মমুখ উজ্জ্বলরূপে দর্শন ভিক্ষা করেন।

"নিশান বরণে" অন্তপুরস্থ মহিলাগণ বিধান সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে আলোক লইয়া নববিধান অঙ্কিত নিশানের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া নববিধানের বিজয় নিদর্শনকে আদর করেন। নিশান উপলক্ষ মাত্র, কিন্তু তাহাকে ঈশ্বর জ্ঞানে কেহ পূজাও করেন না কিম্বা তাহার নিকট কোনরূপ প্রার্থনাও করেন না।

ঈশ্বর বোধে কোন বাহ্য বস্তুর পূজাই পৌত্তলিকতা। ব্রহ্মানন্দ যেমন পূর্ব্বে বলিয়াছেন সম্পূর্ণ অপৌত্তলিক এবং নির্দ্দোষ অনুষ্ঠান দ্বারায় ধর্ম্মকে সাধারণ অজ্ঞ লোকের উপযোগী করিবার চেষ্টাই এই সকল বাহ্যানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ইহাতে কোনরূপ কুসংস্কার আসিবার সম্ভাবনাই নাই, কেন না সকল অনুষ্ঠানেই এক নিরাকার ঈশ্বরকে স্মরণপূর্ব্বক প্রার্থনা করা হইয়া থাকে। এবং অনুষ্ঠানের মর্ম্ম কি বুঝিয়া তাহা সম্পাদন করিলে আর তাহাতে কুসংস্কার আসিবে কিরূপে? না বুঝিয়া অনুষ্ঠান করিলেই তাহাতে কুসংস্কার আসিতে পারে। বাস্তবিক এ সকল অনুষ্ঠান দ্বারায় স্ত্রীলোক ও সাধারণ লোকের ধর্ম্মোৎসাহ এবং আত্মার কল্যাণই হয়।

এই সকল অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও ব্রহ্মানন্দ "নববিধান পত্রিকায়" লিখিয়াছেন:—"কেবল কতকগুলি প্রচলিত অনুষ্ঠানের আধ্যাত্মিকতা ব্যাখ্যা করিবার জন্যই এই সকল অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। অনুষ্ঠান কেন? কারণ তাহাতে অধিক হৃদয়গ্রাহী হয়। পুরাতন জীবনবিহীন অনুষ্ঠানকে

কিছুতেই এমন ব্যাখ্যা করিতে পারে না যেমন একটী জীবন্ত প্রতিকৃতিযুক্ত অনুষ্ঠান দ্বারায় হয়। হোম, জলসংস্কার, সাধু ভোজন, দণ্ডধারণ, নিশান বরণের অর্থ, কেবলমাত্র উপদেশ অপেক্ষা তখনই অধিকতররূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, যখন তাহারা জীবন্ত অভিনয়কারীর দ্বারায় অভিনীত হয়। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা দেখিয়াছেন এবং অনুষ্ঠান সম্পাদন করিয়াছেন, কারণ সেই সময়ে ইতিহাস পুনরায় অভিনীত হইয়াছিল ও নবজীবনে জীবিত হইয়াছিল এবং স্বর্গও উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, এবং মৃত অনুষ্ঠানের গূঢ় অর্থে নবালোক উজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত হইয়া সকল বিষয় পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিল।"

বাস্তবিক ব্রহ্মানন্দ যেমন এক দিকে হিন্দু দেবদেবীগণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা উপদেশের দ্বারায় করিয়াছেন,তেমনি নানাপ্রকার ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকেও এই সকল অনুষ্ঠানের দ্বারায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র। নববিধান যখন একটী বিধান, তখন ইহা সকল ধর্ম্মের সকল ধর্ম্মভাব এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানকেই আদর করিতে এবং পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন।

তাই খ্রীষ্টধর্ম্মের জলসংস্কার ও সাধু-ভোজন, হিন্দু বৈদিকধর্ম্মের হোম, বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের দণ্ডধারণ, শিখধর্ম্মের আরতি ও নিশানবরণ ইত্যাদিকে অধ্যাত্ম-বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়া তাঁহাকে নববিধান সাধনার অঙ্গীভূত করিতে হইয়াছে। নববিধান যদি কেবল একটী সুসংস্কৃত ধর্ম্মমত মাত্র হইত তাহা হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্ম বিধানের সাধনাদির আদর অপেক্ষা না করিলেও চলিতে পারিত। কিন্তু ইহাকে যখন বিধান বলিয়া ব্রহ্মানন্দ ঘোষণা করিয়াছেন তখন পুরাতন কোন ধর্ম্মভাবকে কি তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন? পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়া যাহা কিছু সত্য সকলই [illegible]

স্বর্গীয় মন। ভগ্নী আপন হৃদয়ের পবিত্র অনুরাগ এই কোঁটার সঙ্গে ভাইয়ের কপালে দেন।” আরম্ভ হইল আপনার ভাইতে, কিন্তু ভগ্নীর হাত পৃথিবীর লোকের কপালে গেল। পৃথিবী শুদ্ধ লোক তাঁর ভাই। সমস্ত জগতের কপালে কোঁটা দিলেন। কোঁটা দেওয়ার অর্থ এই যে তোর এত আদর তুই উপযুক্ত হ, ভাল হয়ে চলিস্।

“কার সম্পর্কে কোঁটা দেওয়া হল? জগজ্জননী যে সকলের মা। তিনি কাছে বসে বলছেন কোঁটা দে। পবিত্র স্বর্গের প্রেমের এক কোণ কেটে পৃথিবীতে ফেলে দিলে সেটা হল ভাইকোঁটা। যেমন ঘরে ঘরে হইতেছে, তেমনি যদি সমস্ত পৃথিবীতে হয় তা হলে বেশ হয়। সকলে যদি সকলের ভাই হয়, তা হলে পাপ রইল কি?

“পিতা, আমাদের মধ্যে পবিত্র স্বর্গীয় প্রণয় স্থাপিত কর। কেবল ভগ্নী ভাইকে কোঁটা দেবে না। ভাইও ভাইকে দেবে। সকলকে ভাই কর। ভাইয়ের মত জিনিষ নাই। আশীর্ব্বাদ কর যেন সুমিষ্ট পবিত্র ভাব ভ্রাতৃপ্রণয় হৃদয়ে রেখে জগতের সকলকে ভাই বলে, ভগ্নী বলে ডেকে অত্যন্ত বিনয়ী নম্রপ্রণত হইয়া ভ্রাতৃ সেবা করে শুদ্ধ হই।”

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক, উপরোক্ত ব্রতাদি ব্যতীত ব্রহ্মানন্দ আধ্যাত্মিক উদ্বাহ ব্রতও স্বয়ং গ্রহণ করিয়া স্ত্রীর সহিত একাত্মতা সাধনের আদর্শও দেখাইয়াছেন। স্ত্রীকে যথার্থ সহধর্ম্মিণী করা ইহার উদ্দেশ্য।

যাহাহউক কেবল শাস্ত্রে আছে বা প্রথা হইয়াছে বলিয়া যদি এই সকল ব্রত অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করা হয়, কিম্বা এমন কি প্রার্থনা উপাসনাও কেবল নিয়ম রক্ষার জন্য করা হয় তাহা হইলেই তাহাতে কুসংস্কার আসিবার সম্ভাবনা, কিন্তু জ্ঞানে সকল ব্রত অনুষ্ঠানাদির মর্ম বুঝিয়া তাহা সম্পাদন করিতে হইবে এবং তাহা করিলেই নবজীবন লাভ হইবে।

যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য, কর্ম্ম সাধনাদি।

শ্রীব্রহ্মানন্দ যেমন একদিকে সর্ব্বসাধারণ সাধকদিগের উপযোগী নানাপ্রকার ব্রতানুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিলেন, তেমনি উচ্চ সাধকদিগের জন্যও যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, পরলোক-সাধন, সাধু-সমাগম ইত্যাদি ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গও নিজজীবনে সাধন করিয়া শিক্ষা দিলেন। কিন্তু এ সমুদয় উচ্চ ধর্ম্মাঙ্গসাধনেও তাঁর কোন প্রকার অস্বাভাবিকতা বা কৃচ্ছ্র ভাব নাই। ব্রহ্মানন্দের সকলই স্বাভাবিক এবং সহজ। সকল সাধনের মূলই তাঁর এক সরল প্রার্থনা এবং জীবন্ত গুরু ঈশ্বরের উপর নির্ভর। তিনি কোন মানবেরই নিকট হইতে শিক্ষা লইয়া কোনপ্রকার ধর্ম্মসাধনায় প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহার "জীবনবেদে" স্পষ্টই তিনি দেখাইয়াছেন যে সকলই তাঁর প্রত্যক্ষ ঈশ্বর হইতে। যখন তাঁর যাহা প্রয়োজন হইয়াছে তখন স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁহাকে তাহা শিখাইয়াছেন।

তাই যখন যোগ ভক্তি শিক্ষার জন্য দুইজন তাঁহার নিকট উপদেশ চাহিলেন, তিনি স্পষ্টই বলিলেন "ঈশ্বর স্বয়ং সহায় হইয়া তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন।" প্রণালী বিধি ঈশ্বর জানেন, তোমরাও জান না, আমিও জানি না।" তবে "আমিও ব্রত গ্রহণ করিলাম, আমিও তোমাদের নিকট শিক্ষা করিব। শিক্ষা করিয়া শিক্ষা দিব, শিক্ষা দিয়া শিক্ষা করিব।" কি গভীর নূতন কথা! নববিধানের সকলই যে নূতন, প্রত্যক্ষ বিধাতা কর্ত্তৃক বিহিত, তাহাই ইহা আমায় বুঝায়। নববিধানের যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য সকলই নূতন। পূর্ব্বকার [illegible] [illegible] বৈরাগ্যের সহিত ইহার কিছুই মেলে না।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে যে যোগের কথা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

কিন্তু ব্রহ্মানন্দের যোগ সহজ যোগ, নিশ্বাস যোগ, বিশ্বাস যোগ। নিশ্বাস যোগে যেমন শরীরের প্রাণ রক্ষা হইতেছে, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মবায়ুও প্রাণে প্রবাহিত হইতেছেন এই অনুভূতি ও বিশ্বাসেই সহজে যোগ সাধন হইল।

শ্রীব্রহ্মানন্দ তাই বলিলেন:—"যখন আসিলাম ব্রাহ্মসমাজে কে ধাক্কা দিয়া বলিল "যা হরির সঙ্গে যোগ সাধন কর।" বার বার এইরূপ ধাক্কা খাইয়া অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম কি চমৎকার রাজ্য! যেমন সহর ঘর বাড়ী দেখি বাহিরে, তেমনি অন্তরেও দেখিলাম। সহজে যোগের পথ ধরিলাম। নিশ্বাস যোগ যেমন সহজ তোমায় দেখা তেমনি বুঝিলাম। যদি লোকের উপদেশ শুনিতাম, হয়ত নিশ্বাস অবরোধ করিতে বলিত, কৃত্রিম যোগপথ ধরিতাম, কিন্তু মা তুমি না কি সুখী করিবে তাই ভ্রম হইতে বাঁচাইলে।"

তিনি আরো বলিলেন:—"অধিক সাধন করি নাই, চক্ষু খুলিয়া সাধন করিলাম। তাকাইলাম চারিদিকে দেখিলাম প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ঈশ্বর বাস করিতেছেন। দেখিলাম আমার দিকে ব্রহ্ম দেখিতেছেন, আমাকে ডাকিতেছেন, নিকটে গেলাম। আবার বলিলেন" আরও কাছে আয়," খুব নিকট হইলাম, বলিলাম ব্রহ্ম পাইয়াছি, যোগ হইল।

"যোগ কি? অন্তরাত্মার সঙ্গে এমনই সংযোগ যে প্রতি বস্তু দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তৎসঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মের দর্শনলাভ। কাঠ আর কাঠ মনে হইবে না। আকাশ আর আকাশ থাকিবে না। আকাশে চিদাকাশ দেখা যাইবে।"

ব্রহ্মানন্দের এই সহজ যোগে হট কুম্ভ যোগাদির গোলযো[illegible] [illegible] নাই। অর্দ্ধ অর্দ্ধ মিথ্যাচার যোগপথ অর্থ একপ্রকার ব্রহ্মে

লয় হওয়া, অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করা, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ বলিলেন "যে যোগে সর্ব্বক্ষণ দ্বৈতজ্ঞান থাকিবে তাহাই নববিধানের যোগ।" সুতরাং নববিধানের এ যোগও সম্পূর্ণ নূতন। এই যোগে যোগী হইয়াই ব্রহ্মানন্দ জীবনবেদে বলিলেন, "ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ দেখা হইয়াছে। আমার সঙ্গে ঈশ্বর এখন একত্র গাঁথা রহিয়াছেন। ঈশ্বরকে দেখ নাই? আর প্রমাণ দিতে হইবে না, আমাকে দেখিলেই হইবে। একটী পদার্থে দুইটী পদার্থ মিলিয়াছে। একটী অস্বীকার, করিয়া আর একটী স্বীকার করা যায় না।" ইহার ন্যায় সহজ যোগানন্দ সম্ভোগ আর কি হইতে পারে? ব্রহ্মানন্দ যে কি উচ্চ যোগেরই শিখরে উঠিয়া এই উক্তি করিয়াছেন ইহা সংযত-চিত্তে পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। অথচ ইহা যে কেবল তাঁহারই নিজস্ব তাহাও নহে, তিনি উপরোক্ত কথার পরেই বলিতেছেন "তোমরাও যোগ শিখিবে, আশার সংবাদ দিলাম, ব্রহ্মকে স্পষ্ট বস্তুর ন্যায় দেখিবে।"

এই যোগ আবার কেবলই যোগ নহে, ইহা ভক্তি মাখান যোগ। নববিধানের যোগ ভক্তি-যোগ। নববিধানের ভক্তি যোগ-রঞ্জিত ভক্তি। ব্রহ্মানন্দ তাই জীবনবেদেই বলিলেন:—"ঈশ্বরের প্রসাদ বারি ভক্তির আকারে আসিল, সেইরূপ কোথা হইতে এক বায়ু প্রবাহিত হইয়া যোগকে আমার নিকট আনিল। হস্তগত হইলে পর বুঝিতে পারিলাম একে বলে ভক্তি, একে বলে যোগ। ভক্তি যোগকে সুমিষ্ট করে, যোগ ভক্তিকে শুদ্ধা ভক্তি করে। যোগ হয়ত অদ্বৈতবাদে লইয়া ফেলিত, ভক্তি হয়ত কুসংস্কার উৎপন্ন করিত। কিন্তু যোগের পাহাড়ে ভক্তির বাগান হইল। ভক্তিকে স্থায়ী করিবার জন্য যোগ আবশ্যক। ক্ষণস্থায়ী প্রমত্ততা জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু যোগ ব্যতীত তাহা চিরকাল থাকিবে না।"

এই জন্য তিনি ভক্তি যোগ একত্র করিয়া নবযোগ এবং নবভক্তির পথ নব-বিধানে আবিষ্কার করিলেন, এবং মুক্তকণ্ঠে বলিলেন "এই ভক্তি যোগ ব্যতীত ব্রাহ্ম জীবন কোন কার্য্যের নয়।" আরো বলিলেন "যোগেতে সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র সমস্ত বুকের মধ্যে করিয়াছি, মাকড়সা যেমন জালের মধ্যে পোকাকে ধরে তেমনই ধরিয়াছি। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্ম আমার মধ্যে করিয়াছি। আমি ধন্য।" পূর্ণ যোগী না হইলে এমন সাহস করিয়া আর কে বলিতে পারে? ইহা দ্বারায় আরো বুঝা যায় তিনি কেবল ব্রহ্মযোগেও যোগী নন, ব্রহ্মযোগের সহিত মানবযোগ ব্রহ্মাণ্ডের সহিত যোগেও ব্রহ্মানন্দ পূর্ণ যোগী এবং সেই যোগই তিনি নববিধানে প্রবর্ত্তন করিয়া বলিলেন:—"সমস্ত মানব আমাতে, আমি তোমাতে।"

এই নববিধানে যোগ ভক্তি কর্ম্ম সবই মিশ্রিত, তাই ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "আমি ছিলাম খুব কর্ম্মী, এখন যোগের পাহাড়ে উঠে বাগানে বেড়াইতেছি। এখন আর বুঝিতে পারি না আমার জীবনে যোগ অধিক না কর্ম্ম অধিক। বিবেকের প্রভাব অধিক না মৃদঙ্গ বাজাইয়া ভক্তিতে আনন্দ করা? ষোল আনা যদি আমার ভক্তি থাকে তবে ষোলআনা যোগ আছে।"

তাঁর ভক্তি সঞ্চার সম্বন্ধেও ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন প্রথমে "আপনাকে আপনি বলিতাম এছাড় ওছাড়, কেবল ইন্দ্রিয় নিগ্রহকর, কেবল পরাক্রম প্রকাশ কর, অপৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রচার কর। গুপ্তভাবে একজন ভিতর হইতে আমাকে ভক্তির ঈশ্বরের দিকে টানিলেন। পরিবর্ত্তন হইল। শুষ্ক কঠোর ভাবের মধ্যে পড়িয়া যে কাঁদিতেছিল সে এখন হাসিতেছে। এ সংবাদ সকলের জানা উচিত। ঈশ্বর জ্ঞান অল্প ছিল বাড়িল, হাত যোড় করিয়া ঈশ্বরকে ডাকিতেছিলাম, পরে দেখি তিনিই [illegible] মা বলিতে শিখিলাম। মা নামের মধ্যেও

কতরূপ দেখিলাম। কখনও শক্তির সহ আনন্দ সংযুক্ত দেখিলাম, কখনও জ্ঞানের সহিত প্রেমের যোগ নিরীক্ষণ করিলাম, মার রূপ নানা ভাবে মা দেখাইয়াছেন। এখন, মনে হইতেছে মাকে দেখিয়াই বুঝি একেবারে পাগল হইয়া যাই। চঞ্চলা ভক্তি, প্রগল্‌ভা ভক্তি, অগ্নুলে ভক্তি, মাতানে ভক্তি আজ হইয়াছে।"

এই সকল উক্তির দ্বারায় বেশ বুঝা যায় কোন সাধনই তাঁহার কষ্ট সাধ্য, পুরুষকার সাধ্য নহে। যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান সকলই নববিধানে সহজ সাধ্য সকলই ব্রহ্মকৃপা সাধ্য; তাঁহার উপর নির্ভর করিলে সরল প্রাণে প্রার্থনা করিলে সকলই হয়। বিশেষতঃ তাঁহার জীবনে যে যোগ ভক্তি প্রার্থনা সকলই প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বর গুরু হইতে প্রাপ্ত এই সকল উক্তি পাঠ করিলে আর কে সন্দেহ করিতে পারে ?

ব্রহ্মানন্দের বৈরাগ্যও সহজ বৈরাগ্য। তাহাও কষ্ট সাধ্য ব্যাপার নহে। তিনি বলেন "মর্কট বৈরাগ্য আমি চাইনা, যে বৈরাগ্য চেষ্টা করিয়া করিতে হয় আমি তাহার প্রয়াসী নই, আমি শরীরে ভস্ম লেপন করিয়া বৈরাগ্য সাধন করি নাই। সহজ স্বাভাবিক বৈরাগ্য আমি অবলম্বন করি, সেই বৈরাগ্য হইতেই আমার মঙ্গল হয়। আদেশ হইল নিজে রন্ধন কর, কি বিনামা পরিত্যাগ কর, অথবা দুই দিনের জন্য বিশেষ স্থানে বাস কর, এসকল শরীর দণ্ড করিবার জন্য নয়। শরীর দগ্ধ করিলে উপকার কি? আমাদের মধ্যে যে বৈরাগ্য সে কষ্টের জন্য নয়, তাহা আপনা-পনি হইয়া যাইতেছে। নববিধানের আদেশে মন ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিয়াছে বাহিরে ব্যাঘ্রচর্ম্মের প্রয়োজন হয় নাই। বাহিরে না করিলেই ভাল। লোক দেখাইবার জন্য যে বৈরাগ্য তাহা পরিত্যাগ কর। হৃদয় যেন বৈরাগ্যবেশ ধারণ করে। এই বৈরাগ্যে আত্মা নববিধানের শোভা ধারণ করে।"

নববিধানে "স্বার্থনাশই বৈরাগ্য," সুতরাং আমার কিছুই নয়, যাহা কিছু সকলই ঈশ্বরের,এই জ্ঞান সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিয়া তাঁহার আদেশে চলাই যথার্থ বৈরাগ্য। "তিনি যদি বিষয় বিভব দেন ভালই, তাঁহার আদেশে গ্রহণ করিবে, আবার যদি তিনি লন তাঁরই আদেশে পরিত্যাগ করিবে" এই ভাবে নির্লিপ্ত হইয়া সংসারে বিচরণই বৈরাগ্যের লক্ষণ। বাহিরে সমুদয় বজায় রাখিয়া স্ত্রীপুত্র পরিবার সংসার লইয়া বাস করা, অথচ ভিতরে পূর্ণ বৈরাগী হইয়া থাকাই নববিধানের বৈরাগ্য সাধন। গৃহস্থ-বৈরাগী হওয়াই নববিধানের বৈরাগ্য।

নববিধানে পরসেবা কর্ম্মানুষ্ঠানাদিও যাহা কিছু সকলই বৈরাগ্য প্রণোদিত, সকলই ঈশ্বর প্রেরণায় তাঁহাকেই গৌরবান্বিত করিবার জন্যই সম্পাদন করিতে হইবে। তাই ইহাতে কর্ম্মও পুরুষকার সমন্বিত নয়, সুতরাং ইহাও নূতন।

যাহাহউক নববিধানের যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম বৈরাগ্য সকলই নূতন। এককথায় বলিতে হইলে বলা যায় নববিধানের যোগ ভক্তি-মিশ্রিত যোগ, নববিধানের ভক্তি জ্ঞান-মিশ্রিত ভক্তি, নববিধানের কর্ম্ম আদেশানু-মোদিত কর্ম্ম, নববিধানের বৈরাগ্য সংসারে বৈরাগ্য এবং সকলই আবার পরস্পর বিমিশ্রিত সম্পূর্ণ এক নববিধ। ফলে ইহার সকল সাধনই বিধাতা নির্দ্দেশে করিতে হইবে, পবিত্রাত্মা স্বয়ং পরিচালিত করিয়াই যখন যে সাধন করাইবেন তখন তাহা করিলেই সিদ্ধিলাভ হইবে, ইহাই ব্রহ্মানন্দ নিজ জীবন দ্বারায় শিক্ষা দিয়াছেন।

এই যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য আদি ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গ সকল কি প্রণালীতে সাধন করিতে হইবে "ব্রহ্মগীতোপনিষৎ" গ্রন্থে ব্রহ্মানন্দ বিশদ-রূপে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তাহাও কেবল পাঠ করিলে বা নিজ চেষ্টায়

তদনুসারে সাধন করিতে চেষ্টা করিলেও বিশেষ ফল হইবে না। পবিত্রাত্মা স্বয়ং গুরু হইয়া যখন যাঁহাকে যে তত্ত্ব লওয়াইবেন এবং ব্রহ্মানন্দের উপদেশ বুঝাইয়া দিবেন, তিনিই তাহার নিগূঢ় ভাব অবগত করিতে পারিবেন। সুতরাং সর্ব্ব বিধায়ে এক পবিত্রাত্মার উপর নির্ভরই নববিধান সাধনের প্রাণ।

পরলোক সাধন, সাধুসমাগম।

"ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার" পুস্তিকায় ব্রহ্মানন্দ পরলোক সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন:—"আত্মা অবিনশ্বর। মৃত্যু কেবল শরীরের বিয়োগ, কিন্তু আত্মা অনন্তকাল ঈশ্বরেতে জীবন ধারণ করে। মৃত্যুর পর নূতন জন্ম হয় না, কেবল বর্ত্তমান জীবনের প্রসারণ ও ক্রমোন্নতিকে পরজীবন বলা যায়। প্রত্যেক আত্মা আপনার দোষ গুণ লইয়া ইহ-লোক হইতে অবসৃত হয়, এবং সেই দোষ গুণের ফল ভোগ করিতে করিতে অনন্ত উন্নতির পথে ক্রমে অগ্রসর হয়।"

নববিধান বিশ্বাসের মূল সত্যের মধ্যেও "আত্মা যে অমর এবং ক্রমোন্নতিশীল," ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে ব্রহ্মানন্দ সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে আত্মার মৃত্যু নাই। তাই তিনি "ভবিষ্যৎ জীবন" বিষয়ে ইংরাজিতে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে পরিষ্কাররূপে বলিয়াছেন:—

(বিশ্বাসীর নিকট) "ঈশ্বর এবং পরলোকের অস্তিত্ব পরিষ্কাররূপে অচ্ছেদ্য একত্ব বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। তাঁহাতেই আমরা বাস করি, বিচরণ করি এবং জীবনযাপন করি, ইহাই আমাদের পরলোক বিশ্বাসের ভিত্তি। যাই আমরা আপনাদের অপূর্ণতা অনুভব করি, তাহার সঙ্গে

সত্বরই অনন্ত আত্মার উপর আমাদের নির্ভর অনুভূত হয়, সেই অনন্ত আত্মাকেই ধর্ম্মশাস্ত্র 'ঈশ্বর' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা হইতেই এক দিকে ঈশ্বরের দিকে অপরদিকে পরলোক বা অমরত্বের দিকে আমাদিগকে লইয়া যায়। আপনাকে ঠিক জানা মানে আপনাকে অপূর্ণ আত্মা ও পূর্ণ আত্মার উপর নির্ভরশীল জানা। এবং ইহা জানাই ভবিষ্যৎ জীবন জানা। যদি আমি দেখি যে আমি ঈশ্বরেতেই বাস করিতেছি শরীরে নয়, তাহা হইলেই ইহা দেখিলাম যে আমি চিরদিন বাঁচিব।

"মৃত্যু কি? ইহা একটা পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে, মৃত্যুতে বাস্তবিকতা কিছুই নাই। আমি এখনই ত জানিতেছি আমি অনন্ত চিরজীবিত পরমাত্মাতে বাঁচিয়া আছি। আত্মা এবং পরমাত্মা এমনই একত্ব যোগে বাঁধা, যে একজন জীবনের রস টানিতেছে আর একজন তাহা সঞ্চার করিতেছে। আমরা যখন ঈশ্বরেতেই জীবিত আছি, আমরা ততদিন জীবিত থাকিব যতদিন ঈশ্বর থাকিবেন এবং ঈশ্বর চিরজীবিত, কাজেই আমরাও চিরদিন থাকিব।"

নবসংহিতাতেও পরলোক গমনশীল আত্মার প্রতি কর্ত্তব্য বিষয়ে ব্রহ্মানন্দ বলেন:—"তাঁহাকে অনুতাপ, বিশ্বাস এবং আশার দিকে আহূত এবং পরলোকের সত্তার প্রতি জাগ্রত করিবার জন্য প্রার্থনা, শাস্ত্র পাঠ, সঙ্গীত এবং তদ্বিধ অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার সেবা করিতে হইবে।

"তিনি অনন্তকালের কূলে দণ্ডায়মান এবং শীঘ্রই তাঁহাকে আবাসস্থলে আরোহণ করিয়া আপনার সুদূর ভবনে যাইতে হইবে, এইটি যেন তাঁহাকে অনুভব করিতে দেওয়া হয়।

[illegible]

লইয়া যাইবার জন্য সাধুদিগের আনন্দধ্বনি তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিতেছে ইহাও তাঁহার যেন অনুভব হয়।

"অতএব ইহলোকসংক্রান্ত কোন চিন্তা বা কামনা যেন তাঁহার শান্তি-ভঙ্গ না করে; কোন প্রকার শোকোক্তি এবং ক্রন্দন তাঁহাকে যেন হতাশ না করে। সমুদয় অবস্থাগুলি একত্রিত হইয়া যাহাতে তাঁহার মনের সাম্য রক্ষা করিতে পারে, এবং পৃথিবীর দিকে না আনিয়া স্বর্গের দিকে তাঁহার দৃষ্টিকে ফিরাইয়া দিতে পারে, তাহাই করিতে হইবে। যে কেহ এইরূপ আশার সমাচার এবং উপদেশ দ্বারা তৎকালে তাঁহার সহায়তা করিবে সেই তাঁহার প্রকৃত বন্ধু।"

শ্রাদ্ধকর্ত্তার প্রার্থনাতে এইরূপ বলা হয়ঃ—"প্রিয় পরমেশ্বর, পৃথিবীর অনিত্য সুখ সম্মান হইতে আমাদের হৃদয়কে ফিরাইয়া স্বর্গের ঐশ্বর্য্যের দিকে লইয়া চল। আশ্বাস বচনে এই প্রবোধ দাও যে, যে সকল ব্যক্তি এই জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছে তাহারা তোমারই আলয়ে একত্রিত হইয়াছে, এবং যখন সময় আসিবে তখন আমরাও সেই সুখনিকেতনে অমরাত্মাগণের সহিত গিয়া পুনর্ম্মিলিত হইব।"

আচার্য্যের প্রার্থনাতেও বলেন ঃ—"পরলোক সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাসকে ঘনীকৃত কর, এবং অনন্ত জীবনের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া লও। পরলোকগত আত্মাকে তুমি স্বর্গের সমগ্র আলোক এবং মহিমা প্রদান কর। যদিও আমরা বাহ্যভাবে তাঁহার সহিত পৃথক হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু আমরা যেন তাঁহার সহিত আধ্যাত্মিক যোগে চিরকাল অবস্থিতি করিতে পারি।"

এই সকল উক্তি পাঠ করিলে [illegible]

[illegible]

অনায়াস লব্ধ ব্রহ্মগত জীবনই স্বর্গ" এই বলিয়া অতি সহজে এবং ঘনীভূত ভাবেই তিনি সমুদয় তত্ত্ব অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

বাস্তবিক ব্রহ্মেতে বাসই আমাদের ইহজীবন, ব্রহ্মেতে বাসই আমাদের পরজীবন। ইহজীবনেও তিনিই আমাদের জীবনের জীবন হইয়া আছেন, তাই আমরা বাঁচিয়া আছি এবং দেহান্তেও যে আত্মা থাকিবে তাহাও জীবন হইয়া তিনিই তাকে বাঁচাইবেন; তবে আর মৃত্যু কোথায়? সেই জীবনস্বরূপের যখন মৃত্যু নাই, তখন আমার এজীবনেরও আর মৃত্যু হইবে কিরূপে। তবে আমরা ইহ জীবনে থাকিয়া তাঁহাকে জীবন বলিয়া ভুলিয়া যাই বলিয়াই জড়েতে আবদ্ধ হই এবং মোহ ভ্রমের অধীন হইয়া আত্ম বিস্মৃত হই। ব্রহ্মোপাসনা দ্বারায় আমরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া যখন দেখি তিনিই আমাদের জীবন তখনই আমরা যথার্থ কবিত্ত অমরত্ব লাভ করি।

এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্যই আমাদের এই সংসারে আসা। এখানে আসিয়া আমরা সংসারের নানা প্রকার অবস্থায় পড়িয়া এখানকার অভিজ্ঞতা লাভ করিব, এখানকার অনিত্যতা এবং অপূর্ণতার মধ্যে বাস করিয়া সেই নিত্য এবং পূর্ণ ব্রহ্মকে চিনিব ইহাই এ জীবনের উদ্দেশ্য। আমরা যদি এখানে থাকিতে থাকিতে তাঁহাকে চিনিতে পারি, পরজীবনে আমরা তাঁহারই অনুগামী হইব এবং সজ্ঞানে সচৈতন্যে তাঁহাতে বাস করিব ও তাঁহাতেই অনন্ত জীবনের পথে অগ্রসর হইব। যদি তাঁহাকে এখানে না চিনি, কেবল জড়ের সহিত জড়িত হই, স্ত্রী পুত্র টাকা সংসার ইত্যাদিতে আবদ্ধ হই, দেহ অন্তে আর সে সকল তো থাকিবে না, তাহাদের অভাবজনিত কষ্ট ও যাতনা অনুভব করিব, এবং সেই যাতনা হইতে অনুতাপ আনিয়া আমাদিগকে প্রার্থনা-

শীল এবং ব্রহ্মের অনুগমনার্থী করিবে, তাহা হইতেই আমরা আবার তাঁহার সহিত মিলিত হইব।

এক্ষণে আমরা যে উপাসনা করি ইহাও সেই ব্রহ্মসহবাস চেষ্টা ভিন্ন আর কি? উপাসনাতেও তো আমরা এই জড়ের মায়ায় আবদ্ধ আত্মাকে মুক্ত করিয়া ব্রহ্মের শরণাপন্ন করিতে চেষ্টা করি। সুতরাং এই অভ্যাস সরল সত্য এবং সহজ হইলেই তো আমরা ইহলোকেই পরলোক বাসের পূর্ব্বাভাস সম্ভোগ করিয়া থাকি। যথার্থ উপাসনাকালে যেমন আমাদের দেহের জ্ঞান টন্‌টনে থাকিলেও আমাদের মন আর সব বিষয় ভুলিয়া যায়, কেবল ব্রহ্মসহবাস সম্ভোগ পিপাসু হয় এবং তাহা সম্ভোগ কিরিয়া কৃতার্থ হয়, দেহান্তেও আমাদের ইহাই অবস্থা হইবে। তাই যথার্থ ব্রহ্মোপাসনাই আমাদের ইহলোকে পরলোকবাস বা সশরীরে স্বর্গসম্ভোগ। পরলোক সাধন সম্বন্ধে ব্রহ্মমন্দিরে ব্রহ্মানন্দ একবার যে উপদেশ দেন তাহাতে তাই বলেন:—"যাহাদের প্রাণ ব্রহ্মেতে গ্রথিত হইয়াছে তাঁহারা নিকৃষ্ট জীবন হইতে মুক্ত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা দ্বিজরূপে উক্ত হয়েন। ব্রহ্মই এরূপ সাধকদিগের প্রাণ হন, এ অবস্থাতে স্বতন্ত্রভাবে পরলোক সাধন করিতে হয় না।" ব্রহ্মানন্দের নিম্নলিখিত ধ্যানের উদ্বোধন পাঠ করিলেও আমাদের কথা আরো সপ্রমাণিত হইবে:—

"এই তো সেই পরলোকসমুদ্রের ঘাট। ইহলোক ছাড়িয়া এই ঘাটে আসিলাম, সম্মুখে পরলোক অনন্তকাল-সাগর ধু ধু করিতেছে! এই ছোট নৌকাখানিতে চড়ি, চড়িয়া যাই; যাই নূতন রাজ্যে চলিয়া। টাকা কড়ি লইব না। আর পৃথিবীর চাক্‌চিক্যে মোহিত হইব না। আর ভাই বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইবে না। ছাড়িলাম তরী, দুই পাঁচ ঢেউয়ের ধাক্কা খাইয়া চলিলাম। অনন্তকাল-সাগরে ভাসিলাম। উঃ,

শিখিয়া লইতে হয়। যাহারা না শেখে তাহাদের আত্মাকে [illegible] কষ্ট পাইয়া চৈতন্য লাভ করিতে হয়। জন্মদাতা বার বার আর দেহে আসিতে দেননা। যাহারা ইহজীবনে উপাসনা সাধন আরম্ভ করেন না তাঁহাদের দেহান্তে যেন সেই সাধন আরম্ভ হয়। সেই জন্ত মৃত্যু তাহাদের পক্ষে সৌভাগ্য ভিন্ন আর কি এবং যাহাদের আত্মজন যান তাঁহাদেরও পৃথিবীর মোহ মায়ায় ধাক্কা দিয়া মৃত্যু সেই লোকের দিকে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং শুধু তাহাই নহে যাহারা যান তাঁহাদের আত্মার আকর্ষণও আমাদিগকে তাঁহাদিগের দিকে টানিয়া থাকে।

আমাদের আত্মার আত্মীয় স্বজন যাঁহারা তাঁহাদের প্রেম কখনই আত্মজনদিগকে ভুলিতে পারে না। আমাদের আপন জন কেহ চলে গেলে যেমন আমাদের প্রাণ কাঁদে, তাঁহাদের প্রাণও তদ্রূপ [illegible] আমাদের জন্য শুভ কামনা করিয়া থাকে। এবং পৃথিবীতে কোন আত্মজনদের ফেলে কি ভাল বস্তু পাইলে যেমন [illegible] তাই ভোগ করে আমাদেরই ইচ্ছা হয় তাঁহারাও সেই সুখবিধানে [illegible] আমরাও যাহাতে সেই সুখের অংশ পাই তেমনই কামনা করেন, এবং তাঁহাদের সেই শুভ কামনাগুণে আমাদেরও আত্মার উন্নতি হইয়া থাকে। সুতরাং যার যত নিকট আত্মীয় পরলোকবাসী হন তত ঐ পরলোক নিকটে হয়, এই জন্য বাবু অঘোরনাথের তিরোধানে ব্রহ্মানন্দ বলিতেন [illegible] পরে [illegible] তাঁহাদের জন্য পথ প্রস্তুত করিতে তিনি [illegible] গেছেন। তিনি আমাদের বিরাগকে দূর করিলেন, স্বর্গ আমাদের নিকটে আনিলেন এবং আমাদের দৃষ্টি [illegible] দিকে [illegible] বাঁধিয়া দিলেন।

তাই পরলোকের [illegible] যত বত আমরা [illegible] স্থা করিতে পারি তত আমরা তাঁহাদের আত্মার [illegible]

করিতে পারি এবং তদ্দ্বারা আমাদের জীবনেও তাঁহাদের প্রতিভা আনিয়া আমাদের আত্মাকে সমুন্নত করিয়া থাকে। চুম্বক পাথর যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, পরলোকগত আত্মীয়গণের প্রেমও আমাদের লৌহের ন্যায় পাপ মলীনতা-পূর্ণ জীবনকেও আকর্ষণ করিয়া উন্নত করে।

এই নিমিত্তই ব্রহ্মানন্দ নববিধানে সাধু-সমাগম সাধন প্রবর্ত্তন করিলেন। সাধু-সমাগম মানে পরলোকগত মহাপুরুষ বা সাধু ভক্তাত্মাদিগের সঙ্গ সাধন। এই সাধন কি? ব্রহ্মানন্দ উপদেশে বলেন :—

"পরলোকবাসী সাধুদিগের সঙ্গে ইহলোকবাসী মনুষ্যের দর্শন হয় কি না। এক ঈশ্বরকে লইয়া জ্ঞান তৃপ্ত হয়, সাধু সজ্জনে প্রয়োজন কি? ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছি বলিয়া কেবল ব্রহ্মকে লইয়া নির্জ্জনে থাকিব সাধুকে প্রয়োজন নাই, এরূপ কখনও বলিতে পারি না। যিনি ঈশ্বরকে ভাল বাসেন তাঁহার সাধুকেও ভালবাসিতেই হইবে। ঈশ্বর আছেন তাঁহাকে দেখিব এই স্পৃহায় ঈশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্পৃহা ঈশ্বরকে আনয়ন করে, সেই স্পৃহাই আবার সাধুকে আনয়ন করে, ভক্তি সাধু সজ্জনকে দেখাইয়া দেয়। এক ইচ্ছায় ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হই। যে ভক্তবৎসলের রূপ দেখে, সে ভক্তের রূপ দেখে। এই দুই বিধি দুই নয় এক। সাধু ছাড়া ঈশ্বর নহেন, ঈশ্বর ছাড়া সাধু নহেন। শরীর হইতে কিছু কিছু রক্ত বাহির করিয়া জীবিত থাকিবে ইহা যেমন অসম্ভব, মহাত্মা পবিত্রাত্মাগণকে বিদায় দিয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা তেমনি অসম্ভব। যেখানে বসিয়া আছ সেই খানে ভক্ত বসিয়া আছেন। ভক্ত সর্ব্বব্যাপী ইহা মানিও না। ভক্ত সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত না মানিয়াও ইহা মানিবে যে চক্ষু মাত্র ভক্ত দর্শন হয়। সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়া সাধুর সঙ্গে প্রাণের সম্বন্ধ সংস্থাপন করা উচিত।"—ধর্ম্মতত্ত্ব ১৮০১।

এই পরলোকগত আত্মাদিগের সঙ্গলাভ আকাঙ্ক্ষাও মানবপ্রকৃতিতে যেন চির নিহিত। তাই কুসংস্কারাপন্ন লোকেরা কত কি প্রক্রীয়া অবলম্বন করিয়া পরলোকগত ব্যক্তিদিগের ভূত নামাইতে চেষ্টা করে এবং কল্পনা যোগে তাহাদের সঙ্গ করিতে চায়। ব্রহ্মানন্দের সাধু-সমাগম সেরূপ নহে, তাহা সত্যই সাধু-সঙ্গলাভ। ব্রহ্মোপাসনায় যেমন পরমাত্মার সঙ্গ সাধন হয়, সাধু-সমাগমে সেইরূপ সাধু-আত্মার সঙ্গ সাধিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা কিরূপ? পূর্ব্বে যেমন বলা হইয়াছে, ব্রহ্মই একমাত্র সর্ব্ব-ব্যাপী আত্মা, সেই আত্মাতেই সকল আত্মা বাস করিতেছেন, বিহার করিতেছেন এবং জীবনযাপন করিতেছেন, সুতরাং কোন অজ্ঞাত অপরিচিত রাজ্যে পরলোকগত কোন আত্মা থাকিলেও সকলেই যে ব্রহ্মেতেই আছেন ইহাতে আর সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ ভক্ত-আত্মা সজ্ঞানে সচৈতন্যে যে ব্রহ্মবক্ষে বাস করিতেছেন ইহাতো নিঃসন্দেহ; অতএব পরলোকগত সাধু-সঙ্গ করিতে হইলে ব্রহ্মের নিকট যাইলেই যে তাঁহাদের সঙ্গ পাইতে পারা যায়, তাহাতে আর ভুল কি?

পৃথিবীতে যদি কোন সাধুর নিকট যাইতে হয়, তাঁর দেহের সমীপবর্ত্তী হইতে হয়, কিন্তু তাঁর দেহ-অভ্যন্তরস্থ যে দেবাত্মা তাহাই তো যথার্থ সাধু। এখন সাধুর দেহ নাই, ব্রহ্মই তাঁহার দেহ হইয়া তাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং এখন সাধুর নিকটস্থ হইতে হইলে ব্রহ্মেরই সমীপবর্ত্তী হইতে হইবে, ব্রহ্মই মধ্যবর্ত্তী হইয়া সাধু-আত্মার সহিত মিলন করিয়া দেন। তাই মুষা-সমাগমে ব্রহ্মানন্দ বলিলেন:—

"জননী মুষা কোথায়? আমরা যে, তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছি। আঙ্গুল দিয়া বুকের ভিতর দেখাচ্ছ যে? তাঁহাকে দেখিবার জন্য তোমার

বুকের ভিতর যাইব? অন্ধকার যে? "বিশ্বাসের প্রদীপ নিয়ে যা" তেল নাই, সল্‌তে নাই, আগুণ নাই। "দিচ্ছি, বরাবর সোজা চলে যা। একজন ছেলে মানুষের মত বুড়ো দেখছিস?" লোকটি বল্‌ছে তুমি বল, যাহা তুমি বল, অটল প্রভু ভক্তিতে স্থির হয়ে বসে আছে। অধির অসহিষ্ণু হয় না। ভাবে যোগী হইয়া বসে আছে, ব্রহ্মগত প্রাণ, অন্য কোন ভাবনা নাই। কেবল ঈশ্বরের কাজে জীবন উৎসর্গ করে বসে আছে। জ্ঞান বুদ্ধির অহঙ্কার ফেলে দিয়েছে। ভৃত্যের মত চেহারা, ভৃত্যভাব, নম্র প্রকৃতি, কেবল বলে তব ইচ্ছা, তব ইচ্ছা। আয়রে আয় প্রাণের মুষা, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কথা কহিবার অনুমতি পাইলাম না, কিন্তু আমার বাপের মধ্য দিয়া তোমার সহিত কথা কই।"

এই সাধু-সমাগম বা পরলোকগত আত্মাদিগের সঙ্গ করিতে হইলে ব্রহ্মই যে স্বয়ং মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের সহিত মিলাইয়া দেন, ব্রহ্মানন্দের উপরোক্ত বচন দ্বারায় ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং সাধুগণের মধ্যবর্ত্তীবাদ ব্রহ্মানন্দ স্বীকার করেন নাই, অই ব্রহ্মানন্দ এক স্থানে বলিয়াছেন, যেখানে "ঈশ্বর-আলোক পৌঁছিতে পারে না, ঈশ্বর আদর্শ হইয়া নিজ আলোকে সে স্থান প্রকাশ করেন।" তবে সাধুগণ যে চসমার মত যাহা চোখে লাগাইলে দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়, ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মই স্বয়ং আলোকস্তম্ভ, সাধুগণ লণ্ঠনের কাঁচের মত হইয়া তাঁহাকেই উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। মানবদৃষ্টিতে আলোকই দৃষ্ট হয়, কাঁচ আর স্বতন্ত্ররূপে দৃষ্ট হয় না।

সে যাহাহউক আধ্যাত্ম-যোগে ব্রহ্মবক্ষে ভক্ত সঙ্গই সাধু-সমাগম। সাধুসঙ্গে স্বর্গবাস যদি পৃথিবীতে হয়, স্বর্গবাসী সাধুসঙ্গে যে আরও উচ্চতর স্বর্গবাস হয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি। সকল আত্মাই যখন

চির-অমর তখন সাধুগণ যে আছেন সে বিষয়ে আর তো সন্দেহ নাই এবং তাঁহারা যে ব্রহ্ম-সঙ্গে ব্রহ্ম-অঙ্গে আছেন, তাহাতেই বা সন্দেহ কি। এই বিশ্বাস উজ্জ্বল রাখিয়া ব্রহ্মের মধ্যে তাঁহাদের সঙ্গ করা তাঁহাদের দেব-জীবন অনুধ্যান করা যে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির এক প্রধান উপায় তাহা আর কে অবিশ্বাস করিতে পারে? যথার্থই ব্রহ্মানন্দ এই ভক্ত-সঙ্গ-সাধনের এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সকল পরলোকগত আত্মার সৎসঙ্গ সাধনের এক নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া যে ধর্ম্মরাজ্যে নবযুগ আনয়ন করিয়াছেন ইহা কেন না বলিব? ব্রহ্মানন্দ এই সমাগমে, মুষা, সক্রেটিস, শাক্য, ঋষিগণ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, শ্রীচৈতন্য এবং বিজ্ঞানবিদ্গণ সঙ্গ বা ইঁহাদের আত্মার নিকট "তীর্থযাত্রা" করেন। তিনি অন্য সময়ে কার্লাইল, এমার্সন, ডিনষ্টানলী প্রভৃতি মনীষীগণেরও আত্মার সঙ্গ সাধন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারায় সত্যই পরলোক তাঁর নিকট এ ঘর ছাড়িয়া ও ঘর হইবে বই আর কি?

তিনি আরও "সৌভাগ্য দর্শন" বিষয়ক প্রার্থনায় বলিয়াছেন:—"পরকালের বিষয় সন্দেহ ছিল পূর্ব্বে, এখন পরকাল ঘরের ভিতর। নব-বিধানবাদীদের জন্য পরলোক এখানে এলো। পাছে অবিশ্বাস বিভ্রম সন্দেহ হয়, তাই পর্দাটা খুলে দিলে, ঈশা মুষা শ্রীগৌরাঙ্গকে সাজিয়ে, ডালি সাজিয়ে গুটিকতক হৃদয়ের পুতুল তাতে দিয়ে আমাদের হাতে হাতে সঁপে দিলে। জয় জয় শ্রীহরি। তাঁর কাছে প্রার্থনা করিলে এ সকলই হয় বটে। ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ সকলে এসে বাড়ীর ভিতর বসিলেন। ভাইদের বুকের ভিতর বসাইলাম।" কি সহজ এবং উজ্জ্বলই ব্রহ্মানন্দের পরলোক দর্শন! এমন উজ্জ্বলরূপে পরলোক যাঁর নিকট প্রকাশিত হয়, যাঁর নিকট পরলোকস্থ সাধু আত্মাগণ প্রত্যক্ষরূপে দৃষ্ট হইলেন, তিনি কি কেবল তাঁহা-

দিগকে দেখিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারেন? বিশেষতঃ ব্রহ্মানন্দ যিনি বলেন "কেহ কাছে আসিয়া না দিয়া চলিয়া যায় নাই," "আমার প্রাণের ভিতর ব্লটিং আছে সাধু আসিলেই তাঁর চরিত্র আমি আকর্ষণ করিতে পারি," তিনি সহজেই স্বর্গস্থ সাধুদিগকে যে পাইয়া তাঁহাদিগকে জীবনস্থ করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তিনি বলেন:—"সাধু যখন নিকট হইতে চলিয়া যান, আমি যেন তাঁর মত কতকটা হইয়া যাই।"

সুতরাং এই সাধু-সমাগম-সাধন তাঁর নিকট কেবল সাধুকে প্রশংসা বা সাধু সাধু বলা নয়, সাধু সমাগম মানে সাধু হওয়া। এই জন্য তিনি কতবারই বলিয়াছেন তোমরা কেবল "খ্রীষ্ট খ্রীষ্ট মুখে বলিও না, প্রত্যেকে ছোট ছোট খ্রীষ্ট হও।" তিনি অপর স্থানেও ইহা বলিয়াছেন, "ও পাড়ার মত কেবল হে ঈশা, হে মুষা, বলা নয়, কিন্তু আমাদের ঈশা মুষা হইতে হইবে।" বাস্তবিকই ইহাই ব্রহ্মানন্দের ভক্ত সমাগম সাধনের উচ্চ উদ্দেশ্য।

ব্রহ্মোপাসনার দ্বারায় ব্রহ্ম সঙ্গ করিয়া আমরা ব্রহ্মবাণ হই, আমরা তো আর অদ্বৈতবাদী হইয়া ব্রহ্ম হইতে পারি না, তাই মানব জীবনে ব্রহ্মচরিত্র যাহা ভক্তগণে প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা যাহাতে আমরা আয়ত্ত্ব করিতে পারি সেই জন্য এই ভক্ত-সমাগম বিধি ব্রহ্মানন্দ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তেলা পোকা যেমন কাঁচ পোকার সঙ্গ করিতে করিতে কাঁচ পোকা হইয়া যায়, আমরাও যাহাতে আধ্যাত্ম-যোগে ভক্ত সঙ্গ করিতে করিতে সেই ভক্ত চরিত্রে চরিত্রবান্ হইয়া যাই ইহা তাহারই ব্যবস্থা, এই জন্য ব্রহ্মানন্দ ভক্ত সমাগম অর্থে লিখিয়াছেন:—ভক্ত-গণের চরিত্র এবং দৃষ্টান্ত হৃদয়ে গভীর আধ্যাত্মিকতা ও প্রেম-যোগে আয়ত্ব করাই ভক্ত-সমাগম।"

অতএব ব্রহ্মানন্দের ভক্ত-সমাগম কেবল একটা বাহ্য অনুষ্ঠান বা কাল্পনিক ব্যাপার নহে, ইহা তাঁহার জীবনে ভক্ত-জীবন লাভ। তাহাও তিনি কেবল একটীমাত্র ভক্তের সহিত যোগ-সাধন করেন নাই, কিন্তু সকল ভক্তের সহিত একাধারে যোগ-সাধন করিয়া সকলকে আত্মজীবনে প্রতিষ্ঠা করিয়া একাধারে মুষা সক্রেটিস বুদ্ধ, গৌর, মহম্মদ ব্রহ্মপুত্র ঋষি খ্রীষ্ট সকলকে মিলাইয়া এক অখণ্ড ভক্ত-সমন্বয় মূর্ত্তিমান হইয়াছেন, এবং জগজ্জন সমক্ষে নিজ মুখে ঘোষণা করিয়াছেন:—"আমরা এ যুগে ঈশা, মুষা শাক্য, যোগী, ঋষি সব।" "প্রভু ঈশা আমার ইচ্ছা শক্তি, সক্রেটিস আমার মস্তিষ্ক, চৈতন্য আমার হৃদয়, হিন্দু ঋষিগণ আমার আত্মা এবং পরোপকারী হাউয়ার্ড আমার দক্ষিণ হস্ত।" সুতরাং "গাঁথিয়া বিধান সূত্রে ভক্ত-রত্ন হাররে, পরি গলে সবে মিলে বল জয় জননীরে," এই বলিয়া যে সঙ্গীত প্রচারক গাহিলেন ব্রহ্মানন্দই স্বয়ং সেই হাররূপে প্রতিফলিত হইয়াছেন। তবে হারের সূত্র যেমন আপনি গুপ্ত থাকিয়া রত্নকেই প্রকাশিত করেন, তেমনি তিনিও আপনাকে গোপনে রাখিয়া ভক্তগণকে প্রকাশিত এবং প্রতিফলিত করিয়া জগজ্জনকে ব্রহ্মানন্দ লাভে সমর্থ করিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দ চির-আচার্য্য।

আত্মার অমরত্ব বশতঃই আমরা বিশ্বাস করি, শ্রীব্রহ্মানন্দ নববিধানের চির-আচার্য্য। যখন কোন আত্মাই মরেন না, তখন আচার্য্য কেশবচন্দ্র আর নাই ইহা কি করিয়া আমরা বলিতে পারি? অবশ্য তাঁহার দেহ নাই সত্য, কিন্তু তাঁর দেহ তো আর তিনি নহেন। তাঁর

আত্মাই তিনি। তাঁর সেই আত্মাই ব্রহ্মতেজধারী এবং সর্ব্ব ভক্তগণের রক্ত মাংসে পরিপুষ্ট বলিয়াই তিনি নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ। সুতরাং তাঁর সে পবিত্রাত্মা-জাত আত্মা কি কখনও মরিতে পারে?

বাস্তবিক তাঁর এত গৌরব এত মহত্ত্ব কিসের জন্য? যদিও তাঁর বাহ্য কান্তি, তাঁর দিব্য মূর্ত্তি, তাঁর মানবীয় প্রতিকৃতি সকলই আমাদের অতি মিষ্ট বটে, কিন্তু সে সকলই তো ভষ্মাবশেষে পরিণত হইয়াছে, সে সকলের জন্য তো আর তাঁর এত আদর নয়? তাঁর ব্রহ্মসন্তানত্বের জন্যই তিনি আচার্য্য পদাভিষিক্ত এবং তাহা তাঁহার অমরাত্মারই কার্য্য, সুতরাং সে কার্য্য তাঁর গিয়াছে ইহা কি সম্ভব?

তাঁহার এই আচার্য্যপদে নিয়োগসম্বন্ধে তিনি নিজে কোচবিহার বিবাহের আন্দোলন সময়ে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে এইরূপ বলেন:—"যখন অল্প বয়সে ঈশ্বর আমাকে ডাকিলেন এবং এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলিলেন, আমি তাঁহার সেই কথা শুনিলাম, সেই সময় হইতে তাঁহার সঙ্গে আমার জীবন্ত সম্বন্ধ রক্ষা করা প্রয়োজন হইল। অনন্তর একটী ভারি ভার আমার উপরে পড়িবে বুঝিলাম। সময় ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের উপদেষ্টার পদ, আচার্য্যের পদ পাইলাম। ব্রাহ্মদিগের কাছে এই পদ পাইলাম, এটি উপলক্ষের কথা, লোক ভুলাইবার কথা, মিথ্যা মিশ্রিত কথা। নিয়োগপত্রে দেখিয়াছি তাহাতে কোন মানুষের স্বাক্ষর দেখিতে পাই নাই। দেখিলাম তাহাতে তাঁহারই স্বাক্ষর যিনি ছাদের উপর ঘরে আমার কথা শুনিয়া উত্তর দিয়াছেন। সে যাহাহউক যখন এই ভার পাইলাম, এই স্থানে বসিলাম, জানিলাম আর উঠিতে হইবে না। ঈশ্বর যখন বসাইলেন তখন মনুষ্য আর উঠাইতে পারে না।"—আচার্য্যের উপদেশ ৭ম ভাগ।

এ উক্তি দ্বারায় ইহাই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে, যে তাঁহার আচার্য্যপদাভিষেক কেবল একটা বাহিরের সাধারণ সভা করিয়া পাঁচ জনের মত করিয়া হাত তুলিয়া একজন উপযুক্ত লোক বলিয়া নির্ব্বাচন করা নয়। তাঁর উপযুক্ততা সম্বন্ধেও তিনি নিজে বলেনঃ—"ক্রমে ঈশ্বরই সেই সকল গুণ দিতে লাগিলেন, যাহাতে এ কার্য্যের উপযুক্ত হওয়া যাইতে পারে। আমাতে উপযুক্ততা নাই। যখন তিনি আমায় আদেশ করিলেন তখন এই বুঝিলাম এ আমার মরণ বাচনের কথা।

"যোগ্যতার কথা যখন হইল তখন বলিতে পারি একটা যোগ্যতা আছে এবং সেই যোগ্যতাতেই মনের আনন্দ। কি বিষয়ে? না আমি ভালবাসি। ভালবাসিয়া মরিতে পারি এ জ্ঞানটুকু কিন্তু বিলক্ষণ আছে। শত্রু আক্রমণ করিলে, কোটী কোটী লোক আক্রমন করিলে, খড়্গাঘাতে মৃত্যু উপস্থিত হইলেও প্রগাঢ় প্রাণের ভাল-বাসা যায় না। প্রগাঢ় ভালবাসার মধুরতা কি সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। আজ একটা ভিতরের কথা বলিতে বাধ্য হইলাম, আমার স্ত্রী বলিয়াছেন আমি তাঁহার অপেক্ষা অন্য লোককে ভালবাসি। আমার পূর্ব্ববিশ্বাসের সঙ্গে একথার মিল হইল। আমি ভালবাসার স য়ে আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাই। আমার আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হয়। পরকে ভালবাসিতে গিয়া আমার হৃদয় সর্ব্বদা ভালবাসার দ্বারায় উৎপীড়িত। এ ভালবাসাকে আমি চেষ্টা করিয়া অর্জ্জন করি নাই। ভালবাসিয়া পরের ভৃত্য হইলাম অপরকে ভাই বলিলাম, এখন আর ছাড়িতে পারি না; এখন আর উপায় নাই। কাট আর মার, যাই কর, এ কার্য্যে থাকিতেই হইবে। আর একজন

যে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তোমাদের জন্য প্রাণ দিতে পারে তাঁহাকে আন! আমি সরল মনে বলিতে পারি আর কেহ নাই যে আমার মত তোমাদিগকে ভালবাসে।"

বাস্তবিক ব্রহ্মানন্দ তাঁর স্বর্গীয় ভালবাসার গুণেই স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারায় এই আচার্য্যপদে নিযুক্ত। সেই ভালবাসার গুণেই তাঁর দেহে অবস্থাকালে তিনি সে কার্য্য ঈশ্বর প্রেরণায় সম্পাদন করিয়াছেন এবং এখনও তাঁহার আত্মাও সেই কার্য্য করিতেছেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, "আমা অপেক্ষা বা আমার সমান একজন লোক ভালবাসে বলিয়া দাও, দেখ আমি তাঁহাকে সমুদয় ভার দিই কি না? যতদিন তেমন লোক দেখিতে না পাইব ততদিন দস্যুর হাতে রাক্ষসের হাতে প্রিয় ভাই ভগ্নীগণকে সমর্পণ করিব না।"

সত্যই তাঁর প্রগাঢ় প্রেম কি কখনও তাঁর আত্মজনদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারে? সুতরাং পিতা মাতা যেমন দেহত্যাগ করিলে আর অন্য কেহ পিতা মাতা হইতে পারে না, তেমনি তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁর স্থলাভিষিক্ত কেহ হইবেন ইহা কিরূপে হইতে পারে? কারণ আচার্য্যের সহিত উপাসকগণের সম্বন্ধ কি ইহার উত্তরে তিনি বলেন, "মণ্ডলী আচার্য্যকে গভীর ব্যক্তিগত আত্মীয়-যোগ্য ভালবাসার সহিত ভালবাসি-বেন এবং তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত আদর দেখাইবেন, কারণ তিনি একাধারে তাঁহাদের পিতা মাতা, ভাই বন্ধু, সন্তান এবং সেবক।" সুতরাং এই সকল সম্বন্ধীয় ব্যক্তির প্রতি যে ভাব প্রদর্শন করা হয় আচার্য্যের প্রতিও যে সেই সকল ভাব প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য ইহাই উক্ত কথা দ্বারায় বেশ বুঝা যায়। বিশেষতঃ যিনি বিধানাচার্য্য তাঁহার সহিত মণ্ডলীর কখনই কেবল বাহ্য পৃথিবীর সম্বন্ধ নয় যে পৃথিবী ত্যাগে তাহা মুছিয়া

যাইবে। সাধারণতঃ স্বামী স্ত্রীর বিবাহ হইলে যে সম্বন্ধ হয় যখন তাহাও অনন্তকালে যায় না, তখন এরূপ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ যাইবে কিরূপে ?

এ সম্বন্ধে "নববিধান পত্র" ব্রহ্মানন্দের দেহে অবস্থান কালেই লিখিয়াছিলেন :—"তোমরা তোমাদের নেতাকে চেন নাই, যদি তাঁহাকে তোমাদের কেবল মানবীয় গুরু মনে কর। তিনি বার বার সম্পূর্ণরূপে ইহা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি সকলকেই অন্তরস্থিত পবিত্রাত্মার প্রেরণা প্রত্যক্ষ ভাবে অন্বেষণ করিতে বলিয়াছেন। তিনি তাঁর বন্ধুদের কেবল শারীরিক নৈকট্যেই তুষ্ট নহেন, কিন্তু সর্ব্বদাই তাঁহার বন্ধুগণ যাহাতে সত্যেতে এবং ভাবেতে তাঁহার নিকট হন ইহাই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। সময় আসিয়াছে যখন তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে একজন মানুষ গুরু বলিয়া না মনে করিয়া তাঁহার দেহে অনবস্থানকালেও বন্ধুদিগকে প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের নিকট লইয়া যাইবার জন্য ঈশ্বর নিয়োজিত এবং ঈশ্বরাভিষিক্ত আত্মার বন্ধু বলিয়া যেন গ্রহণ করেন।"

শ্রীব্রহ্মানন্দও স্বয়ং বিভিন্ন সময়ে যে নিম্নলিখিত ভাবে প্রার্থনা যোগে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাতেও তিনি যে আমাদের চির আচার্য্য তাহা স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। কারণ তিনি বলেন :—

"দীননাথ, তোমার পদপ্রান্তে ভক্তের হৃদয়সরোবরে থাকিব। ভাইদের বুকের ভিতর প্রশস্ত সরোবরে এই মীন খেলা করিবে, বাড়িবে। বৃহৎ ভারত-সাগরে এসিয়া-সাগরে সমস্ত দেশের সমস্ত ভাইদের সমস্ত পৃথিবীর বুকের ভিতর এই মাছ বাড়িবে। সব ভাই এক হয়ে শেষে এক মাছ হয়ে ভারত-সাগরে আনন্দের সাগরে ব্রহ্মের সাগরে ভাসিয়া বেড়াইব।"

"যেন বন্ধুদের মনে থাকে একটা আসল কথা একজনের কাছে শিখে-ছেন, যা মান সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠা ধর্ম্ম শান্তি সংসারের সব সুখের মূল। এ সকলের মূলে একজনের ইসারা। মার হাসির রহস্য একজনের কাছে আগে আমদানী হয়েছিল, এখন সব জায়গায় আমদানী হয়েছে। সে এক সময় ছেলে হয়ে কাছে এয়েছে, মা হয়ে কাছে এয়েছে, বিপদের সময় বন্ধু হয়েছে। সে যে প্রাণ দিয়েছে সকলের জন্য, সেই লোকটা আমি। সে মানুষকে যদি না ভালবাসি তবে তুমি যে নিরাকার অদৃশ্য ভগবান তোমাকে যে ইঁহারা ভালবাসেন সে কথা আমি কেমন করে বিশ্বাস কর্‌ব।"

"তোমার স্বর্গের হুকুম জারি কটা লোক করিতে পারে? সে হুকুম না মানা আর ঈশ্বর নাই বলা এক। আমাকে মূর্খ জেনে পাপী জেনেও আসল বিধির জায়গা যেখানে নববিধানের দরজা যেখানে, আমি যদি সেখানে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিতে বলি এঁরা প্রাণ দিতে পারেন যদি তবে বলি বিশ্বাস, বিশ্বাস করিলে নিশ্চয় স্বর্গ আসিবে।"

"কাপড়ে রিপু করিতে তালি দিতে আমি আসি নাই। আমি যে একখানা নূতন কাপড়ের আগাগোড়া করিতে আসিয়াছি।"

"এখন এ জীবনের কথা লোকে বিশ্বাস করিতেছে না, কিন্তু ভবিষ্যতে নববিধানের আলোকে প্রমাণিত হইবে, আদৃত হইবে। তোমার সন্তানকে লোকে এখন চিনিতে পারিতেছে না, কিন্তু পরে পারিবে।"

"স্বর্গেতে তুমি একজন মানুষ প্রস্তুত করিয়াছিলে, সেই মানুষ আমি। যখন পৃথিবীতে আমাকে আনিলে, তখন আমি ছিলাম সদল অখণ্ড। আমি বিনয় ও অহঙ্কারের সহিত বলিতেছি আমাকে ছাড়ুক, শুকাইবে।

পারিবে না। ইহারা আমার যোগেতে আশ্রিত। এদের বসিবার পাহাড় আমি।"

"আমি জগৎকে ভালবাসি, কাকেও ছাড়িতে পারি না। আমাকেও কেহ ছাড়িতে পারে না।" "এই আমার গৌরব যে কেউ নিলেও আছি, না নিলেও আছি। স্বর্গের ছাপমারা দলিল আছে আমার কাছে। গোড়াও ঠিক আছে। এজন্য বড় গ্রাহ্য করি না, কে কি বলে কে কি করে।"

"আমরা ছোট গ্রামের জন্য প্রেরিত নই, আমরা মহাসমুদ্র পৃথিবীর জন্য প্রেরিত। রাজা হব মেদিনীপুরে, রাজ্য করিব আনন্দের রাজ্যে। সময় আসিয়াছে আসিতেছে, যখন বড় বড় ভূখণ্ড আসিবে আর আমি গৃহে স্থান দিব। আমি দুই ভূখণ্ডকে দুদিকে রাখিব।"

"চিদানন্দের যে ভক্ত তাঁহাদের সঙ্গে এক হয়ে থাক্‌ব। আমার মৃত্যু নাই, এ জীবনের ক্ষয় নাই।"

সত্যই তিনি যে পরিত্রাণের বীজ মন্ত্র শিখাইয়াছেন স্বর্গের অমৃতপান করাইয়াছেন, প্রাণ দিয়াছেন আমাদের তরে। তাঁর সঙ্গে কি সম্বন্ধ কেবল এই পৃথিবীর? তবে কি করিয়া বলিব তাঁর সহিত সম্বন্ধ ঘুচিয়া গিয়াছে বা যাইবে? তাঁহার সহিত যে সম্বন্ধ তাহা যে ইহ-পরলোকের সম্বন্ধ।

তবে এ মণ্ডলীতে অবশ্যই দৈহিকভাবে আচার্য্যের কার্য্য কোন ব্যক্তি যে আর করিবেন না তাহা নহে, কিন্তু তিনি ব্রহ্মানন্দের প্রতিনিধিরূপে করিবেন। তিনি তাঁরই আত্মায় আত্মস্থ হইয়া এই কার্য্য করিলেই তবে তাহা প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদিত হইবে। কারণ তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "যেখানে যে প্রচারক যান আমিই যাই, আমার অঙ্গে বিশটা প্রচারক।" সুতরাং তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া বা স্বয়ং আমি একজন হইয়া যিনি

মণ্ডলীতে আচার্য্যগিরি করিতে চাহিবেন, তিনি নিশ্চয়ই ঠকিবেন, এবং কিছুতেই তিনি সফলকাম হইতে পারিবেন না।

তাই তিনি অভিমান করিয়া বলিলেন :—

"আমার মত মানুষ আমার কাছে আসিল না বলিয়া আমি পারিলাম না এ এবার। আমি যতদিন আমার মত পাপী না পাই আমার কাজ করা হইবে না। ইহাঁরা যদি সেবা না গ্রহণ করেন ইহার পরের মনিবেরা লইবেন যাঁহারা চোদ্দ হাজার বৎসর পরে আসিতেছেন।" বাস্তবিক চির আচার্য্য না হইলে এমন কথা আর কে বলিতে পারেন ?

তিনি আরো বলেন :—

"আমি বুঝেছি একটা মাঝে খুঁটি চাই। কোথা থেকে আসবে আদেশ মা ? একটা লোক না হলে চলে না যে। আবার গুরু হতে চল্লাম। কি ভাবে গুরু হব ? নববিধানের গুরু, এক শরীরের সকলে অঙ্গ এই বিশ্বাস। আমার কথা এখন যার যা খুসী নিচ্ছেন, যেটা ইচ্ছা ফেলে দিচ্ছেন, আমি যেন গরীব বাপের জলে ভেসে এসেছি। তা কল্লে তো হবে না, যদি মানতে হয় তো ষোল আনা মানতে হবে। নববিধান সম্পূর্ণ লইতে হইবে। তা এতে একজন থাকুক, দেড়জন থাকুক।"

জন্মদিনে তিনি বলিলেন :—মা আজ বলচেন "যে আমার ভক্তকে ষোল আনা বিশ্বাস দেবে, সেই আমার আর কেহ নয়।" তাই আমরাও তাঁর সনে প্রার্থনা করি :—"হে প্রাণেশ্বর, এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন সকলে ষোল আনা বিধি পালন করে, ষোল আনা বিশ্বাস তোমাকে, তোমার বিধানকে, তোমার প্রত্যাদেশকে, তোমার ভক্তকে দিয়ে স্বর্গের উপযুক্ত হই।"

নববিধানভ্রাতৃমণ্ডলী, সাধকগণ।

দীক্ষার্থীর নববিধানের মত ও বিশ্বাস স্বীকারে শ্রীব্রহ্মানন্দ নবসংহিতায় বলিলেন :—"সমস্ত সত্য, সমস্ত প্রেম, সমস্ত পবিত্রতার আধার ঈশ্বরের যে অদৃশ্য রাজ্য তাহাই আমার মণ্ডলী।" এই অদৃশ্য মণ্ডলীকে কতকটা দৃশ্যমান করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি প্রথমে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। এবং এই সমাজকে নানা প্রকারে পরিপুষ্ট ও ক্রমোন্নত করিয়া নববিধান মণ্ডলীতে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। এই মণ্ডলী, তাঁহার মতে "এই পুণ্যভূমিতে ভ্রাতা এবং ভগ্নীগণের অভিনব মণ্ডলী" সুতরাং এই মণ্ডলী অন্য ধর্ম্ম মণ্ডলীর মত নহে এবং অন্যান্য ধর্ম্ম মণ্ডলীর মতেও ইহা চলিতে পারে না। অখণ্ড ভ্রাতৃত্ব স্থাপনাই এই মণ্ডলীর প্রাণ। সকল ভাই ভগ্নী যাহাতে চিরমিলিত হইয়া রহিয়াছেন, কেহ কাহারও হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন এবং হইতেও পারেন না ইহাই ইহার বিশ্বাস। স্বর্গে যেমন ঈশ্বর এক, মর্ত্তে তেমনি মানবমণ্ডলীও এক অখণ্ড, ইহা প্রমাণিত এবং প্রতিষ্ঠিত করাই এই মণ্ডলীর উদ্দেশ্য এবং কার্য্য।

তাই যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁর বিরোধী-গণ অন্য সমাজ স্থাপন করিতে গেলেন তখন ব্রহ্মানন্দ বলিলেন :—

"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের গঠনপ্রণালী যেরূপ ইহাতে বিচ্ছেদ অসম্ভব। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সম্পূর্ণরূপে সাম্প্রদায়িকতাশূন্য। ইনি সকল সম্প্রদায়কেই আপনার উদার বক্ষে গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী নহেন। বর্ত্তমান আন্দোলন দ্বারা যে একটী স্বতন্ত্র দল গঠিত হইয়াছে, যদিও সেই দলস্থ লোকেরা আপনাদিগকে ভারত-বর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বহির্ভূত জ্ঞান করেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

"মনুষ্যের যেরূপ স্বাধীন প্রকৃতি এবং বিভিন্ন রুচি, ইহাতে এরূপ দল বৃদ্ধি অনিবার্য্য। যদি' মনে কর যে দল বৃদ্ধি হইবে না, এরূপ আশা করা অন্যায়। যতদিন মনুষ্যের অবস্থা এবং সংস্কারের বিভিন্নতা থাকিবে ততদিন ভিন্ন ভিন্ন দল হইবেই হইবে। কিন্তু কতকগুলি দল বৃদ্ধি হইলেই যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ একটী সম্প্রদায় হইবে, এরূপ মনে করা ভ্রম। যেমন সত্য হইতে অসত্য উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব, জ্যোতি হইতে অন্ধকার নিঃসৃত হওয়া অসম্ভব, সেইরূপ সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্মিলনভূমি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ একটী বিশেষ সম্প্রদায় হওয়া অসম্ভব। সমুদয় দল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত। যতদিন সে সকল দলস্থ লোকেরা, ঈশ্বর এক, পরলোক আছে, এবং পাপ পুণ্যের বিচার হয়, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের এ সকল মূল সত্যে বিশ্বাস করিবেন ততদিন তাঁহারা আপনারা স্বীকার করুন আর নাই করুন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য।

"ধর্ম্মের মূল চিরস্থায়ী। আমাদের ইচ্ছানুসারে ধর্ম্মের মূল পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। এখন যদি সমুদয় প্রচারক চলিয়া গিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, তথাপি তাঁহারা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বন্ধু, কেন না মনুষ্যের সাধ্য নাই যে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের মূল নষ্ট করেন।

"ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ একটী ক্ষুদ্র সংকীর্ণ ধর্ম্ম সম্প্রদায় নহে। সকলকে একত্র করিবার জন্য এই সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অনৈক্য এবং সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তখন সকলকে একত্র করিবার জন্য যে এই সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে

পারে। অনেক বৎসর পরে নিরপেক্ষ ইতিহাস পাঠকেরা যখন এখনকার ঘটনা সকল আলোচনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কদাচ অনৈক্য বা বিচ্ছেদের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন নাই। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় একটী উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান, তিনি কোন সমাজ সংস্থাপন করেন নাই। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের গঠন প্রণালী স্বতন্ত্র। ইহা একটী সাপ্তাহিক উপাসনা স্থান নহে। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে একত্র করিয়া একটী উপাসনাশীল এবং নীতিপরায়ণ সমাজ গঠন করা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য। সকলের সঙ্গে ইহাঁর বন্ধুতার সম্বন্ধ। সমস্ত ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা এবং ব্রাহ্ম-উপাসকদিগকে সচ্চরিত্র করিবার জন্ত এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং কলিকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজও ইহার অন্তর্গত।"—আচার্য্যের উপদেশ ৮ম ভাগ।

ইহা দ্বারায় ব্রহ্মানন্দ স্পষ্টই ব্যক্ত করিলেন যে এ মণ্ডলী কখনই বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। কারণ সকলেই ইহার চির অন্তর্ভূত। এবং যাঁহারা ঈশ্বরের অখণ্ডত্ব এবং মানব ভ্রাতৃত্বের অখণ্ডত্ব স্বীকার করেন তাঁহারা কখনই ইহার বাহিরে বা ইহা হইতে স্বতন্ত্র আপনাদিগকে মনে করিতে পারেন না।

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে যদিও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজেই ব্রহ্মানন্দের "অভিনব ভ্রাতৃমণ্ডলী" সর্ব্ব প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু তাঁর ক্রমোন্নতিশীল জীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মণ্ডলীরও ভাব ক্রমে বিস্তারিত হয়। তাই যেমন উপরে বলিলেন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্ত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, "ইউরোপের প্রতি আসিয়ার

সুসমাচার", বিষয়ক বক্তৃতাতে বলিলেন "যখন আমি ছোট ছিলাম তখন বঙ্গদেশের সেবা করিয়াছি, ক্রমে যত বড় হইলাম ভারতের সেবা করিলাম, এখন সমগ্র এক মহাদেশের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছি।" সুতরাং যখন ব্রহ্মানন্দের মণ্ডলী জগদ্ব্যাপী হইয়াছে তখন যাঁহারা মনে করেন যে তাঁর প্রথমাবস্থার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজেই সেই মণ্ডলী চির নিবদ্ধ তাঁহারা নিশ্চয়ই ভুল করেন। কারণ তিনি ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন "ইহারা ব্রাহ্ম-সমাজের সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পারিলেন নববিধানের আরম্ভে আর পারিলেন না," "ব্রাহ্মধর্ম্ম নববিধানে পরিণত হইল;" "নববিধান নামে আখ্যাত করিলাম নব ব্রাহ্মধর্ম্মকে" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারায় ব্রাহ্মসমাজের সীমাকে অতিক্রম করিয়া যে তাঁর নববিধান মণ্ডলী ইহাই বুঝা যায়। তবে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যে ভাবে তিনি আরম্ভ করেন সেই ভাবই ক্রমোন্নত ও ক্রম বিকশিত হইয়া যে নববিধান মণ্ডলীতে পরিণত হইয়াছে তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না এবং যাঁহারা বিদ্বেষ ভাবে বলেন যে তিনি তাঁর বিরোধীদিগের আক্রমণ হইতে আপন মান বজায় করিবার জন্য নববিধানের ভাব হটাৎ বাহির করিলেন, তাঁহাদের কথাও যে নিতান্তই মিথ্যা, তাঁহার জীবনের ক্রমবিকাশেই তাহার প্রমাণ।

যাহাহউক কোন সমাজ কোন মণ্ডলীই নববিধান মণ্ডলীর বাহিরে আমরা মনে করিতে পারিনা, তবে যাঁহারা প্রকাশ্যভাবে ইহার প্রতি বিরোধিতা করেন বা ইহার পূর্ণ বিশ্বাস খর্ব্ব করিতে চান, তাঁহাদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য বৃথা উদারতা দেখাইয়া তাঁহাদের সে ভাব পোষণে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। পূর্ণ প্রেম সহকারে তাঁহাদিগকে অনুশাসিত করিয়া তাঁহারা যাহাতে চৈতন্য লাভ করেন তজ্জন্য প্রার্থনা

বাস্তবিক ব্রহ্মানন্দ কিনা নববিধানে এক অখণ্ড মানবমণ্ডলী স্থাপন করিতে আসিয়াছেন, কাজেই এ মণ্ডলীর বাহিরে আর কেহ থাকিতে পারে ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে।

এক্ষণে, ব্রহ্মানন্দের মতে যদিও সমগ্র নববিধান মণ্ডলীকেই এক দেহ বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে, কিন্তু দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গেরও অবশ্য তারতম্য আছে। দেহের মধ্যে উত্তমাঙ্গ ও অধমাঙ্গ যেমন, নববিধান মণ্ডলী সম্বন্ধে উচ্চ সাধক এবং নিম্ন সাধক অবশ্যই আছে। তাই সাধকদিগের অধ্যাত্ম অবস্থা অনুসারে ব্রহ্মানন্দ কয়েকটী সাধনমার্গ বা শ্রেণীবিভাগ করেন। (১) সাধারণ উপাসক। (২) ছাত্রদল। (৩) ভগ্নীদল। (৪) সাধকদল। (৫) গৃহস্থ বৈরাগী (৬) প্রেরিত-দল।

(১) সাধারণ উপাসক দিগের সম্বন্ধে ব্রহ্মানন্দ এই মাত্র নিয়ম করেন, যাঁহারা গর্হিত দোষ বিমুক্ত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাসী হইবেন, তাঁহারাই সাধারণ উপাসক শ্রেণীভুক্ত সভ্য হইবেন।

(২) ছাত্রদল, যাঁহারা বিশেষ ব্রত লইয়া ধর্ম্ম শিক্ষার্থী হই-বেন, তাঁহাদের জন্য ব্রহ্মানন্দ এই দল গঠন করেন। এবং নানা প্রকার ব্রত ও শিক্ষা দিয়া ও পরীক্ষাদি গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করেন।

(৩) শ্রীব্রহ্মানন্দ বলেন "যতদিন না ভগ্নীদল গঠিত হয় ততদিন মণ্ডলী অপূর্ণ। আমরা সরল ভাবে এবং একান্ত অন্তরে বিশ্বাস করি তাঁহাদের মধ্যে উন্নত যাঁরা তাঁহারা প্রচারিকা ভগ্নীদলে আবদ্ধ হইবেন, এবং কেবল যে নারীদিগের দৈন্য ও ধর্ম্ম প্রাণতার দৃষ্টান্ত দেখাইবেন তাহা নহে, ক্রমে প্রকাশ্যভাবে তাঁহাদের অপেক্ষা অল্প শিক্ষিতা ও অল্প ধার্ম্মিকা

ভগ্নীদিগের সেবিকার কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন।" এই বলিয়া তিনি কয়েক জন নারীকে ভগ্নীব্রত দান করেন।

(৪) সংসারী হইয়াও যাঁহারা সেবার কার্য্যে সহায়তা করিতে চান তাঁহাদের জন্য ব্রহ্মানন্দ সাধক শ্রেণী গঠন করেন। সাধক ব্রতধারী নিম্নলিখিত ভাবে প্রার্থনা করিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিবেন ইহা নবসংহিতায় ব্যবস্থা করেন :—"আমার সংসারাশক্তি নিবারণ জন্য এবং আমার হৃদয়কে তোমার দিকে ফিরাইবার জন্য আমি আর সংসারী লোকদিগের মত দিন না কাটাইয়া তোমায় যাঁরা ভালবাসেন, তোমার সেবা করা যাঁহাদিগের জীবনের প্রধান কার্য্য তাঁহাদের মধ্যে বাস করি এই তুমি ইচ্ছা করিতেছ, অদ্য তোমার পবিত্র সন্নিধানে গম্ভীর ভাবে পবিত্র সাধক শ্রেণীর ব্রত গ্রহণ করিতেছি এবং অঙ্গীকার করিতেছি যে আমি যথাসাধ্য ভজনে, নিয়মপালনে নববিধানের পবিত্র মণ্ডলীর সেবায় নিযুক্ত থাকিব।"

(৫) সংসারী গৃহস্থ হইয়াও যাঁহারা বৈরাগীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে চান, তাঁহাদের জন্য গৃহস্থ বৈরাগী দল ব্রহ্মানন্দ গঠন করেন। এই ব্রতধারী হইতে হইলে নিম্নলিখিতভাবে প্রার্থনা এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হয় নবসংহিতায় ব্যবস্থা করিয়াছেন :—

"আমি গৃহস্থ বৈরাগীর পবিত্র ব্রত লইতেছি এবং গম্ভীর ভাবে অঙ্গীকার করিতেছি যে, ইহার বিধি নিয়ম পালন করিব। নিরাপত্তিতে আমি আমার উপার্জ্জিত ধন সমস্ত নববিধানের পবিত্রমণ্ডলীর হস্তে অর্পন করিব এবং নিজের বাসনা এবং আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক পবিত্র মণ্ডলীর আদেশানুসারে নিজ পরিবার এবং অন্য সাধারণের উপকারার্থ তাহা ব্যয় করিব। যে ঋণ আমি পরিশোধ করিতে অক্ষম, সেরূপ ঋণে আবদ্ধ হইব না। তোমার প্রেরিত সময়ের দান আমি কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব এবং সংসারের

সুখ সম্ভ্রমের মধ্যে তোমার বলে আমি দারিদ্র্যব্রত প্রতিপালন করিব।" • • •

ইহাঁদের উপার্জ্জিত সমুদয় অর্থ জমা রাখিবার জন্য "বিধান ব্যাঙ্ক" নামে তিনি একটী ব্যাঙ্ক খোলেন, এবং প্রত্যেকের সঞ্চিত অর্থ নিজ নিজ আবশ্যক মত নিয়মিতরূপে ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

(৬) প্রেরিতদলই নববিধানমণ্ডলীর উত্তমাঙ্গ। এখন নবসংহিতানুসারে যাঁহারা ধর্ম্ম প্রচারক ব্রতধারী হইবেন তাঁহারাই এই দল ভুক্ত হইবেন। কিন্তু প্রথমে যাঁহারা আহুত হইয়া ব্রহ্মানন্দ সনে মিলিত হন তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে কোন অনুষ্ঠান করিয়া ইহাতে প্রবেশ করিতে হয় নাই। ইহাঁরা স্বয়ং ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নববিধান অট্টালিকার স্তম্ভ স্বরূপ হইয়াছেন বলিয়াই ব্রহ্মানন্দ ইহাঁদিগকে প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করেন। তাই তিনি ইহাঁদের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিলেন "ইহারাও যা আমিও তা, আমি এঁরা একটা।"

এই জন্য ইহাঁদের উপরেই তাঁর দাবী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ব্রহ্মানন্দ বাস্তবিক প্রেরিতদলকে আপন দেহরূপেই দেখিতেন এবং সেইজন্যই "আমরা নববিধানের প্রেরিত' সম্বন্ধে যে টাউনহলে বক্তৃতা করেন তাহাতে বলিলেন "এই দৃশ্যমান আমির পশ্চাতে এক অদৃশ্যমান আমরা রহিয়াছে।" ইহাঁদের লইয়াই বিশেষভাবে নববিধানের আদর্শ ভ্রাতৃমণ্ডলী তিনি গঠন করিতে নিযুক্ত হন। এবং এই আদর্শ মণ্ডলী সম্বন্ধে "নববিধান পত্রিকায়" বলেন:—"নববিধানের মূল্য কি যদি না ইহা একটী আদর্শ ভ্রাতৃমণ্ডলী স্থাপন করিতে পারে? প্রকৃত প্রেমিক ভ্রাতৃদল বিনা মণ্ডলীই কিছু নহে এবং এই মণ্ডলী বিনা ধর্ম্ম কেবল ভাব মাত্র। লোকেরাও যাহাকে মণ্ডলী বলে তাহা মণ্ডলীই নহে। সেখানে এতই অসম্মিলন,

সাংসারিকতা, বাহ্যাড়ম্বর, বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতা বিহীনতা আছে যে যাহাকে মণ্ডলী বলা হয় তাহা একটা ব্যবসার দোকান মাত্র।"

"নববিধানের প্রেরিতগণও জানেন তাঁহাদের মধ্যে গভীর বিভিন্নতা রহিয়াছে এবং যদি এই সকল মীমাংসিত এবং পরিত্যক্ত না হয় তাঁহারা কখনই প্রকৃত ভ্রাতৃত্বের উপকার সম্ভোগ আশা করিতে পারেন না। যেন ইহা স্মরণে থাকে যে বিশ্বাসের একতা এক নীতি, আত্ম-সংযম ও গভীর এবং প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা সাধন বিনা উৎসাহী ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের মধ্যে একতা সম্পাদিত হইতে পারে না। যদি ভ্রাতৃভাবের ভিত্তি এই সকল না হয় আমরা ভ্রাতৃভাব চাই না। যদি বিশ্বাস, পবিত্রতা, সংযম এবং প্রার্থনাশীলতার ফল প্রেম না হয় তাহা হইলে সে প্রেম আমরা চাই না। কে অস্বীকার করিতে পারে যে ব্রাহ্মসমাজেও সাধারণ ভ্রাতৃভাব আছে? কিন্তু আমরা অন্য এক প্রকারের ভ্রাতৃভাব এবং প্রেম চাই। আমরা সেই পবিত্র এবং উচ্চ ভ্রাতৃভাব চাই যাহাতে সাম্প্রদায়িকতা অসম্ভব। যাহা এখন আছে তাহাতে সম্প্রদায় গঠন নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট নহে।"

ব্রহ্মানন্দ কি মহান্ উচ্চ আদর্শে এই নববিধান ভ্রাতৃমণ্ডলী গঠন করিতে চাইয়াছেন তাহা তাঁহার উপরোক্ত কথাতেই উপলব্ধ হইবে। তাঁর পরিবার ও সমগ্র দল সম্বন্ধেও কিরূপ আশা করিয়াছেন নিম্ন-লিখিত প্রার্থনা দ্বারাও বুঝা যায়:—

"দুইটী জিনিষ ভাল হইলে তবে জগতের ভাল হওয়া আশা করিতে পারি। যদি পরিবারটি ভাল হয় আর দলটি ভাল হয়, তাহা হইলেই আশা করিব পৃথিবী নববিধানকে বলিবে ঠিক। আর এই দুইটি যদি ভাল না হয়, তবে হরি, কেন পৃথিবী এদের গ্রহণ করিবে? লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিবে

কোন্ পরিবারে পিতার নববিধানের মহিমা বেশী পড়েছে. পৃথিবী বলিবে, এদের কাছে। এ বাড়ী হরির বাড়ী, এতে কি আর ভুল আছে? এ বাড়ীতে যদি পাপ, অবিশ্বাস, অধর্ম্ম ঢোকে, আর এই পরিবার ছারখার হয়ে যায়। কে বলিতে পারে কি হইবে? আমার পরিবার যদি তোমার পরিবার হয়, আমার বাড়ী যদি তোমার বাড়ী হয়, তবে আমি সকলকে দেখাব, দেখ আমার সকল বস্তুতে হরি। আমার দল যদি তোমার হয় তা হলে পৃথিবীকে বলিব, দেখ কত বিভিন্ন এক হইয়াছে। আর তা যদি না হয় পৃথিবী বলিবে, আগে আপনার দল সাম্‌লা তবে আমাদের কাছে প্রচার করিস্। কত লোকের কাছে কত অপমান সহিব। চাঁড়ালদের মতন আমাদের ঘর। অবিশ্বাসের শাস্তি বজ্রধ্বনিতে এখানেও আসিবে। এরা আর কবে ভাল হবে? এরা তো অবিশ্বাসে তোমাকে অনায়াসে বলিতে পারে, এ তোমার বাড়ী নয় আমাদের বাড়ী। আমি কতবার তোমাকে আনিলাম, আর এরা তাড়িয়ে দিলে। আর দলের লোকের কাছে কেঁদে কেটে পায়ে ধরে তোমাকে আনিলাম, আর এরাও তোমাকে তাড়িয়ে দিলে? মা, যে দুটী সাক্ষী পাব মনে করেছিলাম, তাহাদিগের কাহাকেও পেলামনা। ঘর আর দল। আমি পঁচিশ বৎসর সাধনের পর এদের বাবু করিলাম। আমার সম্মুখে এরা সকাল বেলা তোমাকে ঘুসি দেখায়। এদের মধ্যে এমন লোক নাই যে মঙ্গলবাড়ী পরিষ্কার করে। এরা ঝাঁট দিতে অপমান মনে করে। এত দিনেও তোমার নববিধানের ফুল ফুটিল না। সকল নরনারী তোমার কাজ করিবে, ধর্ম্ম ঠিক রাখিবে, পরিশ্রমী হবে, তবে তো নববিধান পূর্ণ হবে। বড় বড় যোগ ভক্তি শিক্ষা দিতে বলিতেছি না, কিন্তু এরা যেন তোমার কাজকে নীচ কাজ না মনে করে। ছেলে মেয়েদের মনে বড় অমঙ্গল ঢুকেছে।

এখানে এত অমঙ্গল অন্যায় করিলে তুমি সহ্য করিতে পারিবে না তোমার লোকদের প্রেরিত প্রচারকদের বাবুয়ানা লাথি মেরে দূর করে ফেলে দাও। একটা দল প্রস্তুত কর, একটা ঘর প্রস্তুত কর যা দেখিলে লোকে বল্‌বে একটু ময়লা নাই। একটী দলের লোক কেহ কর্ম্মী, কেহ জ্ঞানী, প্রত্যেক প্রচারকের পরিবারে ঘর দেখ একটু পাপ নাই। কেমন পবিত্র ছেলে মেয়ে গুলি হাসিতেছে। মা, ইহাদের তোমার করিয়া লও।"

দল সম্বন্ধেও আরো এইরূপ কয়েকটী প্রার্থনা করেন ঃ—

"এ দলেই আমাদের মঙ্গল, আমাদের পরিত্রাণ। এ দল ছেড়ে যদি সকলে বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তবে কি বৃন্দাবনের মহিমা যাইবে। যদি এ সব ঘটনা হয় তথাপি এ দল তোমার চরণ ছাড়িবে না। দলবল লইয়া এক জয়গায় পড়িয়া থাকিব এই চাই। পরস্পরের চাকরের মতন হইয়া তোমার চরণে পড়িয়া থাকিব, ইহাই বিধানের অভিপ্রায়।"—দৈনিক।

"দল ছাড়া আমরা ত কিছুই নই ; আমাদের স্বতন্ত্রতা নাই। আমরা একা একা বৈকুণ্ঠের পথে যাইতে পারি না। এই সকল বিবাদ হিংসা দ্বেষ এই সকল আমাদের বুঝাইয়া দিতেছে যে দল ছাড়া কিছুই হইবে না। এরা সব এক রাস্তায় চলিতেছে, কিন্তু কেহ কাহারও মুখ দেখিতেছে না। সকলে মনে করিতেছে জীবনান্ত হইলে তোমার কাছে গিয়া বসিবে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব যোগ নাই। একা একা যাইবার হইলে এত দিন কি কেউ স্বর্গে যাইত না? এরা যেন কোথা থেকে গুরুবাণী শুনেছে যে জীবন শেষ হইলেই ইহাদের জন্য স্বর্গ হইতে রথ আসিবে। তবে এরা কেন আমার কথা শুনিবে, আমার উপদেশ মানিবে। নববিধান বিশ্বাসী হইলে কি হয়? ঐ যে মনের ভিতর একটু বিষ ঢুকেছে ওরা ভাবিতেছে একা একা স্বর্গে যাব। মা ধমক দিয়া বলে

দাও ওরকম করে কাম, ক্রোধ, লইয়া যাইতে পারবিনে। এ পাপগুলি না ছাড়িলে স্বর্গে যাওয়া হচ্চে না।"—দৈনিক প্রার্থনা।

ব্রহ্মানন্দ দেহ ত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁর কোন অনুগামী ব্যক্তিকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের একখানি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লিখিতে অনুরোধ করেন এবং তাহাতে মণ্ডলী সম্বন্ধে লিখিয়া দেন যে এই পাঁচটী বিষয়ে বিফল হইয়াছে :—১। "বৈরাগ্য এখনও বদ্ধমূল নাই। ২। প্রচারকদিগের মধ্যে প্রেরিতত্বের ভাব এবং দেবনিষ্ঠিতের অভাব। ৩। ভ্রাতৃভাব ও ক্ষমার হ্রাস, অহঙ্কৃত স্বার্থপর ব্যক্তিত্বের উন্নতি। ৪। যোগের প্রতিই অবহেলা। ৫। জীবনের সামঞ্জস্যাভাব।" সমগ্র মণ্ডলীর বিরুদ্ধেই ব্রহ্মানন্দের এই অভিযোগ।

যাহাহউক প্রেমই নববিধানের ভিত্তি ভূমি। প্রেম দ্বারাই ইহার মহা-মিলন। এই প্রেমই ব্রহ্মানন্দ-জীবন যাহাতে জগজ্জনের মিলন। ব্রহ্মানন্দ এই প্রেমের দ্বারাই ভক্তগণকে একসূত্রে গাঁথিয়াছেন এবং সমগ্র মানবমণ্ডলীকে এক করিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃত নববিধান মণ্ডলী ও ব্রহ্মানন্দ জীবন একই। এই জন্যই তিনি বলিলেন "আমি ও এঁরা এক জন।" "একমেবদ্বিতীয়ং ব্রাহ্মসমাজ বলিয়াছিলেন• উপরে, একমেবদ্বিতীয়ং নববিধান বলিতেছেন পৃথিবীতে, শত শত হস্ত শত কর্ণ শত নাসিকা শত চক্ষু এই যে প্রকাণ্ড নরাকৃতি মানুষ সেই আমি। এঁরা এক শরীরের অঙ্গ।"

এইরূপ এই মণ্ডলীকে একই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিয়া স্বীকার তিনি প্রথম হইতেই করিয়া আসিয়াছেন। তিনি ১৭৯৩ শকেও প্রচারক দিগের সভায় এইরূপ নির্দ্ধারণ করেন :—

"সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া একতা রক্ষা করিতেই হইবে। অধি-কাংশের মত, কি সভাপতির মত এ সকলের প্রাধান্যের প্রয়োজন নাই। এক শরীরের অঙ্গের ন্যায় প্রতিজনকে মানিতে হইবে। ইহাতে এক

অঙ্গ অন্য অঙ্গের বিরোধী কখনও থাকিতে পারে না। অধিকাংশের মত লইয়া কার্য্য করিলে এই দোষ থাকিয়া যাইবে। সুতরাং যে পর্য্যন্ত সকলে এক মত না হন, সে পর্য্যন্ত প্রয়াস প্রাপ্ত দ্বারা এক করিতে হইবে। এইরূপ একতায় যাহা নির্দ্ধারণ হয়, কোন কথা না বলিয়া সকলে তাহার অনুসরণ করিবেন।"

"নির্দ্ধারণ—এই সভার সভ্যেরা এক শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের ন্যায় মূলে একতা রক্ষা করিয়া কার্য্য করিবেন।"

এই রূপ ঐক্যমত্যে কার্য্য যে কেবল প্রচারকদিগের সভাতেই হইবে মণ্ডলীর কার্য্য ঐক্যমত্যে হইবে না ইহা ব্রহ্মানন্দের অভিপ্রায় নহে। এই সমগ্র মণ্ডলীই পরস্পরে এক শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপে কার্য্য করেন ইহাই তাঁহার স্থির মত। তাই ঐক্যমত্যই এই মণ্ডলীর ভিত্তি রূপে তিনি নির্দ্দেশ করেন। মণ্ডলীর সর্ব্বাঙ্গীন একতা না হইলে নববিধানের অখণ্ড মণ্ডলী হইবে আর কি রূপে। সুতরাং এ মণ্ডলীতে আমার তোমার প্রতিজনের ভোট এক একটী চলিতেই পারে না। শরীরের পক্ষে যেমন এক চক্ষের এক দৃষ্টি অন্য চক্ষের অন্য দৃষ্টি চলে না, উভয় চক্ষের একই দৃষ্টি হয়, ইহাও সেইরূপ। সকলের একই মত হইতে হইবে। সেইজন্য তিনি "নববিধান পত্রিকায়" পরিষ্কার রূপে মণ্ডলী পরিচালন সম্বন্ধে বলিলেন :—

"প্রার্থনা, বিশ্বাস এবং ধর্ম্মমত সম্বন্ধে অধিকাংশের মতের নিয়ম দ্বারায় পরিচালিত হইতে সাবধান হও। অনাধ্যাত্মিক অধিকাংশকে ঈশ্বরের গৃহের ব্যবস্থা ও পরিচালনা করিতে দিতে সাবধান হও। তাহারা দেবালয় হইতে আধ্যাত্মিকতা এবং প্রীতি পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিয়া [illegible]

চরিত্রের নীতি এখনও প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, এবং যাহারা সেই সকল নীতি হইতে দূরে রহিয়াছে, তাহারা যদি বিধি ব্যবস্থা করে এবং সে বিষয়ে বিচারসিদ্ধান্ত করে আমরা বিলক্ষণ জানি তাহারা মণ্ডলীকে কোথায় লইয়া ফেলিবে। যাহা কিছু উৎকৃষ্ট এবং পবিত্র তাহার সম্পূর্ণ ভরা ডুবি হইবে।

"আমরা বড় অধিকাংশ-মতের পক্ষপাতী নই, আমরা ঐকমত্যের পক্ষপাতী, এবং এই ঐকমত্য তখনই লাভ হয় যখন মানুষের স্থির ধর্ম্মনীতিতে দৃঢ়তা এবং আনুগত্য অটল হয়। কিন্তু যখন ব্যক্তিগত মত এবং বিচার বুদ্ধি কোন ধর্ম্মমণ্ডলী পরিচালকদিগের যথাসর্ব্বস্ব হয়, তখন অধিকাংশ-মতের বিধি সাংঘাতিক বিধি। ইহাতে নিশ্চয়ই মণ্ডলীকে সম্পূর্ণ অধঃপতনে লইয়া যাইবে। আমাদের কথা অপেক্ষা অভিজ্ঞতাই আমাদের বাক্যের সত্যতা প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণ করিবে।"

বিশেষতঃ নববিধান পবিত্রাত্মার বিধান। সুতরাং নববিধান মণ্ডলীর পরিচালন করিতে হইলে পবিত্রাত্মার পরিচালন বিনা বুদ্ধি যুক্তির দ্বারায় তাহা হইবার নহে। এক মণ্ডলী পরিচালন বিষয়ে এক পবিত্রাত্মা সকলকে একই আলোক প্রদান করিয়া থাকেন, সুতরাং তাহাতে ভিন্ন মত হওয়া যে অসম্ভব, ইহাই ব্রহ্মানন্দ উপরোক্ত উক্তির দ্বারায় প্রকাশ করিয়াছেন। তবে ব্যক্তিগত বিষয়ে প্রত্যেকের অবস্থানুসারে আলোকের পার্থক্য হইতে পারে।

ব্রহ্মানন্দ আরো এই ঐকমত্য সম্বন্ধে প্রার্থনায় বলেন :—

"একই মত, একই শাস্ত্র, একই বিধান, একই নিয়ম। আমরা ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে পারি না। যদি আমরা পাঁচ মত মানি, তবে [illegible] পাঁচ দেবতা মানি। তাহার এক দেবতার পাঁচ রকম মত হইতে পারে না। আমরা বিবেককে তোমার বাণী বলিয়া মানি, সেই বিবেক যদি বিভিন্ন রকম হইল, [illegible] [illegible] যদি

ভিন্ন প্রকারের মনে হইল, তবে ব্রহ্মখণ্ড ভিন্ন ভিন্ন হইল। তাহা হইলে বিপ
পাপী হইতে হয়, বড় অন্যায় হয়। একই মত, একই ধর্ম্ম। তুমি একমা
অদ্বিতীয়। তোমাকে আমরা মানি। তবেত আমাদের একমত হওয়া চাই
হে পিতা, তোমার ধর্ম্ম বাস্তবিক অখণ্ড, তাহা কেহ খণ্ড খণ্ড করিতে পারে
না। আমাদের পাঁচ জনের যদি পাঁচ মত থাকে তা হলে আমরা পৌত্তলিক
আমাদের সকলকে এক কর, একখানা কর। এক শরীর, এক মত, এক
হৃদয়, এক আত্মা কর। এক দেবতা তুমি, এক কথা বল, আমাদের সকলে
হৃদয়েই তাহা একেবারে পড়িবে। আমরা যেন স্বেচ্ছাচার বিভিন্ন মত
ত্যাগ করে এক মত, এক পথাবলম্বী, এক দেবতার উপাসক হই।"

বাস্তবিক অর্গান যন্ত্রে যেমন কতকগুলি ছোট ছোট পদার্থ একত্র
করিয়া এক তার যোগে বদ্ধ থাকিলে তবে তাহা বাজিয়া থাকে, পৃথক পৃথক
হইলে তাহা আদৌ বাজেই না, নববিধান ভ্রাতৃমণ্ডলীও এই ঐকমত্য মিলন
বিনা তেমনই চলিতেই পারে না। তাই বলি ব্রহ্মানন্দ-প্রেম-তারে গ্রথিত
হইয়া থাকাই এই মণ্ডলী রক্ষার একমাত্র উপায়। ব্রহ্মানন্দ-জননী
তাঁরই পবিত্রাত্মার দ্বারায় চৈতন্য বিধান করিয়া সেই ভাবে যদি
এই মণ্ডলীকে একতায় রক্ষা করেন তবেই হয়।

এই মণ্ডলীর প্রকৃত মিলন কি এবং কি হইলে তাহা সম্পাদিত
হইতে পারে ব্রহ্মানন্দ ইংরাজী "নববিধান পত্রিকায়" নিম্নলিখিত ভাবে
বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—"লোকেরা যখন প্রকৃত প্রস্তাবে পরস্পর
হইতে পৃথক হইয়া আছে, তখনও পরস্পরে একত্র ঈশ্বরের গৃহে এক
সুখী পরিবার হইয়া বাস করিতেছে মনে করিয়া প্রবঞ্চিত হয়। বাহ্যরূপে
আমাদিগকে ঠকাইয়া থাকে। বাহ্য মিলনকে আমরা অন্তরের মিলন
ভাবিয়া ভ্রম করিয়া থাকি। যদি [illegible]

পূজা করিতে বসেন, আমরা সিদ্ধান্ত করিতে চাই যে এই পঞ্চাশ জনই ঈশ্বরের মণ্ডলীতে বিশ্বাসে এবং প্রেমে এক হইয়াছে। কিন্তু কঠোর পরীক্ষার দ্বারায় এই ভ্রম অপনোদন করা উচিত, কারণ ইহা অনিষ্টকর এবং বিপদজনক।"

"এই সকল আত্মাগুলিই কি বিশ্বাস, সাধন এবং পবিত্রতার এক মার্গে বাস করে? যাঁহারা পরস্পরকে ভাই ভাই বলেন তাঁহারা কি সেই একই ঈশ্বরের পূজা করেন? তাঁহারা কি পরস্পরকে একই ব্যক্তিরূপে, যাহাতে প্রত্যেকের আমিত্ব পূর্নরূপে বিসর্জ্জিত হইয়াছে, প্রেম ও সম্মান করেন? তাঁহারা কি সেই একই কর্তব্যের আদর্শ এবং নৈতিক নিয়ম অনুসরণ করেন? তাঁহারা কি মত এবং আধ্যাত্মিকতায় এক?"

"এইরূপ পরীক্ষায় প্রকৃত অবস্থা কি প্রকাশিত হইবে। যতই আমরা আধ্যাত্মিকতায় উন্নত হই, ততই যাহাদের সহিত আমাদের বাহিরের মিলন তাহাদিগকে দূরে মনে হইবে। জড়ের আবরণ চলিয়া গেলে, বাহিরের সেবা এবং দৃশ্যমান বন্ধুত্ব মিথ্যা বলিয়া চলিয়া যায়, এবং কেবল যোগী আত্মাদিগেরই অনন্ত মিলন থাকিয়া যায়। হায় যাহারা এইরূপে আমাদের সহিত ইহ-পরকালের জন্য মিলিত তেমন কয়জন আছে!"

শ্রীব্রহ্মানন্দ তাই আক্ষেপ করিয়া প্রার্থনা করিলেন:—

"শব্দের সঙ্গী অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু ভাবের সঙ্গী অল্প। "আমরা ব্রাহ্ম" এই কথা বলিলে অনেক লোক পাই। "আমরা নববিধানবাদী," বলিলে তার চেয়ে কম লোক পাই। ইহাতেও কথাতে অনেক লোকের মিল হয়, কিন্তু ভাবে অনেক অমিল। আমরা সকলেই বলি নববিধান মানি। কিন্তু একজনের নববিধান আর এক জনের নয়। এক জনের

ঈশ্বর আর এক জনের নয়। ভাবের ঘরে আমাদের ছোট দল। শব্দের ঘরে অনেক লোক। পিতা, শব্দেতে যেমন মিলিয়াছে ভাবেতে তেমনি মিলাও। কেবল শব্দেতে যথার্থ মিল হয় না, ভাবেতেই মিল হয়।"

নববিধান ভ্রাতৃমণ্ডলী যে কি উচ্চ স্বর্গীয় আদর্শে গঠিত করিতে ব্রহ্মানন্দ চাহিয়াছেন নিম্নলিখিত প্রার্থনায় তাহা অতি সুন্দররূপে বলিয়াছেন :—

"মা, ধর্ম্মের সঙ্গী পাইতে ইচ্ছা হয়। হরিতে অভিন্ন হৃদয় হয়েছে, আপনার হয়েছে, এক প্রাণ হয়েছে, এমন লোক কই? অবিভক্ত প্রেম পরিবার চাই। আমি খুব উচ্চ রকম প্রেম পরিবার চাই। এক মত হইবে। এক পাড়ায় আছি বলিয়া, একত্র খাই, এক বাটীতে থাকি বলিয়া, খুব খোসামদ করে, গুরু বলে, ইহাঁদিগকেও প্রেমপরিবার বলিয়া মানি না। আমি বলি, প্রেম পরিবার যাদের মধ্যে এক রুচি, এক ইচ্ছা সম্ভব। একজন এদেশে একজন অন্য দেশে থাকিলেই বা। এক প্রাণ হইবে। নববিধান এখনও আসে নাই। নববিধান আসিলে তা হইবে। আপনার লোক তাকে বলি, গরুরা যেমন আপনার গোয়ালের গরুকে চিনিতে পারে, তেমনি আপনার লোক চেনা যায়। যে যেখান হইতে আসুক লোক দেখিলেই শুঁকিয়া চিনিতে পারিব তোমার গোয়ালের। আর তোমার হইলেই আমার, আমার হইলেই তোমার। আর আমাদের সকলের। ঠাকুর, কেউ আপনার নয় তুমি যাদের আপনার কর তাহারাই আপনার। সব মুখ এক মুখ হবে। সকলকার প্রাণ এক হবে। এক কুঞ্জের গরু, এক গোয়ালের গরু, এক মার সন্তান, এক পিতার পুত্র, এক রাজ্যের লোক, এক অভিন্ন হৃদয় পরিবার।" ব্রহ্মানন্দ-জননী করুন যেন এই মণ্ডলী তাই হয়।

শ্রীদরবার, নববিধান-প্রেরিতগণ।

শ্রীদরবারই নববিধান মণ্ডলীর এই আদর্শ মিলনের স্থান, এবং সকল প্রেরিতগণের অধ্যাত্ম চিরমিলনই শ্রীদরবার। প্রেরিতগণ কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া আছেন ইহা হইলেই আর শ্রীদরবার হইল না। বাস্তবিক কোন বৃক্ষের শাখা সকল যেমন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে জীবন-বিহীন ও ফলদায়ক হয় না, ব্রহ্মানন্দের মণ্ডলীস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই অবস্থা। বিশেষভাবে শ্রীদরবারই বিধানমণ্ডলীর মহামিলন জগতে প্রদর্শন এবং প্রতিষ্ঠিত করিতেই প্রেরিত।

তাই ব্রহ্মানন্দ নবব্রাহ্মধর্ম্মকে যেমন নববিধান নামে আখ্যাত করিলেন, তেমনি প্রচারকদিগের সভাকেও শ্রীদরবার নাম দিয়া নিম্নলিখিত ভাবে ইহার মান্য বাড়াইলেন :—

"এই দল ভিন্ন নববিধান হইতে পারে না। এই মণ্ডলী নববিধান আসিবার প্রণালী। এই ঘর তবে কাশী শ্রীবৃন্দাবন জেরুজেলেম অপেক্ষা বড়। এই ঘরের নাম উনবিংশতি শতাব্দীর স্বর্গ গমন। এই ঘরের প্রাচীরের মধ্যে শব্দ শ্রবণ করা যায়। পৃথিবী মধ্যে এই ঘর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এখন। এই ঘরের ছাদ হইতে দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখা যায় স্বর্গে কি হইতেছে, ঈশা মুষা শ্রীগৌরাঙ্গ যোগী ঋষিরা কি করিতেছেন। ভারি আশ্চর্য্য এই ঘর। এই দল, এই কটা লোক সেই দূরবীণ। এই দল একখানা শব্দ শুনিবার একটি যন্ত্র, একটা দূরবীক্ষণ। এই কটা লোক একজন লোক। সমস্ত তীর্থের মূলতীর্থ উনবিংশ শতাব্দীতে এই ঘর। এই ঘরে আমরা বসি, পূর্ণ বিশ্বাসীরা এই ঘরে বসে একটি একটি করিয়া সমস্ত শব্দ শুনেন।"

শ্রীব্রহ্মানন্দ এইরূপ প্রার্থনাদিতে শ্রীদরবারের কতই মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন; সুতরাং সেই উচ্চ ভাবেই আমাদের সকলেরই শ্রীদরবারকে দেখা উচিত। তবে শ্রীদরবারস্থ প্রেরিতদেবগণ যদি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হন তাহা হইলে শ্রীদরবারের পূর্ণতা রক্ষা হইতেছে তাহা আর কিরূপে বলা যাইবে? তাঁহাদের মিলনইত শ্রীদরবার।

নববিধান প্রেরিতগণকেও শ্রীব্রহ্মানন্দ কি উচ্চ ভাবে সম্মানিত করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিয়োগকালীন তাঁর নিম্নলিখিত উক্তিগুলি হইতে বেশ বুঝা যাইবে। তিনি বলেন:—

"নববিধানের প্রেরিতদল, আমি তোমাদের গুরু নহি, আমি তোমাদের সেবক, আমি তোমাদের বন্ধু। তোমরা আমার প্রভু, সুতরাং ভৃত্যের প্রতি প্রভুর যে ব্যবহার, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যে ব্যবহার, আমি তোমাদের কাছে সেই ব্যবহার প্রত্যাশা করি। আমি তোমাদিগের ঈশ্বর-প্রেরিত সেবক। অতএব তোমরা দয়া করিয়া আমাকে তোমাদের সেবকপদ হইতে কখনও বিচ্যুত করিও না। আমার স্বর্গের প্রভু আমাকে তোমাদের সেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছেন, সুতরাং আমার অহঙ্কারে স্ফীত হইবার কোন কারণ নাই। সেবাগ্রহণ না করিয়া এই গরিব সেবককে কখনও ডুবাইও না।"

"মহর্ষি ঈশা যেমন তাঁহার শিষ্যদিগকে নানা দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি তোমাদিগকে তাঁহার ন্যায় প্রেরণ করিতেছি না। আমি তোমাদিগের দলের এক জন। তোমরা প্রেরিত মহাপুরুষদিগের প্রেরিত। তোমরা এবং আমি শাক্যপ্রেরিত, ঈশাপ্রেরিত, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেরিত, এবং পৃথিবীর অন্যান্য মহাজনদিগের প্রেরিত। তাঁহারা পৃথিবীতে তাঁহাদিগের ভাব প্রচার করিবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণ

করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগের পদধূলি লইয়া তাঁহাদিগের কথা তোমাদিগকে বলিতেছি।

"তাঁহারা আমাদের পিতা, পিতামহ। তাঁহাদিগের ভাবে আমরা বিজাত্য। শাক্য, ঈশা, মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি সাধুদিগের বংশে তোমাদের জন্ম। আমি তোমাদিগকে প্রেরিতপদে নিয়োগ করিতেছি না, আমি তোমাদিগকে প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিবার আগে সেই স্বর্গস্থ মহাপুরুষেরা তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। এই স্বর্গ প্রেরিত মহাপুরুষেরা বর্ত্তমান থাকিয়া বলিতেছেন "নববিধানের প্রেরিতদল, তোমরা দুঃখী পাপীর দুঃখে কাতর হও। তোমাদের ভাই ভগ্নীরা নাস্তিকতা ও অধর্ম্মের সমুদ্রে ডুবিল, এ সকল দুর্ঘটনা দেখিয়া তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিও না।" সাধুদিগের জননী জগমাতাও তোমাদিগকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "নববিধানের প্রেরিতদল তোমরা আমার সন্তানগুলিকে বাঁচাও।"

"হে নববিধানের প্রেরিত দল, তোমরা তোমাদিগের এই দীনহীন সেবকের কথা শুন। তোমরা জান, আমাদিগের ঈশ্বর এক, প্রত্যাদেশ, এক, এবং সাধুমণ্ডলী এক, পরিবার এক। এই এক ঈশ্বরকে ভাল-বাসিবে, নিত্য ইহাঁর পূজা করিবে। দৈনিক পূজা দ্বারা জীবনকে শুদ্ধ করিবে। স্বর্গীয় সাধুদিগের সঙ্গে মনে মনে যোগ স্থাপন করিবে। তাঁহাদিগের সকলের রক্ত মাংস পান ভোজন করিয়া ভাগবতী তনু লাভ করিবে। তোমরা নিজ জীবনে পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ বৈরাগ্য, পূর্ণ প্রেমভক্তি, পূর্ণ বিবেক, পূর্ণ আনন্দ ও পূর্ণ পবিত্রতার মিলন ও সামঞ্জস্য করিবে। কোন একটি গুণের ভগ্নাংশে তৃপ্ত থাকিও না।

"পৃথিবীর সুখ সম্পদ কামনা করিবে না। ভিক্ষার দ্বারা জীবন রক্ষা করিবে। পরদুঃখে দুঃখী হইবে। সমস্ত মনুষ্যজাতিকে এক পরিবার

জানিবে। ভিন্ন জাতি কিংবা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া কাহাকেও পর মনে করিয়া ঘৃণা করিবে না। তোমরা সকলের মধ্যে থাকিবে এবং তোমাদের মধ্যে সকলে থাকিবেন। সকলে এবং তোমরা আবার এক ঈশ্বরের মধ্যে থাকিবে। এই যোগে মুক্তি, এই যোগে শান্তি। দুঃখের স্বরে কাতর স্বরে পৃথিবী তোমাদিগকে ডাকিতেছেন। যাও এখন প্রেরিতের দল পূর্ণ অপ্রতিহত বিশ্বাসের সহিত বিবেকী, বৈরাগী, সত্য-বাদী, জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভিখারীর বেশে যাও, নিতান্ত দীনাত্মা হইয়া যাও।

"প্রেরিত বন্ধুগণ, সোণা রূপা যেন তোমাদের লোভ উদ্দীপন না করে। তোমরা ভিখারী হইবে, কল্যকার জন্য ভাবিবে না। যে অন্ন চিন্তা, বস্ত্র চিন্তা করে সে অল্পবিশ্বাসী। ঈশ্বর তোমাদিগের সর্ব্বস্ব। তাঁহার চরণ ভিন্ন তোমরা আর কিছুই কামনা করিবে না। তিনি যে দিকে চালাইবেন সেই দিকে চলিবে। একান্ত মনে দয়াল প্রভুর উপর নির্ভর করিবে। তিনি যে অন্ন দিবেন তাহাই খাইবে। পৃথিবীর মলিন অন্ন খাইবে না, তাহাতে শরীরে ব্যাধি ও মনের পাপ জন্মে। মনুষ্যের দেওয়া অন্নে মন মলিন হয়। ঈশ্বরপ্রদত্ত শয্যায় শয়ন করিবে।"

"তোমরা পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে চলিয়া যাও। সর্ব্বত্র নববিধানের পূর্ণতা রক্ষা করিবে। কাহারও খাতিরে কিংবা ভয়ে নববিধানকে অপূর্ণ করিবে না, ইহাতে অন্য ভাব মিশ্রিত হইতে দিবে না। সমস্ত পৃথিবী যদি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দেয়, তথাপি তোমরা নববিধানকে ছাড়িবে না। [illegible] দেশ তোমাদের কথা শুনিতে না চায়, তোমরা সেই দেশে কথা বলিবে না; কেন না ঈশ্বরের আজ্ঞা নহে। সে দেশের [illegible] হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া তোমরা [illegible]

রাগ প্রতিহিংসা করিবে না। যাহারা তোমাদের প্রতি শত্রুতা করিবে, তাহাদিগের মস্তকে তোমরা প্রার্থনারূপ শান্তিবারি বর্ষণ করিবে। শত্রুর প্রতিও রাগিও না, কিন্তু দয়া ও ক্ষমা করিও। যাহারা নববিধানের সত্য বুঝিতে পারিবে না, তাহারা কেন মার সত্য বুঝিতে পারিল না এই বলিয়া কাঁদিও, দীনাত্মা ও সহিষ্ণু হইয়া সত্যরাজ্য বিস্তার করিবে। অনেক বিরোধী যদি দেখ তথাপি তোমাদের মনে যেন ক্রোধ ও অক্ষমা স্থান না পায়। শান্তি দ্বারা অশান্তি জয় করিবে। ভ্রান্ত ব্যক্তির অভিমান অহঙ্কার দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া সংশোধন চেষ্টা করিবে।"

"ধন মানের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া তোমরা পরম ধনের জন্য ব্যাকুল হও, ঈশ্বরের জয়ধ্বনি করিতে করিতে নববিধানের নিশান উড়াইয়া যাও, কোন শত্রু তোমাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না।"

"তোমরা যে দেশ দিয়া চলিয়া যাইবে, সে দেশে যেন পুণ্যসমীরণ ও শান্তিনদী প্রবাহিত হইতে থাকে। তোমরা যে গ্রাম দিয়া যাইবে সেই গ্রামের লোকেরা জানিবে যেন একটি তেজ চলিয়া যাইতেছে। অহঙ্কারের তেজ নহে, বিবেকের তেজ।"

"ভাল খাইব, ভাল পরিব, এরূপ নীচ সুখের লালসা মনে পোষণ করিও না। কদাচ মনের মধ্যে বিষয়সুখের ইচ্ছাকে স্থান দিবে না; কিন্তু কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ও বিনীত মস্তকে ঈশ্বরপ্রদত্ত সুখ গ্রহণ করিবে। ঈশ্বর যে সুখ দেন তাহা যদি গ্রহণ না কর তবে তোমরা স্বেচ্ছাচারী। তাঁহার সম্পর্কে কোন কথা বলিও না। ঈশ্বরকে আদেশ করিও না, তাঁহাকে কখন বলিও না যে, "তুমি আমাকে দুঃখ দাও, কিংবা বিষয়সুখ দাও।"

"ব্রহ্মরাজ্যে ব্রহ্মের আদেশে ঘটনাগুলি ঘটে। অতএব ঈশ্বরের রাজ্যের ঘটনাকে গুরু বলিয়া মানিবে। তাঁহার ইচ্ছাতে হয়ত আজ

জানিবে। ভিন্ন জাতি কিংবা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বলিয়া কাহাকেও পর মনে করিয়া ঘৃণা করিবে না। তোমরা সকলের মধ্যে থাকিবে এবং তোমাদের মধ্যে সকলে থাকিবেন। সকলে এবং তোমরা আবার এক ঈশ্বরের মধ্যে থাকিবে। এই যোগে মুক্তি, এই যোগে শান্তি। দুঃখের স্বরে কাতর স্বরে পৃথিবী তোমাদিগকে ডাকিতেছেন। যাও এখন প্রেরিতের দল পূর্ণ অপ্রতিহত বিশ্বাসের সহিত বিবেকী, বৈরাগী, সত্য-বাদী, জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভিখারীর বেশে যাও, নিতান্ত দীনাত্মা হইয়া যাও।

"প্রেরিত বন্ধুগণ, সোণা রূপা যেন তোমাদের লোভ উদ্দীপন না করে। তোমরা ভিখারী হইবে, কল্যকার জন্য ভাবিবে না। যে অন্ন চিন্তা, বস্ত্র চিন্তা করে সে অল্পবিশ্বাসী। ঈশ্বর তোমাদিগের সর্ব্বস্ব। তাঁহার চরণ ভিন্ন তোমরা আর কিছুই কামনা করিবে না। তিনি যে দিকে চালাইবেন সেই দিকে চলিবে। একান্ত মনে দয়াল প্রভুর উপর নির্ভর করিবে। তিনি যে অন্ন দিবেন তাহাই খাইবে। পৃথিবীর মলিন অন্ন খাইবে না, তাহাতে শরীরে ব্যাধি ও মনের পাপ জন্মে। মনুষ্যের দেওয়া অন্নে মন মলিন হয়। ঈশ্বরপ্রদত্ত শয্যায় শয়ন করিবে।"

"তোমরা পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে চলিয়া যাও। সর্ব্বত্র নববিধানের পূর্ণতা রক্ষা করিবে। কাহারও খাতিরে কিংবা ভয়ে নববিধানকে অপূর্ণ করিবে না, ইহাতে অন্য ভাব মিশ্রিত হইতে দিবে না। সমস্ত পৃথিবী যদি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দেয়, তথাপি তোমরা নববিধানকে ছাড়িবে না। যদি কোন দেশ তোমাদের কথা শুনিতে না চায়, তোমরা সেই দেশে নববিধানের কথা বলিবে না; কেন না ঈশ্বরের আজ্ঞা নহে। সে দেশের অন্ন বায়ু শরীর হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া তোমরা অন্যত্র চলিয়া যাইবে।

রাগ প্রতিহিংসা করিবে না। যাহারা তোমাদের প্রতি শত্রুতা করিবে, তাহাদিগের মস্তকে তোমরা প্রার্থনারূপ শান্তিবারি বর্ষণ করিবে। শত্রুর প্রতিও রাগিও না, কিন্তু দয়া ও ক্ষমা করিও। যাহারা নববিধানের সত্য বুঝিতে পারিবে না, তাহারা কেন আর সত্য বুঝিতে পারিল না এই বলিয়া কাঁদিও, দীনাত্মা ও সহিষ্ণু হইয়া সত্যরাজ্য বিস্তার করিবে। অনেক বিরোধী যদি দেখ তথাপি তোমাদের মনে যেন ক্রোধ ও অক্ষমা স্থান না পায়। শান্তি দ্বারা অশান্তি জয় করিবে। ভ্রান্ত ব্যক্তির অভিমান অহঙ্কার দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া সংশোধন চেষ্টা করিবে।"

"ধন মানের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া তোমরা পরম ধনের জন্য ব্যাকুল হও, ঈশ্বরের জয়ধ্বনি করিতে করিতে নববিধানের নিশান উড়াইয়া যাও, কোন শত্রু তোমাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না।"

"তোমরা যে দেশ দিয়া চলিয়া যাইবে, সে দেশে যেন পুণ্যসমীরণ ও শান্তিনদী প্রবাহিত হইতে থাকে। তোমরা যে গ্রাম দিয়া যাইবে সেই গ্রামের লোকেরা জানিবে যেন একটি তেজ চলিয়া যাইতেছে। অহঙ্কারের তেজ নহে, বিবেকের তেজ।"

"ভাল খাইব, ভাল পরিব, এরূপ নীচ সুখের লালসা মনে পোষণ করিও না। কদাচ মনের মধ্যে বিষয়সুখের ইচ্ছাকে স্থান দিবে না; কিন্তু কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ও বিনীত মস্তকে ঈশ্বরপ্রদত্ত সুখ গ্রহণ করিবে। ঈশ্বর যে সুখ দেন তাহা যদি গ্রহণ না কর তবে তোমরা স্বেচ্ছাচারী। তাঁহার দানসম্পর্কে কোন কথা বলিও না। ঈশ্বরকে আদেশ করিও না, তাঁহাকে কখন বলিও না যে, "তুমি আমাকে দুঃখ দাও, কিংবা বিষয়সুখ দাও।"

"ব্রহ্মরাজ্যে ব্রহ্মের আদেশে ঘটনাগুলি ঘটে। অতএব ঈশ্বরের রাজ্যের ঘটনাকে গুরু বলিয়া মানিবে। তাঁহার ইচ্ছাতে হয়ত আজ

এখানে, কাল ওখানে, আজ মানের মধ্যে, কাল অপমানের মধ্যে ; কিন্তু ভয় নাই, তোমরা চঞ্চল হইও না, কেন না ঈশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায়ে তাঁহার প্রেরিতদের সম্পদে বিপদে সকল অবস্থা মঙ্গল হয়। স্বর্গের প্রেমবায়ু যাহা আনে তাহাই গ্রহণ করিবে। লোককে বিরক্ত করিয়া টাকা লইও না, সময়ে আপনি টাকা আসিবে। পূর্ণ ব্রহ্ম তোমাদের ভার লইয়াছেন, তোমরা কেবল নিশ্চিন্ত হৃদয়ে তাঁহার কার্য্য করিবে। যে কার্য্য করে না সে পুরস্কার পায় না। তোমরা কেবল ঈশ্বরের কার্য্য করিবে এবং তাঁহার স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ করিবে, পরে দেখিবে ভগবান তোমাদিগকে স্বর্গরাজ্য এবং যাহা কিছু এই পৃথিবীতে আবশ্যক সকলই দিবেন।”

“তোমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হইবে। গণিতশাস্ত্রের সত্যের ন্যায় তোমাদের সত্য বিশ্বাসে পরীক্ষিত হইবার যত্ন। এমন কোন কার্য্য করিবে না যাহাতে ভবিষ্যতে শত শত নরনারী উপধর্ম্মে পড়িতে পারে। তোমাদের দোষে কি আলস্যে যদি কোন নরনারী পাপ করে তোমরা দায়ী হইবে। যেখানে অধর্ম্ম ধর্ম্মকে মারিতে আসিতেছে, যেখানে ব্যভিচার সতীত্বকে মারিতে আসিতেছে, সেখানে তোমরা বজ্রদেহী ধর্ম্মবীরের ন্যায় সাহসী ও বিক্রমশালী হইয়া ধর্ম্ম ও সতীত্ব রক্ষা করিবে। তোমরা বিশ্ববিজয়ী সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের প্রেরিতজন, তোমরা নির্ভয়ে তাঁহার ধর্ম্ম রক্ষা করিবে। যাহাদিগকে হরি রক্ষা করেন তাহাদিগকে বধ করে কাহার সাধ্য?”

“তোমরা যেমন আপনারা মোহজাল কাটিবে, তেমনি তোমাদের স্ত্রী পুত্রদিগকেও মোহজাল কাটিতে শিখাইবে। হে প্রেরিত দল, যাহ [illegible] শিখিয়াছ নববিধানের ভেরী তূরী

চরিত্রকে টানিয়া লও। নবভাব, নবঅনুরাগ, নবভক্তি প্রদর্শন করিয়া জগতের নরনারীকে নববিধানের দিকে আকর্ষণ কর।"

প্রেরিতনিয়োগ বিষয়ে শ্রীব্রহ্মানন্দ ইংরাজীপত্রে যে উক্তি নিবদ্ধ করেন, তাহার অনুবাদ হইতেও কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"তদনন্তর প্রভু পরমেশ্বর নবনির্ব্বাচিত প্রেরিতগণকে এইরূপে অনুশাসন করিলেন :—"তোমরা স্বর্ণ রৌপ্য অন্বেষণ করিবে না। তোমরা বেতনভোগীর ন্যায় সেবা করিবে না, অথবা টাকার জন্য স্বাধীন ব্যবসায় চালাইবে না। আমার প্রেরিত হইয়া তোমরা যে সকল সেবার কার্য্য সম্পাদন কর তাহার জন্য বিনিময়স্বরূপ কিছু গ্রহণ করিয়া তোমরা তোমাদের অঙ্গুলী অপবিত্র করিবে না।"

"অবিশ্বাসীরা যে প্রকার আহার বা পরিচ্ছদের জন্য উদ্বিগ্ন, তোমরা সেরূপ উদ্বিগ্ন হইবে না। যদি সংসার তোমাদিগকে আহার দেয় তোমরা সে আহার আহার করিবে না। কারণ আমি তোমাদিগের প্রভু, আমি তোমাদিগকে আহার যোগাইব। যাহা তোমরা আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলে না, তাহা তোমরা স্পর্শ করিতে পার না। তোমাদিগের আহার ও পরিচ্ছদ সামান্য হউক, যেন সকলে তোমাদিগকে আমার লোক বলিয়া জানিতে পারে; তোমরা তদ্রূপ প্রলোভনের অতীত হও। মদ্য ও প্রমদা হইতে তোমরা বি[illegible]ক্ত থাক। গাম্ভীর্য্য সহকারে তোমাদিগকে প্রকৃতিস্থতা এবং অনাড়ম্বরতার ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে।"

"তোমাদের স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, বিত্ত প্রভুকে সমর্পণ কর, এবং ইহা হইতে বিশ্বাস কর যে, তাহারা আমার, তোমাদের নয়। একটী পারিবারিক বেদী স্থাপন কর যে, আমি তোমাদিগের গৃহ এবং তন্নিবাসিগণকে আশীর্ব্বাদযুক্ত এবং পবিত্র করিতে পারি।"

"ক্রোধী হইও না, কিন্তু যত বার তোমাদের বিরোধী তোমাদের প্রতি অসদ্ব্যবহার করে, ততবার সহিষ্ণু হও এবং ক্ষমা কর। বন্ধু ও বিরোধী সমুদয় লোককে ভালবাস। ন্যায় ব্যবহার কর। যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা অর্পণ কর।"

"তোমারা জ্যেষ্ঠগণকে সম্মান কর। ধনী, পরাক্রান্ত, জ্ঞানী ও বৃদ্ধের সমাদর কর। তোমাদিগকে শাসন করিবার জন্য যে সম্রাটকে প্রেরণ করিয়াছি তাঁহাকে সম্মান কর, এবং তৎপ্রতি হৃদয়ের প্রভুভক্তি, এবং তাঁহার সিংহাসনোপযোগী কর অর্পণ কর।"

"সত্যবাদী হও এবং বিশ্বাস কর মিথ্যাকথন অতীব জঘন্য পাপ। রসনাকে সংযত কর, এবং নির্ভয়ে সত্য বল। বিনয়ী হও, কোন বিষয়ে আপনার উপরে গৌরব লইও না। 'আমি,' 'আমার,' 'আমার,' এ ভাব চিরদিনের জন্য বিদায় করিয়া দাও। নীচ আমিত্ব, স্বার্থপরতা ও অভিমান পরিহার কর, এবং আপনাকে ঈশ্বরে ও সুবিস্তীর্ণ মনুষ্যত্বে নিমগ্ন করিয়া ফেল। তোমরা তোমাদের আপনার নও, কিন্তু আমার এবং পৃথিবীর।"

"সমগ্র হৃদয়ে সমগ্র আত্মাতে উৎসাহ উদ্যম ও প্রেম সহকারে নিত্য উপাসনা কর। সর্ব্বাপেক্ষা উপাসনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান এবং বিশ্বাস কর যে উপাসনায় অনিয়ম, অধৈর্য্য, চাঞ্চল্য, অসারল্য বা শুষ্কতা মহাপাপ। এই পাপ আমার নিকটে অতীব ঘৃণার্হ। উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল প্রেম এবং মনের একতানতাসহকারে উপাসনা কর যে, শীঘ্রই যোগ ও সহবাসসম্ভোগ করিতে পারিবে।"

"আমাতে, অমরত্বে, এবং বিবেকে বিশ্বাস স্থাপন কর। প্রথম দুটিতে তোমাদের পিতা এবং তোমাদের গৃহ দর্শন করিবে, শেষটিতে গুরুর স্বর

শুনিবে। সমুদয় ঋষি শাস্ত্রের সম্মান কর। উপাসনা, ধ্যান, অধ্যয়ন, ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রসঙ্গ, দেবভাবসম্পন্ন অনুষ্ঠান, প্রচার এই সকল তোমাদের দৈনিক কার্য্য হইবে। এ সকলেতে সমুদয় বর্ষ আমায় অর্পণ করিবে।"

"যাও গিয়া সকল দিকে সকল শ্রেণীর নরনারীর মধ্যে স্বর্গরাজ্যের উৎকৃষ্ট বীজবপনপূর্ব্বক আমার সত্য প্রচার কর। অহঙ্কারবশতঃ হাতে হাতে ফল অন্বেষণ করিও না, কিন্তু বিনীতভাবে প্রভুর কার্য্য করিয়া যাও।"

যাহাহউক প্রেরিত মহাশয়দিগের যথার্থ সম্মান ব্রহ্মানন্দই জানিয়াছেন, এবং তাঁর অনুগামী হইয়া আমাদেরও তাঁহাদিগের প্রতি সেই সম্মানই প্রদান করা উচিত এবং তেমনি উচ্চ ভাবেই তাঁহাদিগকে দেখা উচিত। তিনি অপর স্থানে বলিয়াছেন "ঈশ্বর বলিয়াছেন, প্রেরিতে প্রেরিতে অনৈক্য থাকিবে দণ্ড দিতে হয় আমি দিব, পৃথিবী তুমি কৃতজ্ঞ হইয়া উপকার লইবে।" সুতরাং তাঁহাদের ব্যক্তিগত মানবীয় কিছু দোষ-দুর্ব্বলতা থাকিলেও আমাদের তাহা বিচার করিবার অধিকার নাই। নববিধানে "কাহারও কালো দিক যে দেখিতে নাই" ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের চির ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁহাদের সঙ্গে লইয়াই যে ব্রহ্মানন্দ নববিধান রচনা করিলেন ইহা আমাদের চিরদিন স্বীকার করিতেই হইবে এবং তাঁহারা নববিধান গঠনে যে সহায়তা করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা না দিলে আমাদের অপরাধ হইবে।

তাঁহাদিগের ব্যক্তিগত উৎকর্ষও সামান্য নহে। ব্রহ্মানন্দ নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছেন যে ইহাঁরা এক একজন অন্য দলের প্রার্থনীয়। এবং তাঁহাদের প্রতি জনের এক একটী বিশেষভাবও এইরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ঃ—"শ্রীপ্রতাপচন্দ্র—ইউরোপিয়াংশ। শ্রীঅমৃতলাল—কীর্ত্তন বা

সোদ্যমা ভক্তি। শ্রীকান্তিচন্দ্র—প্রতিপালন। শ্রীমহেন্দ্র নাথ—ব্রহ্মধর্ম। শ্রীগৌরগোবিন্দ—হিন্দুধর্ম। শ্রীগিরিশচন্দ্র—মুসলমান ধর্ম। শ্রীউমানাথ—বিশ্বাস। শ্রীপ্রসন্ন কুমার—কার্যোদ্ধার। শ্রীকেদারনাথ—শান্ত ভাব। শ্রীদীননাথ—প্রদেশের ভার গ্রহণ। শ্রীপ্যারীমোহন—সুসংবাদ লিপি। শ্রীরামচন্দ্র—সাধারণ সহকারী। শ্রীবঙ্গচন্দ্র—পূর্ববাঙ্গালায় নববিধানের ভাব স্থাপন।* বাস্তবিক ইঁহারা নিজ নিজ বিশেষভাবেও যে প্রেরিতত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন কেহই সংশয়ী হইতে পারেন না।

প্রেরিত মহাশয়গণ যাহাতে পরস্পরের প্রতিও শ্রদ্ধাবান হন এই নিমিত্ত শ্রীদরবার হইতে নিরূপণ করিয়া ব্রহ্মানন্দ এক একজনকে এক ভাবের দৃষ্টান্ত হইবার জন্যও ভার দেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত মত দৃষ্টান্তের ভার প্রদত্ত হয়:—

*শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দে—ক্ষমাশীলতা। শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত—নিঃস্বার্থ ভাব। শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন—কামনিগ্রহ। শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র—পরসেবা। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চৌধুরী—বৈরাগ্য। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন—সত্যবাদিতা। শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত—নিরহঙ্কার। শ্রীযুক্ত গৌর-গোবিন্দ রায়—দীনতা। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল—অবস্থাজয়, পুরস্কার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—স্বাধীনতা। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু—উৎসাহ শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার—সৌজন্য। শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায়—
শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বসু—সহিষ্ণুতা। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র
Bias শূন্য।*

বাস্তবিক নববিধান-প্রেরিত মহাশয়
এক এক বিষয়ে এতই উচ্চ আদর্শ চরি
ন্যায় মহাত্মা ব্যক্তি অল্পই আছে

উনি আমি, এই বিশ্বাস চাই। নববিধানের কথা ধরিলে আর কেহ স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। একজন এসে মধ্যে দাঁড়ায়, আর কয়জন আসিয়া যোগ দেয়।"

আরো বলেন :—"বিধানের জন্মের পর একটী শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গরূপে সকলে অভিন্ন হৃদয় এক হৃদয় হইয়া প্রচার করুন। সমস্ত প্রণালী একীভূত হয়, বিচ্ছেদ বিভিন্নতা স্বতন্ত্রতা বিবাদ না থাকে। কি পান কি বস্ত্র পরিধান ইত্যাদিতে একতা দৃষ্ট হউক। আমরা এক, আমরা প্রচার করিতেছি এক ধর্ম্ম। নগর কীর্ত্তন উপাসনা প্রভৃতিতে একতা থাকিবে। কথা, মত বিশেষ রাখিয়া মূলে ঐক্য চাই।" সুতরাং সকলকার এই ঐক্যই শ্রীদরবার, ঐক্যেই নববিধান। প্রেরিতগণ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, ইহাঁদের প্রতিজনের নিকট যে বিধান প্রকাশ হইবে তাহাও কখনই নববিধান নহে। ব্রহ্মানন্দ তাঁহার নিজ সম্বন্ধেও যেমন বলিলেন "ইহাঁরা একজন যা বলিবেন তা আমি নয়। ইহাঁদের স্বাতন্ত্রে আমি নই। একজন আমার ভক্তি ভাগ, একজন আমার যোগের ভাগ, একজন আমার কর্ম্মশীলতার ভাগ লইয়া গেলেন তাতে হইবে না। কাটা মানুষ কেহ নিয়ে না যান।"

সেইরূপ বিধান সম্বন্ধেও বলিলেন :—"নির্জ্জন প্রেমিক, স্বতন্ত্র বৈরাগী, বিচ্ছিন্ন সাধক ইহাঁরা মৃত্যুর পথে দাঁড়াইয়াছে।" "হস্ত যদি শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, সুন্দর হস্ত পচিবে, নষ্ট হইবে, দুর্গন্ধ হইবে। যতক্ষণ হস্ত পদ শরীরে আছে ততক্ষণ ভাল সুগন্ধ কর্ম্ম করিতে সক্ষম। তোমার বিধান একটি শরীর ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মানুষ। মানুষ যদি পৃথক পৃথক হইয়া ধর্ম্ম সাধন করে নববিধানের পরিত্যক্ত বস্তু হয়।

"কাজের যোগ গেলে বিধানবাদীর বিধানবাদিত্বই ঘুচিল। আমি যদি বাহিরে গিয়া বৌদ্ধ মতে, কি হিন্দু মতে, কি মুসলমান মতে উপাসনা করি, তবে আমি মৃত নিষ্ফল শুষ্ক তরুর ন্যায়।"—প্রার্থনা 'বিধান শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।'

বাস্তবিক দর্পণের কাচ যেমন অখণ্ড থাকিলে তাহাতে প্রতিমূর্ত্তি সুন্দর রূপে প্রতিফলিত হয়, কিন্তু তাহা ভাঙ্গিলে তাহাতে যে খণ্ড খণ্ড মূর্ত্তি দেখা যায় তাহা কখনই পূর্ণ নহে। সেইরূপ প্রেরিতগণের সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণ মিলিত শ্রীদরবারেই পূর্ণ নববিধান প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে তাঁহাদের বিভিন্নতায় কখনই নববিধান পূর্ণ প্রকাশ হইতে পারে না।

শ্রীব্রহ্মানন্দও আপনাকে "বিধান শরীরের অঙ্গ" "তোমাদেরই একজন" ইত্যাদি বলিয়াছেন; তাই বলিয়া যে প্রেরিতগণও তাঁহার সমকক্ষ, কিংবা তিনিও যে পাচজনের একজন তাহা নহে। তিনি কখনই আপনাকে স্বতন্ত্র একজন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন "ইঁহারা ও আমি একজন।" তাছাড়া প্রেরিত মহাশয়দিগের বিচ্ছিন্নতা দেখিয়া তিনি তীব্র তিরস্কার করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁর ও প্রেরিতগণের পরস্পর সম্বন্ধও পরিষ্কাররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত উক্তিগুলি তাহার মধ্যে প্রধান:—

"লেখা ছিল শাস্ত্রে একজন লোকে কয়জন লোক মিলিত হইয়া যাইবে এবং তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিবে এবং সমুদয় মিলিয়া তোমাতে বিলীন হইয়া যাইবে, ইহাই নববিধানের তাৎপর্য্য। একজন মধ্য বিন্দুতে দশজন আকৃষ্ট, মিলিত হইবে। যেখানে দশজন এক হইবে সেখানে একটা অবলম্বন চাই। আমরা তাহা মানিলাম না বলিয়া মিলন হইল না।"—'প্রার্থনা একাত্মতা।'

"একজনের কাছে এক রকম আমি আর একজনের কাছে আর এব রকম। ইহারা বলিতে পারিলেন না কে আমি কি আমি। বুঝিবে যে পারিবেন সে আশাও কমিতেছে। যদি ঠিক বুঝিতেন এত বিবাদ বিসম্বাদ থাকিত না।"—দৈঃ প্রার্থনা, 'আচার্য্য গ্রহণ।'

"কি দোষ করিলে ধর্ম্মের মূলে কুঠার মারা হয়? নরক কোন্ পাপে আমরা যদি গোড়া না মানি। যেখান থেকে ধর্ম্মের কথা আসছে তাবে যদি বিশ্বাস না রাখি। বিধি নিতে যদি ত্রুটি হয়, বিধানবিশ্বাসে যদি ত্রুটি হয়। বিধানবাদী যদি বিধান না মানিলেন, তার সঙ্গে যদি আর পাঁচটা মত মিশাইলেন। এইখানকার মত যদি পূর্ণতার সহিত ন লইয়া তাহাতে নিজের বুদ্ধির মত মিশাইলেন তাহলে ভয়ানক নরকে পথ পরিষ্কার করা হইল। পরিত্রাণের বীজমন্ত্র কেহ বাদ দিয়া লইবে না, মিশাইয়া লইবে না, ছোট করে লইবে না, ষোল আনা গ্রহণ করিতে হইবে।

"এতো বড় অহঙ্কারের কথা যে আমার কথা গ্রহণ না করিলে তাইয়ে পরিত্রাণ হইবে না? কিন্তু এরূপ অহঙ্কারের কথা সোণার অক্ষরে লেখা থাকে। এ যে পরিত্রাণ লইয়া বিষয়। হিন্দু বলিয়া মুসলমানের কোরাণের মতে চলিলে, শাক্ত বলিয়া বৈষ্ণবের মতে চলিলে ভয়ানক কপটতা অবিশ্বাস হইল। একবার যদি বিধান মানা হয় ষোল আনা লইতেই হইবে।"—প্রার্থনা, 'বিধান প্রবর্ত্তকে বিশ্বাস।'

"হে নববিধানের রাজা, আমার যদি বিচার হয় আমি বল্‌তে পারবে না এই সমুদয় আমারই। আমার জিনিষ বলে আমি স্বীকার করতে পারছি না, যদি পূর্ণ আদর্শটী পৃথিবীকে দিয়ে যেতে পারতাম তবু

এসে বল্লেন ওখানটা আরো কালো হবে, এই বলে আলকাতুরা মাখিয়ে দিলেন, আর একজন এখানটা এ রকম হবে না বলে বদ্‌লে দিলেন, দিয়ে বল্লেন এই আমাদের নববিধান। তাঁরা আমাদের নববিধান বলুন, নববিধানের ছবি এঁকে তার নীচে সই দিন, আমি কিন্তু প্রাণান্তেও সই দেব না।

"গোড়ার নক্সা যে আমার তাতে কেন অন্য রং মিশালেন। আমার আদর্শ বদ্‌লে দিলেন কেন? গরীবের আদর্শটা পৃথিবীতে রইল না যে। গোড়াটা ঠিক থাকা চাই। তবে কেন পাঁচ জনে আমার কাজের সঙ্গে গোলমাল কল্লেন? পাঁচ রকম মত মেশালেন? পরমেশ্বর পবিত্রাত্মা-সম্ভূত এক ভাবজাত সুজাত সুকুমার নববিধানকে এনে দাও। তোমার খাঁটী অমিশ্র নববিধান গ্রহণ করে শুদ্ধ এবং সুখী হই।"—প্রার্থনা, 'অমিশ্র বিধান গ্রহণ।'

যথার্থ নববিধানের মূল নক্সাকারীই ব্রহ্মানন্দ, আর প্রেরিতগণ তাঁর সাহায্যকারী। নক্সাতত্ত্ব যাঁহারা জানেন তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যিনি অট্টালিকা বা কোন কলের মূল নক্সা করেন, তিনি কেবল পেন্সিলে লাইন কাটিয়া বিন্দু বিন্দু দিয়া যান, তাতে অট্টালিকাটী যেমন হইবে নক্সাকারীর মনের ভাব আকার ইঙ্গিতে সকলই থাকে। যাঁহারা তাঁহার সাহায্যকারী হন তাঁহারা সেই মূল নক্সাকে প্রতিফলিত করিয়া মূল নক্সাকারীর মনের ভাব অনুসারে যেরূপ অট্টালিকা হইবে, যেখানে যেরূপ থাম, কার্ণিস, খিলেন, দরজা, জানালা ইত্যাদি হইবে সব আঁকিয়া দেন; এমনও হইতে পারে এক একজন এক এক বিষয় অঙ্কিত করেন, কিন্তু সকলকেই সেই মূল নক্সার সহিত মিলাইয়া আঁকিতে হইবে এবং সেই মূল নক্সাকারীর

মনের ভাবের সহিত এক যোগ হইতে হইবে, নতুবা সমস্ত অট্টালিকাই তৈয়ারী হওয়া অসম্ভব হইবে। এমন কি মিস্ত্রী যোগাড়ে যারা তাদেরও সেই মূল নক্সাকারীর ভাবের অনুরূপ গড়িতে হইবে, কেন না তিনি এমন অঙ্ক কসিয়া ঠিক করিয়া দিয়াছেন যে তার এক চুল এদিক ওদিক হইলে সে অট্টালিকাই ভাঙ্গিয়া যাইবে। সুতরাং মূল নক্সাকারী ও তাঁর সাহায্যকারীদের পরস্পর যে সম্বন্ধ ব্রহ্মানন্দ এবং প্রেরিতগণের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ। মণ্ডলীস্থ সাধকগণ অট্টালিকা নির্ম্মাণে তাঁদের যোগাড়ে হইতে পারেন। অতএব ব্রহ্মানন্দের সহিত স্বতন্ত্রতার সম্বন্ধ প্রেরিতগণের নহে। সকলের একাত্মা এক দেহ এক ধর্ম্ম হইয়া ব্রহ্মানন্দের জীবনাদর্শ প্রতিফলিত করাই তাঁহাদের জীবনের কার্য্য। "দৃশ্যমান আমির পশ্চাতে অদৃশ্যমান আমরা" যে আছেন তাহা দেখাইতেই তাঁহারা প্রেরিত। নববিধানের সেই আদর্শ মহা মিলন যাহা জগৎ এখনও দেখে নাই তাহা দেখাইবার নিমিত্তই তাঁহারা নববিধান প্রেরিত। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে এক এক জনের মহত্ব জগত অনেক দেখিয়া আসিয়াছেন; পাঁচ জনে একজন হওয়া জগত এখনও দেখে নাই। যদিও পুরাণে বর্ণনা আছে বটে যে নারায়ণী সেনা সকলে একই নারায়ণের রূপ, কিন্তু তাহা পৌরাণিক কল্পনা মাত্র। ব্রহ্মানন্দ-প্রেরিতদল, সেই ভাবে এক ব্রহ্মানন্দ-জীবন হইয়া তাঁহার অখণ্ড ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবেন ইহাই জগত দেখিবার জন্য প্রত্যাশান্বিত নয়নে তাঁহাদের পানে তাকাইয়া আছে এবং থাকিবে। সুতরাং তাঁহাদের পরস্পর বিচ্ছিন্নতা জগতের পক্ষে নববিধান গ্রহণের যে মহা অন্তরায় বিনীত ভাবে ইহা বলিতেই হইবে।

তাই প্রেরিত মহাশয়গণের স্বতন্ত্রভাব দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ প্রার্থনায় আক্ষেপ করিয়া বলিলেন :—

"আমার সঙ্গে সমযোগী, সমভক্ত, সমবিশ্বাসী যদি না থাকে, তাহা হইলে আমার সঙ্গে তারা কিসে আছে? যে নিকৃষ্টতম বিশ্বাসের যোগ তাও উড়ে গেছে। পেছিয়ে না গেলে ত মিলন হয় না। তাইতে ইহলোকে বুঝি এই পর্য্যন্ত। যখন কলিকাতা ছাড়া গেল তখনি ত ফাঁক। তখনই তা কেউ নিলে না, কেউ কাঁদলে না, কেউত বলিল না, যে থাকৃতে পারিনে। তখনই ত তারা নৌকা তফাৎ করিল। কে আর ইচ্ছা করে ছাড়ে আপনার লোককে। আমি কি করিব? এ ভয়ানক শতদ্রু স্রোত, পাহাড়ে নদী এখানে কি আটকান যায়? সকলকে কৃপা করে বুঝাইয়া দাও যে যে কাছে সে কাছে নয়। যদি হয় প্রেমেতে আত্মীয় কুটুম্ব সেই কাছে। শরীরের মিলন কেটে গেল। কেবা আছে সকলে ছাড়িল। প্রেমেতে বিশ্বাসে নববিধানে যে মিলন সেই মিলন। সচ্চিদানন্দের যে ভক্ত তাদের সঙ্গে এক হয়ে থাকবো।"—প্রার্থনা, 'ঈশ্বরেতে আত্মীয়তা।'

"হে ভগবান, তুমি বলিতেছ কিছু হইল না, আমিও তাহাতে সায় দিতেছি। নববিধানের অর্থ এই, খুব বিভিন্নতা প্রভেদ থাকিলেও প্রাণের ভাই বলা যায়, খুব মাতামাতি মেশামেশি হইতে পারে। আর প্রতি জনের ভিতরই জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঈশা, মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গ, বুদ্ধ সকলের ভাব দেখা যাইবে। তাহা যদি না হইল, কেহ একটু একটু ভক্তি, কেহ একটু একটু জ্ঞান, কেহ একটু একটু কর্ম্ম, কেহ একটু একটু বৈরাগ্য দেখান, তবে সে পুরাতন বিধি হইল, রথ খানা উল্টো দিকে গেল। তুমি 'হইল না,' 'হইল না' বলিয়া প্রতিবাদ করিয়া উঠিলে। তবে এ নববিধি নয়, পুরাতন বিধি।

"মা, আমি নীল লাল সাদা সব রঙ্গ লইয়া মালা গাঁথিতে চাই, কিন্তু যে রঙ্গ চাই সে সব রঙ্গই দেখিতে পাই না। কেমন করিয়া মালা

গাঁথি? মা, তুমি বলিতেছ, অলৌকিক কীর্ত্তি স্থাপন কর; সকলেই দেখিতেছি লৌকিক, কেমন করিয়া হইবে? কোটি টাকা দিয়া বাড়ী করিতে হইবে, এক পয়সাও নাই, কেমন করিয়া হইবে? চড়্‌চড়ি রাঁধিতে হইবে, আলু, পটল, শাক আর এই হইল থোড়্‌ বেগুন উচ্ছে, যে তিনটা চাই তাহার একটাও নাই, কেমন করিয়া হইবে? ইহারা বৈরাগ্যের খাওয়া খাইবে না, যোগাসনে বসিবে না, ধর্ম্ম সমন্বয় করিবে না, দায়িত্ববিহীন ফাঁকির কাজই রহিয়া গেল। এ সব লোক কেন চিহ্নিত হইল? না লোক ভাল, আমি পারিলাম না? তাই বুঝি? মাল মসলা ভাল, আমি পারলাম না, এই দুইটা ঠিক। এ মসলাতে আমি পারিব না।

"নববিধানের গঠনের সময় এঁরা অপরাগ হইলেন, ব্রাহ্মসমাজ গঠনের সময় ইহাঁরা খুব পারিতেন। এখন করিলে কি, হরি, এখন বৃদ্ধ বয়সে এত বড় ধর্ম্ম আনিলে? সে রকম লোক কৈ, সে রকম মসলা কৈ, সে তরকারি কৈ? ইহারা বলে, খুব ভাল বাসিয়াছি, আবার সে রকম করিব? পুরাতন লোকের প্রতি নবানুরাগ আবার কি? যাহা করিবার করিয়াছি, এখন আর হয় না।

"মা, আমার মনের মতন লোক চির নবীন না হইলে হইবে না। ৭০ বৎসরে যে লোহার কড়াই খাইতে পারিবে, সে রকম লোক না হইলে আমার হইবে না। পারি না যে বলে, এমন লোক আমার দলের নহে, ভাই বলে ভালবাসি, কিন্তু আমার কাজ তাহাদের দ্বারা হইবে না। যৌবনকালে ইহাঁরা করিয়াছেন, তাহাতে বাহাদুরি কি? সে সকলেই করে। বৃদ্ধ বয়সে ইহাঁরা আর পারেন না। অন্য লোকেও তাহাই করে। তবে আর নববিধান কি হইল? নববিধানের শত্রু হইলেন ইহাঁরা।

"মা, বল না, মসলার কি দোষ আছে? এ লোকদের দ্বারা কি হইবে? বলুন ইহাঁরা, আমি লোহার কড়াই খাইতে পারি, আমি ৮০ বৎসর বয়সে ১টা রাত্রি অবধি খাটীতে পারি। আমার ভক্তি বিশ্বাস টলে না, দলপতি যাহা বলেন আমি প্রাণ দিয়া তাহা করিতে পারি। মা, তাহা যদি না বলেন আমার মনের মত লোক হইল না। আমাকে উপায় করিয়াছিলে, যন্ত্রী হইয়া আমাকে যন্ত্র করিয়া দিলে, যন্ত্র ভাঙ্গিয়া গেল, যন্ত্র দ্বারা কিছুই হইল না। মা, তবে আর আমি কি করিব? ইহাঁরা দোকান ভাঙ্গিয়া দিলেন, আমি সন্ধ্যা অবধি জিনিষ লইয়া কি করিব? ইহাঁরা ব্রাহ্মসমাজের অপরাহ্ন অবধি থাকিয়া সরিয়া পড়িতেছেন।

"আমি কি করিব? পৃথিবী বলিবে, তবে তোর দোষ আছে, নতুবা পুরাতন লোকেরা তোকে ছাড়িয়া যায় কেন? তোর দলে যাব না, তুই মিস্ত্রী যেখানে তোর অধীনে কাজ করিব না।

"মা, বসিয়া হাঁসি, বসিয়া কাঁদি; লোক যাউক না, তোমার কাজ বাকি থাকিবে না, তোমার মন্দির নির্ম্মাণ হইবেই। আমি একলা মিস্ত্রী হইব, কামার হইব, ছুতার হইব, একলা সুরকি মাথায় করিয়া আনিব, তোমার মন্দির নিশ্চয়ই প্রস্তুত করিব। ৪০ হাজার বৎসর পরে হউক কিন্তু হইবেই। পরিত্রাণ ত হইবেই। তুমিও ব্যস্ত নও, আমিও ব্যস্ত নই। হইবেই হইবে। ইহারা চলিয়া গেলে কি আর হইবে না? ঐ যে আবার সাজের ঘরে লোক সাজিতেছ! ৫০ হাজার পরেও ত আসিবে।

"মা, এ গরীব লোকগুলির কি হইবে বল? পারি না, পারি না আর কেন বলে? ইহাদের ভিতর ঈশা মুষার রক্ত আছেই। মনে করিলে এখনি অলৌকিক কার্য্য করিতে পারে। তবে পারি না বলিলে আর

কি হইবে? হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধু, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন "পারি না" এই শব্দ ত্যাগ করিয়া তোমার আজ্ঞা প্রাণপণে পালন করিতে পারি।"—প্রার্থনা, 'আমার দলের লোক।'

প্রেরিত মহাশয়দিগের পরস্পরের বিচ্ছিন্নতা ও বিবাদ দেখিয়া "নববিধান" পত্রে ইংরাজীতেও ব্রহ্মানন্দ এই আক্ষেপ সূচক প্রার্থনা করেন :—

"আমি কি আমার জীবন এবং আমার কার্য্য বিফল হইল মনে করিব? বল না আমার ঈশ্বর আশা বচনে প্রবোধ দাও এখনও আশা আছে, এখনও সফলতা লাভ করিতে পারিব।

"মহান ঈশ্বর, অনেক দিন হইতে তোমার এ সেবক তোমার লোক দিগের মধ্যে প্রেম এবং ক্ষমার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই বিভিন্ন উপায়ে এবং ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রম করিয়াছে। যে ক্ষমা তুমি আমায় শিখাইয়াছ এবং আমার প্রাণে বদ্ধ মূল করিয়া দিয়াছ, আমি তাই প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং পৃথিবীতে শান্তি ও মানবগণ মধ্যে সদ্ভাবের ধর্ম্মই আমি চারিদিকে ঘোষণা করিয়াছি।

"আমি কার্য্যতঃ ক্রোধী, পরশ্রীকাতর, অপ্রেমিক, বিবাদ-পরতন্ত্র, অশান্ত, প্রতিশোধ-ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে শান্তির পথে আনিতেই পরিশ্রম করিয়াছি। তোমারই বলে তোমারই আদেশে আলোড়িত জলে তৈল নিক্ষেপ করিতে এবং অসম্মিলনে মিলন আনয়ন করিতেই ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াছি।

"আমার চতুর্দ্দিকস্থ ব্যক্তিদিগের বিবাদ বিসম্বাদ আমার অন্তরে তীক্ষ্ণবাণ বিদ্ধ করিতেছে এবং আমার প্রাণকে রক্তাক্ত করিতেছে। কবে আমার বন্ধুগণ ভাল বাসিতে শিখিবে। হে ঈশ্বর, কবে সিংহ এবং মৃগ একত্রে জলপান করিবে।

"হে প্রেমের ঈশ্বর ইহাদের অহঙ্কৃত হৃদয়কে চূর্ণ এবং বিনম্র কর। পিতা এই যুগের লোকদিগকে প্রেম, দয়া এবং ক্ষমা শিক্ষা দাও। এবং এমন আশীর্ব্বাদ কর যেন অনতিবিলম্বে এমন এক ক্ষমাশীল-আত্মার সুধীদল দেখিতে পাই যাহাদের মধ্যে অহং এবং ক্রোধ অসম্ভব হইয়াছে।"

প্রেরিত মহাশয়গণ মিলিত হইয়া নববিধানের মহা ভ্রাতৃত্ব প্রদর্শন করিতে পারিলেন না বলিয়াই ব্রহ্মানন্দ এই সমুদয় কাতর উক্তি করিলেন এবং একাধারে আপনিই সব হইতে চাহিলেন এবং বলিলেন "আমি একলা মিস্ত্রী হইব, কামার হইব, ছুতার হইব, একলা সুরকি মাথায় করিয়া আনিব," তদ্দ্বারা আপনাতেই সর্ব্ব ভ্রাতৃমিলন ভার গ্রহণ করিলেন। সুতরাং তাঁকে গ্রহণ করিলেই যে সকলকে গ্রহণ করা হইবে ও তাঁকে গ্রহণ করিতে হইলে সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে ইহাই প্রকাশ করিলেন। আমরা যেন তাহাই করি।

যাহাতে ব্রহ্মানন্দের সহিত প্রেরিতগণ ও মণ্ডলীর ইহ পরকালের চির মিলন হয় তজ্জন্য ব্রহ্মানন্দ এই প্রার্থনা করিলেন :—

"জন্মাইবার পূর্ব্বে আমরা ছিলাম স্বধামে মাতৃক্রোড়ে, জন্মিলাম যখন তখন সংসার কার্য্যালয়ে আসিলাম কার্য্য করিবার জন্য। আবার সন্ধ্যার সময় কার্য্য শেষ হইলে বাড়ী ফিরে যাব। যারা এক প্রভুর নিকট কার্য্য করে, একত্র চাকুরি করে, পরস্পরকে চিনে, পরস্পরের সঙ্গে আত্মীয়তা হয়, বাড়ী ফিরে যাবার সময় অগ্র প [illegible] গেলেও তারা জানে যে স্বধামে স্বগ্রামে গিয়া আবার পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। তদ্রূপ তোমার নববিধান।

"কিন্তু আমরা এক গ্রামে ফিরিয়া যাইব কি না তা বুঝিব কিরূপে? আমাদের রুচি, ইচ্ছা, মত, প্রকৃতি ভিন্ন। কেহ বৃদ্ধের ন্যায় জড় হইয়া

থাকিতে চাহেন, কেহ সিংহের ন্যায় উৎসাহ আস্ফালন করেন, কেহ পুস্তকের কীট হইয়া আছেন, পরমেশ্বর ইহাদের গতি কি এক দিকে? যাহাদের অভিরুচি এত ভিন্ন তাহাদের আগমনও এক স্থান হইতে নয়, গতিও এক দিকে হইতে পারে না। আমাদের এখন যদি মরণ হয়, এক এক জন এক এক স্থানে গিয়া পড়িব। নতুবা ইহাঁরা নববিধাননিশান স্পর্শ করিয়া বলুন, আমরা এক গ্রামের লোক, এক পরিবারের অভিন্ন-হৃদয় লোক। তার সাক্ষী আমরা এক বাগানে ফুল তুলিয়াছি, এক স্থানে কার্য্য করিয়াছি, আমাদের এক রুচি, এক মত, এক ইচ্ছা।

"মা, এ বড় সুখের কথা যে আমরা ছিলাম এক মাতৃবক্ষে, আবার নববিধানে এক স্থানে গিয়া মিলিব। নতুবা এই শেষ, এখানেই দেখা শুনা ফুরাইবে। রাস্তার আলাপমাত্র, পরে সকলেই ভিন্ন স্থানে চলিয়া যাইব। আমরা এক উপাসনার ঘরে বসি, আর এক বাড়ীতে থাকি আর এক দলভুক্ত হই, সকলি মিথ্যা যদি সন্ধ্যার সময় এক ঘাটে গিয়া না মিলি, এক গ্রামে না যাই।

"অতএব এই প্রার্থনা করি মা, যাঁরা যাঁরা আমরা সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্তভাবে এক স্থানে ছিলাম, যেন পরস্পরকে চিনিতে পারি এবং বিশেষ সাধনে এক হই। হরি, তোমার চরণ ধরিয়া মিনতি করি, যদি কেউ থাকেন এই দলের ভিতর আত্মীয় অন্তরঙ্গ তাঁহাদের দেখাও, পরিচিত কর তাঁদের সঙ্গে। ইহকাল পরকালের জন্য তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক কর। "আমরা যে কটি এক স্থান হইতে আসিয়াছি, একত্র থাকিব পরকালে; অভিরুচি, বিশ্বাস, মত এক করিয়া একটী বিশেষ দলে বদ্ধ হইয়া ইহকাল পরকালের কাজ এখানে সম্পন্ন করিয়া লই।"—প্রার্থনা, 'ইহপরকালের দলের একতা।'

এক্ষণে, শ্রীব্রহ্মানন্দ ও প্রেরিতগণের মধ্যে পরস্পর প্রকৃত সম্বন্ধ কি যেমন স্থির হইল। প্রেরিত প্রচারক বা আচার্য্য উপাচার্য্যগণের সহিতও মণ্ডলীর উপাসক সাধক গণের কিরূপ সম্বন্ধ তাহাও স্থির হওয়া উচিত। তাহা না হইলে মণ্ডলীর মধ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মানন্দ নিজেই "নববিধান পত্রে" যাহা লিখিয়াছেন তাহাই অনুবাদ করিয়া দিতেছি ঃ—

"ধর্ম্মমণ্ডলী আচার্য্যদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে উপাসকদিগের আধ্যাত্মিক পরিচালক করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের লোকদিগের মেষপালক স্বরূপ এবং বিশেষ সম্মান ও যত্নের সহিত তাঁহাদিগের প্রতি ব্যবহার করিতে হইবে। আচার্য্য তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের আত্মার জন্য দায়ী, উপাসকগণ তাঁহাদের আচার্য্যের জীবনের জন্য দায়ী। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে প্রভু পরমেশ্বরের দ্বারায় এক গুরুতর সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই জন্য সমগ্র মণ্ডলীর মঙ্গলের নিমিত্ত ইহাঁরা যেন উভয়ে উভয়ের প্রতি কর্ত্তব্য এবং দায়ীত্ব বুঝিয়া লন। মেষপালক মেষপালের উপযুক্ত হউন, মেষপালও মেষপালকের উপযুক্ত হউন। তাহা হইলেই ঈশ্বরের নগরে শান্তি এবং পুণ্য অধিবাস করিবে।

"মণ্ডলীর উপাসকগণ আন্তরিক আত্মীয়তার সহিত তাঁহাদের আচার্য্যকে ভালবাসিবেন এবং তাঁহার প্রতি আত্মীয়তা প্রদর্শন করিবেন। তিনি একাধারে তাঁহাদের পিতামাতা, ভাই বন্ধু, পুত্র এবং সেবক ; সুতরাং এই সমুদয় সম্বন্ধীয়ের প্রতি যে যে ভাব দেখান সমুচিত সেই সমুদয় ভাবে তাঁহাকে আদর করিতে হইবে। যে ব্যক্তি আত্মার পরিচালককে কেবল একজন জ্যেষ্ঠ, পুরোহিত বা পাদ্রীমাত্র মনে করে এবং কোন ঘনিষ্ঠ

সম্বন্ধ রাখে না সে ব্যক্তি তাঁহাকে যথার্থ ভালবাসে না কিংবা সম্মানও করে না।

"আবার আচার্য্যের প্রতি সেবা করিতে গিয়া শারীরিক সুখ সম্পদ দিয়া যেন আমরা তাঁহাকে বোঝাই না করি। তাঁহাদের দীনতা এবং আত্ম-ত্যাগ ব্রতের সম্মান রক্ষা করিতে হইবে। পৃথিবীর বড় লোকদিগের অপেক্ষা তাঁহাদের জীবিকা সামান্য রকমের হইবে। গুরু যিনি তিনি বৈরাগী এবং ফকীর, অথচ রাজা এবং সম্রাট অপেক্ষা বড়।

"আচার্য্য ও তাঁর পরিবারের সম্পূর্ণ ভরণপোষণের ভার উপাসক-গণ লইবেন এবং তাঁহাকে সে বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত থাকিতে দিবেন। তাঁর সময় এবং শক্তি সম্পূর্ণরূপে মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান কল্পে নিয়োজিত হইবে এবং তাঁহাকে যেন অন্নবস্ত্রের জন্য ভাবিতে না হয়। যদি মণ্ডলীস্থ উপাসকগণ স্বার্থপরতা বা অনবধানতা বশতঃ আচার্য্যের শারিরীক অভাব মোচনে সক্ষম না হন এবং তাঁহাকে পার্থিব বিষয় চিন্তায় নিমগ্ন করেন তাঁহারা তাঁহার নেতৃত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতক হন।

"মণ্ডলীস্থ উপাসকগণ আচার্য্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কোনরূপ বাহ্যাড়ম্বর বা ভাণ করিবেন না। তাঁহারা যাহা করিবেন যতদূর পারেন খুব গোপনে করিতে চেষ্টা করিবেন। এবং সমুদয় বন্দোবস্ত যেন কলের মত চলিয়া যায়, বারবার বলিয়া কহিয়া যেন কিছু করাইতে না হয়।

"যথার্থ সেবা অন্তরে, হাতে বা মুখে নয়। যিনি তাঁর ধর্ম্ম-বন্ধু বা উপকারীর প্রকৃত সেবা করিতে চান তিনি যেন অন্তরের সহিত করেন, বাহিরে হাতে নয়। পূর্ণ সহানুভূতি, অক্লান্ত ভাবনা, সর্ব্বক্ষণিক

সতর্ক যত্ন, বিচ্ছেদে অন্তরভেদী দুঃখ, সঙ্গ পাইবার জন্য আন্তরিক আকাঙ্খা ইহাই যথার্থ ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার প্রকৃত লক্ষণ।"

ভগবান করুন যেন আমাদের প্রেরিত প্রচারক ও আচার্য্যগণের সহিত মণ্ডলীর উপাসক সাধকদিগের এইরূপ সম্বন্ধই স্থাপন হয়। এখানেও সেই এক দেহের মস্তক এবং হস্ত পদ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল যেমন নিজ নিজ কাজ করিলেই দেহ রক্ষা হয়, কিন্তু "উদর ও অন্যান্য অবয়বের বিবাদের" ন্যায় বিবাদ করিলে সকলেই মৃত হয় ইহাও সেইরূপ। সুতরাং এই সমগ্র মণ্ডলীস্থ নেতা ও অনুবর্ত্তীগণ আমরা সকলেই নিজ নিজ দায়ীত্ব ও কর্ত্তব্য পালন দ্বারায় ব্রহ্মানন্দের ঠিক মনের মত এবং তাঁহার ও নববিধানের যেন উপযুক্ত হই ব্রহ্মানন্দ-জননী ইহাই করুন।

স্বাধীন-অধীনতা।

এই খানেই বলা আবশ্যক কেহ কেহ যে অভিযোগ করেন নববিধান প্রেরিতগণ এবং এই মণ্ডলীস্থ নববিধান বিশ্বাসীগণ আপনাদের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে বিক্রয় করিয়া অন্ধভাবে ব্রহ্মানন্দের অনুগমন করিতেন বা করিয়া থাকেন ইহা সম্পূর্ণই মিথ্যা। বরং যদি তাহা করিতেন তাহা হইলে এ দলের এত বিচ্ছিন্নতা ও স্ব স্ব প্রাধান্য, যাহা প্রায় ক্রমে স্বেচ্ছাচারিতায় গিয়া পরিণত হইতেছে তাহা হইত না। প্রকৃত প্রস্তাবে এই মণ্ডলীর প্রত্যেকেরই মূল মন্ত্র স্বাধীনতা। সজ্ঞানে সচৈতন্যে স্বাধীনভাবে ধর্ম্ম সাধনই নববিধানের আদি শিক্ষা। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মানন্দ নিজ "জীবনবেদেই" বলিয়াছেন :—

"মায়া দ্বারা যদি সকলকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতাম, দাসদলভুক্ত করিবার যদি আশা থাকিত, আমার দল লোকে পূর্ণ হইত।

"স্বাধীনতাকে দলপতি করিলাম। এই জন্য আমার সঙ্গে যাঁহারা অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকে আমি বন্ধু বলি, আমাকে তাঁহাদের গুরু বলি না। স্বাধীনতারই জয় হইবে। এই জন্যই বলি, সত্যের জয়, সত্যের জয়, সত্যের জয়। স্বাধীনতা মানুষকে ডাকিবে। ইহাতে লোক আসে আসুক; গুরুগিরি কখনও করিব না। অধীন হওয়াকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। আমাতে যাহা ঘৃণা করি, অন্যেতে তাহা ঘৃণা করি না? দলের সামান্য কাহাকেও আমি অধীন দেখিতে পারি না।

"কেহ যে অন্যের অধীন হইবে, তাহা দেখিতে পারি না; আমার অধীন যদি কেহ হয় তাহাও আমার অত্যন্ত অসহ্য। অন্য এক জন মানুষ আমার অধীন হইবে? পিতার নিকট আমি কি উত্তর দিব? আমার মত আর এক জনের ঘাড়ে আমি চাপাইব? আমার শাসনে অপরকে শাসিত করিব? মায়ার মোহিনী মূর্ত্তি দেখাইয়া দলে আনিবার চেষ্টা করিব? ইহাতে নরক আমাকে হাঁ করিয়া গিলিবে; স্বর্গও লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিবে। আমার যদি দল না হয়, একজনও যদি কাছে না থাকে, নিজে যখন দাস নই তখন অপরকেও দাস করিব না। যে আপনাকে কখনও কাহারও দাস করে নাই সে যদি অপরকে দাস করিবার চেষ্টা করে অথবা দাস দেখিয়া হাস্য করে, তার মত পাপী কপট আর কে আছে?

"আমার দলে যদি পঞ্চাশ জন লোক থাকেন, তবে পঞ্চাশ প্রকার। সত্য সাক্ষী, চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী, অধীনতা এখানে নাই। একশত জন লোক যদি এখানে আসিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা স্ব স্ব প্রধান। প্রত্যেককেই

আমার সম্বন্ধে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে; আমি চলিয়া গেলেও এ কথা প্রত্যেকে স্বীকার করিবেন। দলের কেহই অধীনতায় জীবিত নহেন, কিন্তু স্বাধীনতায়। আমি কাহাকেও যাঁতায় পেষণ করিতে মানস করি না; প্রত্যেককে স্বাধীন দেখিতে চাই।

"কাহাকেও গুরু অথবা শাসনকর্ত্তা বলিতে বলি না; ঈশ্বরকেই কেবল গুরু ও শাসনকর্ত্তা বলিয়া জানি। অধীনতাপ্রিয় কেহ যদি ঠক্ হইয়া এখানে ঢুকিয়া থাকেন, সে ঠক্‌কে বাহির করিয়া দিব; দিবই দিব। অধীনের দল এখানে নয়।

"স্বাধীনতা মহামন্ত্র। এত দূর যদি স্বাধীনতা হয়, এ যে স্বেচ্ছাচারের কাছে গেল। স্বাধীনতা পূর্ণ হইবে, স্বেচ্ছাচার হইবে না।"

প্রশ্নকারীর উত্তরেও ব্রহ্মানন্দ "মিরার পত্রে" বলেন ঃ—"দলপতি ধর্ম্মতঃ প্রচারকদিগের স্বাধীনতার উৎসাহ দেন এবং তাঁহারা যথার্থ পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যের জন্য কোন ব্যক্তি বা কোন দলের নিকট হিসাব দিহী নহেন। তাঁহারা যে কোন কার্য্য লইতেও পারেন ত্যাগও করিতে পারেন, তাঁহারা নিজ ইচ্ছামত ঘরেও আলস্য করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন কিংবা কোন স্থানে প্রচারে যাইতে পারেন। তাঁহারা কোন বাধ্যবাধকতা বা সমালোচনা না মানিয়া যে কোন পুস্তক সমালোচনা বা প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। তাঁহারা সাধারণের সাহায্যেও জীবন যাপন করিতে পারেন কিংবা অন্য উপায়েও অতিরিক্ত সাহায্য লইতে পারেন। কেহই তাঁহাদের কার্য্য বা ব্যবহারের উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। যদি তাঁহারা কোন কার্য্যবিভাগের ভার লন, তাঁহাদিগকে পূর্ণ ক্ষমতা ও অধিকার দেওয়া হয় এবং যদি কেহ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে যায় তখনই তিনি তাহা ত্যাগ করিবেন প্রত্যেকেরই

নিজ নিজ আচার ব্যবহার রুচি এবং কাজ করিবার ভাব ও প্রণালী আছে, যাহা প্রত্যেকেই রক্ষা করিতে ব্যস্ত। ক্রীতদাসের ন্যায় আনুগত্য মানে মৃত সমভাবপন্নতা এবং নীচ অনুসরণ প্রবণতা যাহা আমাদের প্রচারকদিগের মধ্যে আদৌ নাই। সকলেই জানেন যদি আচার্য্যের কোন দুর্ব্বলতা থাকে সে এই যে তিনি অত্যন্তই সহিষ্ণু এবং ক্ষমাশীল, কখনও কাহারও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না এবং অল্পই শাসন করেন।"

সমগ্র ব্রাহ্মমণ্ডলীরই মূল মন্ত্র এই স্বাধীনতা, স্বাধীনভাবে সজ্ঞানে সচৈতন্যে একমাত্র জগৎগুরু ঈশ্বরের পরিচালনায় চলিতে হইবে, ইহাই ব্রহ্মানন্দের শিক্ষা এবং ইহাই নববিধানে পরিত্রাণ লাভের পথ। কিন্তু ইহার সহিত প্রেম ও দীনতা এবং আনুগত্যেরও সাধন আবশ্যক। তাহা না হইলে নিশ্চয়ই স্বেচ্ছাচারিতা আসিবে। তাই ব্রহ্মানন্দ বলিলেন:—

"স্বাধীনতাই আমার চিরকালের আদরণীয়, কিন্তু ভক্তিবিহীন স্বাধীনতা আদরণীয় ছিল না। পৃথিবীর বাজারে অহঙ্কারমূলক স্বেচ্ছাচার আমি টাকা দিয়া ক্রয় করি নাই। বড় হইবার জন্য, উচ্চপদ লাভের জন্য স্বাধীনতা কিনি নাই, সে প্রকার স্বাধীনতা নরকের স্বেচ্ছাচার; আমি তাহাকে স্বাধীনতা বলি না।"

স্বাধীনতা ও দীনতা এই দুইএর সামঞ্জস্যই নববিধানের শিক্ষা। শ্রীচৈতন্যের মণ্ডলী যেমন কেবল দীনতা সাধন করিয়া নীতিহীন হইয়া পড়িলেন তেমনি ব্রাহ্মসমাজও কেবল স্বাধীনতা সাধন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িতেছেন। এইজন্য ব্রহ্মানন্দ দুঃখ করিয়া প্রার্থনায় বলিলেন:—

"হে ঈশ্বর স্বাধীনতা এবং প্রেম এই দুই বীজ রোপণ করা হয়েছে। স্বাধীনতার [illegible]

আমরা পরের কথা শুনিবার জন্য জন্মগ্রহণ করি নাই। আমরা স্বাধীনতা-পরতন্ত্র; সেই স্বাধীনতার মতে সকলে চলিল। কিন্তু পিতঃ, স্বাধীনতার পাশে আর একটা বীজ পোঁতা হইয়াছিল, তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, কিন্তু বাড়িল না। প্রেমের বীজ তত সেবা পাইল না, আস্তে আস্তে উঠিল, একটু শীর্ণ, একটু জীর্ণ, তত জোরে মাথা তুলিতে পারিল না। মা, তোমার প্রেম ও স্বাধীনতা মিলিতেছেনা। অতএব তোমার কাছে এই ভিক্ষা যেন পরস্পরের প্রেম বন্ধনের যোগ থাকে, যেন আমরা পরস্পরের সহিত প্রেমে সম্বদ্ধ হইয়া তোমার প্রেমের রাজ্য স্বাধীনতার রাজ্য বিস্তার করিতে পারি।"—প্রার্থনা, 'সপ্রেম স্বাধীনতা।'

বাস্তবিক স্বাধীনতা মানে স্ব-অধীনতা। আমাদের প্রকৃত "স্ব" তিনি যিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ প্রাণের স্বামী, সুতরাং তাঁর অধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। আমাদের নীচ "আমি," আমার অহং,; এই অহংএর অধীনতা, স্বাধীনতা নহে, তাহা স্বেচ্ছাচার। ব্রহ্মানন্দ তাই বলিলেন "অহঙ্কার মূলক স্বেচ্ছাচার আমি টাকা দিয়া ক্রয় করি নাই।" কিন্তু প্রকৃত "স্বাধীনতাই আমার আদরণীয়।" এই জন্য এই আমিত্ব-হীনতা বা অহঙ্কার-বিহীন প্রেম-সংযুক্ত স্বাধীনতাই তিনি শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার দলে তাহাই প্রতিষ্ঠিত হয় এই তাঁহার প্রার্থনা ও চেষ্টা। এই নিমিত্ত তিনি প্রার্থনা করিলেন "একেবারে নিজের আমিত্বকে শ্মশানে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে, একটী দল তৈয়ার কর, যাহাদের প্রত্যেকের "আমি" তুমি হবে, দেখে পৃথিবীর আশা হবে।"—প্রার্থনা 'একত্ব।'

ব্রহ্মানন্দ এই ভাবেই যাহাদের "আমি" "তুমি" হইয়াছে, অর্থাৎ সেই প্রাণেরপ্রাণ প্রাণ-স্বামী যাহাদের "আমি," তাঁহাদের লইয়াই দল গড়িতে চাহিয়াছেন এবং বলিয়াছেন "একটা দল সিদ্ধ গোঁসাই হরি

প্রেমে মত্ত। আহা কি সুন্দর দৃশ্য! এমন একটা দল যদি পাই খুব মাথায় করে নিয়ে নাচি। এই সাধ মা এই সাধটা খালি বাকী রয়েছে।"—প্রার্থনা 'সিদ্ধি।'

যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানের দল এইরূপ এক স্বাধীন-অধীন দল যাহাতে হয় তাই বলিয়াছেন "পরস্পরের চাকরের মত হইয়া পড়িয়া থাকিব, ইহাই বিধানের অভিপ্রায়।" তিনি নিজেও এই স্বাধীন অধীনতা কিরূপে সাধন করিয়া দেখাইয়াছেন নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করিলে বুঝা যাইবে। একবার ব্রহ্মানন্দ প্রচারকমহাশয়দিগের মধ্য হইতে "শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বরণপূর্ব্বক বলিলেন, আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতির উপহার স্বরূপ এই বস্ত্রাদি আপনি গ্রহণ করুন।

বিজয়। গ্রহণ করিলাম।

কেশব। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

বিজয়। প্রসন্ন হইলাম।

কেশব। আপনি ঈশ্বরভক্ত, আপনি বড়, আমি ক্ষুদ্র, আমি আপনাকে প্রণাম করি। আপনাকে দিলে ঈশ্বর স্বয়ং তাহা হস্তে লন, আপনাকে আক্রমণ করিলে তাঁহার প্রতি আঘাত করা হয়, আপনার অভ্যন্তরে তিনি অবস্থান করিতেছেন, আমি সেই ভক্তবিহারীকে প্রণাম করি।"

"অনন্তর উপস্থিত উপাসকগণমধ্যে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্তকে দণ্ডায়মান হইতে বলিয়া কেশবচন্দ্র তাঁহাকে বিনীত মস্তকে জানু পাতিয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহাকে বস্ত্র ও পাদুকা উপহার দিলেন।"

একবার যদিও দৃষ্টান্তের জন্য ব্রতস্বরূপ ইহা করিয়াছিলেন, তিনি যখনই যাঁহাকে যে বিষয়ের প্রধান কার্য্য ভার দিতেন তখনই তাঁহার অধীন হইয়া

আপনি কার্য্য করিতেন। যেমন, তাঁহার কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেনকে তিনি "মিরারের" সম্পাদকীয় ভার দিয়া আপনি তাঁহার সহকারী সম্পাদক হইয়াছিলেন। নগর সংকীর্ত্তনে সঙ্গীত প্রচারকের অধীন ভাবে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতেন। নববৃন্দাবন নাটক করিবার সময় যাঁহাকে আরম্ভসূচক ঘণ্টা বাজাইবার ভার দেন, তিনি যতক্ষণ না ঘণ্টা বাজাইতেন, ততক্ষণ অভিনয় আরম্ভ হইতে দিতেন না। একদিন সময় হইয়া গেল, দর্শকগণ উপস্থিত ও অভিনেতাগণও সকলেই প্রস্তুত। কিন্তু ঘণ্টা বাজাইবার যাঁর হাতে ভার ছিল তাঁর আসিতে একটু বিলম্ব হয়, কোন প্রচারক মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন, "অভিনয় আরম্ভ হউক না," ব্রহ্মানন্দ বলিলেন "ঘণ্টা বাজাইবে কে? তিনি না বাজাইলে হইবে না।" এইরূপ স্বাধীনতা সংযুক্ত অধীনতাই ব্রহ্মানন্দ শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি অন্ধ-অধীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতা উভয়েরই প্রশ্রয় দেন নাই।

প্রেরিতদল সম্বন্ধে সাক্ষ্য।

শ্রীব্রহ্মানন্দের এই প্রেরিতদল তাঁহার দেহে অবস্থান কালে কিরূপ প্রেমযোগে ব্রহ্মানন্দ সনে মিলিত ছিলেন, তাহার বিবরণ জানিতে সকলেরই ঔৎসুক্য হইতে পারে। এই জন্য কোন প্রেরিত মহাশয়ের নিজ লেখনী প্রসূত সাক্ষ্যদান হইতে আমরা কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কেশব দলপতি এবং নেতা হইয়া জন্মিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে নেতৃত্ব এরূপে কেহ আর করিতে পারে নাই। ১৭৮৩ সালে বিষয়কর্ম্ম

ছাড়িয়া তিনি প্রচারব্রত গ্রহণ করেন। তাঁহার সাধু দৃষ্টান্তে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ৬৩ সালে তাহাতে যোগ দিলেন। তদনন্তর ৬৪ সালে অমৃতলাল বসু, ৬৫ হইতে উমানাথ গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অঘোর নাথ গুপ্ত। তাহার পর ক্রমে যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, গৌরগোবিন্দ রায়, ত্রৈলক্যনাথ সান্ন্যাল, কান্তিচন্দ্র মিত্র, দীননাথ মজুমদার, প্রসন্নকুমার সেন, প্যারীমোহন চৌধুরী, রামচন্দ্র সিংহ, কেদারনাথ দে, কালীশঙ্কর কবিরাজ। ইহার মধ্যে অন্নদা, যদুনাথ, বিজয়কৃষ্ণ ব্যতীত অবশিষ্ট চতুর্দ্দশ জন তাঁহার সঙ্গে শেষ দিন পর্য্যন্ত ছিলেন।" শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ও তাঁর কতিপয় অনুচর সহ এই দলভুক্ত। তবে তিনি পূর্ব্ব বঙ্গে কার্য্যক্ষেত্র করিয়া আছেন বলিয়া বোধ হয় তাঁহার নাম উপরে উল্লিখিত হয় নাই।

"এত গুলি ভদ্রসন্তান এই কলিযুগে বিষয়কার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া ভগবানের চরণ সেবার্থ জীবন উৎসর্গ করিলেন ইহা সামান্য ঘটনা নহে। কেহ কাহার নিকট পরিচিত ছিলেন না, ভিন্ন জাতি, ভিন্ন অবস্থা; বিধাতা তাঁহাদিগকে ডাকিয়া এক পরিবারে আবদ্ধ করিলেন। অন্যূন বিশ বৎসর কাল এই দলের উপর কেশব কর্তৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্ম নীতির উচ্চ আদর্শ এই দলের মধ্যে যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় তজ্জন্য তিনি যথোচিত চেষ্টা করিয়াছেন। কতকগুলি ভক্ত প্রস্তুত তাঁহার বিশেষ কাজ ছিল। এক প্রত্যাদেশের স্রোত সকলের মধ্যে বহিবে, স্বাভাবিক বিচিত্রতা প্রেমেতে সমান হইয়া যাইবে, এই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাহার জন্য এক স্থানে বাস, এক অন্ন ভোজন, এক নিয়মে অবস্থিতির ব্যবস্থা করেন। প্রচারকদলের বহির্ভাগে আর এক দল সাধক ব্রাহ্ম দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহারা সমাজের বৈষয়িক এবং

আধ্যাত্মিক কার্য্যের সহায়। এই দুইটি দলের জীবন কেশবচরিত্রের ছাঁচে এক প্রকার গঠিত হইয়াছে। তিনি যে সকল নূতন নূতন সত্য এবং ভাবরস প্রচার করিতেন তাহা ইহাঁদের অন্তরে প্রতিবিম্বিত হইত। সেই প্রতিবিম্বচ্ছটা আবার কেশবহৃদয়ে পুনঃ প্রতিফলিত হইত। এই দলটী তাঁহার কৃষিক্ষেত্র বিশেষ।

"এই দলের ভাব ভঙ্গী, আহার পরিচ্ছদ, রচনা এবং বক্তৃতা উপাসনা ভজন সাধন এক নূতন প্রকারের। তাঁহাদিগকে দেখিলেই চেনা যায় ইহারা কেশব সেনের লোক। উত্তরপাড়ায় সংকীর্ত্তন হইতেছে, পরমহংস দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া বুঝিতে পারিলেন, "এ কেশবসেনের দল, ইহা ভাড়াটে লোকের গান নয়।" অন্যান্য ধর্ম্ম প্রচারকেরা কোন কোন বিষয়ে লোকের মনে সাময়িক সদ্ভাব উদ্দীপন করিতে পারেন, কিন্তু চরিত্র গড়িয়া তাহাতে ছাপ মারিয়া দিতে সকলে সক্ষম হন না।

"কেশববিশ্ববিদ্যালয়ে বিধিবদ্ধ প্রণালী অনুসারে ধর্ম্মশিক্ষা হইত। শিক্ষার্থীগণ তাহা শিখিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতেন। এখানকার ধর্ম্মমত এবং সাধনতত্ত্ব ঈশ্বরের নামাঙ্কিত। ঈশ্বরের হাতের স্বাক্ষর আছে কি না তাহা দেখিয়া লইতে বলিতেন।

"কেশবচন্দ্রের গঠিত দলের ইতিহাস অতি মনোহর। তিনি ইহাঁদের সঙ্গে কিরূপে দিন কাটাইতেন তাহা অনেকে অবগত নহেন। দলস্থ ব্যক্তিগণ এক এক কার্য্যে বিশেষ সুদক্ষ। নববিধানের পক্ষে যাহা প্রয়োজন তাহার উপযোগী গুণ ইহাঁদের মধ্যে দৃষ্ট হইয়াছে, কেহ মুসলমানধর্ম্মশাস্ত্রে পারদর্শী মৌলবী, কেহ সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, কেহ খ্রীষ্টিয়ানধর্ম্ম, এবং ইংরাজী বিদ্যায় অভিজ্ঞ, কেহ পরিশ্রমে পটু, কেহ যোগী, কেহ ভক্ত, কেহ গায়ক, কেহ বাদক, কেহ উপদেশলেখক, কেহ

বা সেবক। এইরূপ লোকের মত... কেশবচন্দ্র নিয়ত ব্যবহার করিতেন। তিনি স্বয়ং যেরূপ স্বর্গবিদ্যালয়ে সাধু মহাজনদিগের নিকটে বিবিধ বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন আকারে ঐ সকল বিদ্যা বিস্তার করিতেন। দল ভিন্ন এক দিন তাঁহার চলিত না। প্রতিদিন উপাসনায় সঙ্গী কেহ না থাকিলে অভাব বোধ হইত। এই দলই তাঁহার মিশ্রিত মহত্ত্ব এবং গূঢ়ভাব বিকাশের উপলক্ষ।

"দলের মধ্যে কতকগুলি তাঁহার ধর্ম্মমত বিস্তার করিতেন, আর কয়েক জন তাঁহার এবং প্রচারকপরিবারের সেবায় ও প্রচারকার্য্যালয়ে থাকিতেন। আত্মীয় ভাই ভগিনী অপেক্ষা অধিকতর স্নেহে ইহারা পর পরের সঙ্গে প্রথমে একত্রিত হন। মহাত্মা কেশব সকলের সহিত একসঙ্গে বসিয়া দুই তিন বার এই দলের ছবি তোলেন। সে ছবি এখন বর্ত্তমান আছে। আজ্ঞাবহ দাসের ন্যায় সহচর ভক্তবৃন্দ তাঁহার অনুগমন করিতেন। কিন্তু যতই তাঁহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেন, ততই তিনি আদর্শ বাড়াইয়া দিতেন। এই জন্য প্রাণপণে খাটিয়া কেহ বিশ্রাম লাভ করিতে পারিতেন না।

"আচার্য্যের প্রাতে উঠিতে প্রায় আটটা বাজিত। কারণ, রাত্রি একটা দুইটার পূর্ব্বে নিদ্রা আসিত না। প্রাতে উঠিয়া স্নানান্তে দলস্থ বন্ধুগণের সঙ্গে তিনি প্রাত্যহিক উপাসনা করিতেন। উপাসনান্তে আহারাদির পর লেখা পড়া, লোকদিগের সহিত আলাপ করা, কিংবা কোন সভায় যাওয়া, ইহাতেই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইত। রজনীতে কখন সবান্ধবে সাধন ভজন, প্রকাশ্য উপাসনাকার্য্য সম্পাদন, কখন অন্যবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। অপর বন্ধুরা আপনাপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া রাত্রি দশটার সময় কেশবচন্দ্রের দরবারে একত্রিত হইতেন। সে দরবারে না উঠিত

এমন বিষয় ছিল না। রাজনীতি, সাধনতত্ত্ব, সমাজসংস্কার, চরিত্রশোধন, পরনিন্দা সকল বিষয়েরই আলোচনা হইত। কখন কীর্ত্তন, কখন আমোদজনক গল্প, হাস্য কোলাহল ; কখন তর্ক বিতর্ক, নানা বিষয়ের অভিনব দৃষ্ট হইত। এক দিন এ দল কি সুখের আলয়ই ছিল। পার্থিব কোন সম্বন্ধ নাই, অথচ যেন সকলে সহোদর ভাই অপেক্ষাও আত্মীয়। তাঁহাদের প্রতি কেশবের স্নেহ প্রীতি মাতৃস্নেহ অপেক্ষাও মধুর। তাঁহার মুখ কিংবা হস্ত প্রায় প্রেম প্রকাশ করিত না বটে, কিন্তু চক্ষের দৃষ্টি, কথার সুরে প্রেম উৎসারিত হইত। কত ভালবাসেন তাহা জানিতেও দিতেন না। বাহিরে যদি এক গুণ দেখাইতেন, ভিতরে দশগুণ চাপিয়া রাখিতেন। সুতরাং সে প্রেম বড় ঘনতর এবং সুমিষ্ট ছিল। সেই স্বর্গীয় প্রেম দ্বারা কয়টা লোককে তিনি একবারে দাস করিয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রচারক পরিবারগণের দারিদ্র্য কষ্ট সমধিক ছিল। স্ত্রীলোকেরা সে জন্য যথেষ্ট কষ্ট অনুভব করিতেন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেনা পাওয়ার সম্বন্ধ ছিল না। অথচ তাঁহার মুখের দুইটি কথায় তাঁহাদের হৃদয়ভার দূর হইয়া যাইত। এমনি তাঁহার কোমল হৃদয়, দুঃখী দুঃখিনীরা সেখানে গিয়া প্রাণ জুড়াইত। কি এক মিষ্ট আকর্ষণ ছিল, সে কথা আর বলিয়া উঠা যায় না।"

এ সম্বন্ধে আমরাও কোন প্রচারক পত্নীর মুখে শুনিয়াছি, একবার নাকি আহারীয় কিছু বাড়ীতে না থাকায় কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি কেশব চন্দ্রের নিকট অভিযোগ করিতে আসেন, তখন ব্রহ্মানন্দ দুধ খাইতে উদ্যত হইতেছিলেন। প্রচারক পত্নীকে কাঁদিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই দুধ ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে পান করিতে দিলেন। তাঁর অনুবর্ত্তিগণের প্রত্যেকেই মনে করেন ব্রহ্মানন্দ তাঁকেই সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিতেন।

"এক একবার বন্ধুদিগকে লইয়া তিনি যেন ভেল্কীবাজী করিতেন। এই দলটি অগ্নির সন্তান। সর্ব্বদা অগ্নিময় উৎসাহ উত্তেজনার মধ্যে সকলের জীবন অতিবাহিত হইয়া আসিয়াছে। হয় লোকনিন্দা, বিপক্ষের আক্রমণ এবং অপমানের পীড়ন; না হয় ভক্তি প্রেমের উৎসাহ; একটা না একটা বিষয় সর্ব্বদাই এ দলের মধ্যে কার্য্য করিত। সহচরগণ কখন ভীত, কখন অগ্নিশর্ম্মা, কখন প্রেমে মত্ত; কিন্তু তাঁহারা রসের মাত্রা ঠিক রাখিতে পারিতেন না। কেশবচন্দ্র নিজজীবনের দৃষ্টান্তে সমস্ত ঠিক করিয়া দিতেন। সমবয়স্ক হইলে কি হয়? গুণে ক্ষমতায় সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় গুরু এবং উচ্চ ছিলেন। সুদক্ষ ময়রার মত কত উত্তাপে কি প্রণালীতে কোন্ সামগ্রী প্রস্তুত হয় তাহা বুঝিতে পারিতেন। আসন্ন কোন বিপদ উপস্থিত হইলে বক্তৃতাগুলীমধ্যে প্রথমে তাহা এমনি ভয়ানক আকারে চিত্র করিতেন যে শুনিয়া সহচরবৃন্দের মুখ শুকাইয়া যাইত, প্রাণ কাঁপিত। পরক্ষণে আবার তাহার অন্য দিক্ এমন ভাবে দেখাইয়া দিতেন, যে তাহা শুনিলে জয়ের আশায় সকলের হৃদয়কমল বিকশিত হইত। কথায়, ভাবে মানুষকে ক্ষেপাইয়া তুলিতে পারিতেন। সমর-কুশল সেনাধ্যক্ষের ন্যায় আশ্চর্য্য গুণ এবং ক্ষমতা ছিল। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ সৃষ্টির পর উভয় দলে দেখা হইলেই বিবাদ তর্ক উঠিত। এ সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন, "কেহ যদি তর্ক করিতে আইসে, অগ্রে তাহাকে বলিবে এস, দুই জনে প্রার্থনা করি। প্রার্থনার পর যাহা বলিতে হয় বলিবে"

"এই দলের মধ্যে পড়িয়া কেশব আপনার পুত্র কন্যাদিগকে দেখিবার অবসর পাইতেন না। রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত বন্ধুদিগের সঙ্গে কাটিয়া যাইত। অন্তঃপুরে আহারে বসিয়াছেন, সেখানেও দুই জন সহচর বসিয়া

আছেন। বিছানায় শয়ন করিলেন, সেখানেও দুই জন বন্ধু পা মাথা টিপিতেছেন। হয়ত টিপিতে টিপিতে তাঁহার আগেই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

"এরূপ অদ্ভুত দল পৃথিবীতে কেহ কোথাও দেখে নাই। ভাল প্রসঙ্গ হউক আর না হউক, কোন কাজ থাকুক আর না থাকুক, প্রচারকদল কেশবের সঙ্গ ছাড়েন না। আচার্য্য গভীর চিন্তাশীল প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছেন, দুই এক জন কাছে বসিয়া গল্প করিতেছেন, লিখিবার অবসর দিতেছেন না, কিন্তু তাহা পড়িবার জন্য ব্যাকুল। তথাপি তিনি লিখিতেন আর কথার উত্তর দিতেন। তাঁহারা দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট না থাকিলে যেন কর্ত্তব্য কার্য্যের হানি মনে করিতেন। কেহ মশা তাড়াইতেছেন, কেহ ধূলিধূসরিত মাদুরে পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছেন, কেহ অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় নাক ডাকাইতেছেন। এমন সময় এক হস্তে জলের কেৎলিয়া, এক হস্তে তাম্বূলকরঙ্ক আচার্য্য প্রবেশ করিলেন। নিদ্রিত বন্ধুদিগকে দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার আগমন শব্দে তাড়াতাড়ি কেহ বা জাগিয়া উঠিতেন, কেহ বা ভান করিতেন, যেন জাগিয়া আছেন। গুরুমহাশয়ের ভয়ে ছেলেরা যেমন করে সেরূপ ভাবও কতকটা ছিল। ইহা আমোদের মধ্যে গণ্য হইত। মশা তাড়াইবার কালে কেহ বা দশ বিশ গণ্ডা মশার প্রাণ বধ করিতেন। দল যে ঘরে বসিত সেখানে মশারও আমদানি কিছু বেশী ছিল। কিন্তু আচার্য্য মশা মারিতেন না। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা গায়ে পড়িতেছে, আর তিনি চেয়ারে বসিয়া ধৈর্য্য সহকারে বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা তাহাদিগকে বিদায় করিতেছেন। ভ্রাতৃগণের নিদ্রার প্রাবল্য দেখিয়া নিয়ম করিলেন, সৎপ্রসঙ্গের স্থলে কেহ ঘুমাইতে পাবে না। কিন্তু নিদ্রালুর শ্রান্ত দেহ কি সে নিয়ম পালন করিতে পারে? সমস্ত দিন নানাপ্রকারের পরিশ্রমের পর ভ্রাতৃবৃন্দ সেখানে আসিলেন,

অমনি চক্ষে ঘুম আসিল। কেহ বা ক্ষুধায় অবসন্ন হইয়াছেন, কেহ বা পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। খুব উত্তেজক সৎপ্রসঙ্গ অথবা পরনিন্দা উঠিলে ঘুম চলিয়া যাইত। কাহারো পক্ষে যোগ ভক্তি দর্শন শ্রবণের গভীর প্রসঙ্গ ঘুম পাড়াইবার মন্ত্র ছিল। আচার্য্য নিজেও চেয়ারে বসিয়া মধ্যে মধ্যে একটু একটু ঘুমাইতেন, তজ্জন্য নাসিকার শব্দও হইত; কিন্তু তিনি নাকডাকার অপবাদ সহ্য করিতে পারিতেন না। নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাওয়াটাকে ভয়ানক অসভ্যতা মনে করিতেন। নিদ্রাবস্থায়, তাঁহার নাক ডাকে, সহচরেরা শুনিতে পান, কিন্তু তিনি তাহা জানিতেন না। এই কথা লইয়া কতবার আমোদ পরিহাস হইয়া গিয়াছে। তাঁহার চক্ষে নিদ্রাভাস দেখিলে কেহ কেহ বাড়ী যাইবার চেষ্টা করিতেন, যাই তাঁহারা উঠিতেন, অমনি কেশব জাগিয়া বলিতেন, "কি হে!" অমনি হাসির রোল উঠিত। জননীর নিদ্রা যেমন সজাগ, তাঁহারও তেমনি ছিল। শীঘ্র মজ্‌লিস ভাঙ্গে এটি ভাল বাসিতেন না। গবর্ণমেণ্ট হাউসে কিংবা অন্য কোন সাহেববাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছেন, বন্ধুরা অপেক্ষা করিতেছেন; রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইয়া গিয়াছে, তবু একবার গল্পের জমাট বাঁধে এজন্য ছলে কৌশলে সকলকে আটকাইয়া রাখিতেন। এমন দিন কতই গিয়াছে। হয়ত গভীর রাত্রি সময়ে এমন এক কথা তুলিলেন যে দুই এক ঘণ্টা তাহাতে কাটিয়া গেল। কাহারো কাহারো ঘুমে চক্ষু ভাঙ্গিয়া পড়িত, এ জন্য তাঁহারা ভাল কথায় প্রায়ই যোগ দিতে সক্ষম হইতেন না। নানা রঙ্গের লোক, কেহ এক বিষয়ে গুণবান অন্য বিষয়ে দুর্ব্বল। কিন্তু সকলের সমবায়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এক দেহ প্রস্তুত হইয়াছিল। * * কেশবচন্দ্র এ দলের বন্ধনরজ্জু এবং প্রধান স্তম্ভ। তাঁহাকে ভাল বাসিব, সেবা ভক্তি করিব, তাঁহার প্রিয় হইব, এ ইচ্ছা প্রত্যেকরই ছিল।"

এই দলের তখন কিরূপে চলিত সে সম্বন্ধে শ্রীব্রহ্মানন্দের "নববিধান" পত্রে স্বলিখিত বিবরণ হইতেও কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"আমাদের প্রেরিত ভ্রাতৃগণের কিরূপে চলে জানিতে পাঠকগণের কৌতুহল হইতে পারে। এই দীনাত্মা ঈশ্বরের লোকগুলীর বিশ্বাস তাঁহারা ঈশ্বরের নিরাপদ আশ্রয়ে বাস করিতেছেন। ইহাঁদের কোন স্থায়ী আয় নাই যাহার উপর ইহাঁরা নির্ভর করিতে পারেন। সাময়িক দান, ছাপাখানা ও পুস্তকাদি বিক্রয় হইতে যা অল্প আয় হয় তাহাতে আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া দূরে থাক, মাসে মাসে প্রায় দুই তিনশত টাকা অভাব পড়ে। প্রত্যেক প্রেরিতের যাহা প্রয়োজন তাহার অর্দ্ধাংশ পাইবারও উপায় নাই। তথাপি মাসের পর মাস ঈশ্বর আশ্চর্য্যরূপে কোনমতে সমুদয় অভাব পুরণ করিয়া দেন। কল্য কি হইবে সকলই অস্থির। হয়ত কয়েক আনা মাত্র প্রতি পরিবারকে দেওয়া হইবে, কিন্তু কত তাহা কেহই জানে না। হয়ত যাহা দেওয়া হইবে তাহাতে চালটী মাত্র কেনা হইতে পারিবে, কিন্তু তৈল বা কাঠেরও উপায় হইবে না। কাপড় কিংবা জুতার খুব অভাব পড়িলে, হয়ত এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ পরে আসিবে। প্রেরিতগণ ঈশার নিকট কল্যকার জন্য চিন্তা না করিতে শিখিয়াছেন, যদি চিন্তা করেন ভিতরে কি ভাবনা হয় ও বাহিরে কি অন্ধকারই দেখেন! কিন্তু কল্য আসিয়া সকল অভাব ও অন্ধকারই দূর করিয়া দেয়। এক স্নেহময়ী প্রেমময়ী মা সব বিষয় মীমাংসা করিয়া দেন এবং প্রতিদিনের অভাব মোচন করেন। কেমন করিয়া করেন আমরা বলিতে পারিনা। আমরা যদি বলি জগৎ কি তাহা বিশ্বাস করিবে? এই দশটাকার একখানি নোট আসিল, এই এক খানি কাপড়, এই এক জোড়া জুতা, এই এক বোতল ঔষধ এবং ডাক্তার বিনা দর্শনীতে চিকিৎসা

করিতে সমাগত! এ সমুদয়ই অপ্রত্যাশিতরূপে হইয়া থাকে এবং সেই জন্য ইহাতে কতই অবাক হইতে হয় ও আনন্দ হয়। যেন আমাদের মঙ্গলময়ী মা স্বয়ং প্রতিদিন ভিক্ষা করিয়া আনিয়া আমাদের অভাব মোচন করেন। প্রভু কখনও বলেন না "এই কল্যকার আয়োজন রহিল," কিন্তু যখনই সময় আসে তখনই তাহা আনিয়া দেন। মার প্রত্যক্ষ কোমল হস্ত হইতে অন্ন গ্রহণ কি সুখের!"

ইঁহাদের দিন কিরূপে অতিবাহিত হইত তাহার সম্বন্ধেও শ্রীব্রহ্মানন্দ "নববিধান" পত্রে বলেন:—

"বিছানা হইতে উঠিয়াই তাঁহারা ঈশ্বরকে স্মরণ করেন এবং তাঁহারই উপর আত্মসমর্পণ করেন। দৈনিক সংবাদ পত্র একটু আধটু দেখিয়া অভিষেক মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক কমলসরোবরের বা কলের জলে স্নান করেন। তাড়াতাড়ি একটু ছোলা, ফল বা যদি জুটে একটু দুধ খাইয়া লন। মহিলাদিগের দ্বারায় দেবালয় পরিস্কৃত হইয়া দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে উপাসনার ঘণ্টা বাজে। সাধকগণ অধিকাংশই কমলকুটিরের পার্শেই থাকেন, ঘণ্টার শব্দে উপাসনার ঘরে তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হন। আচার্য্যই উপাসনা করেন, তাহা দুই ঘণ্টা কখনও তিন চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত ধরিয়া হয়। প্রতিজন সাধক এক একদিন প্রার্থনা করেন। ইহাই দিনের প্রধান কাজ, যাহাতে আত্মার অন্ন এবং প্রতিজনের ও মণ্ডলীর বলশক্তি সঞ্চয় হয়। দৈনিক উপাসনায় নূতন আনন্দের সংবাদ, নূতন বিধান, নূতন সুসমাচার, নূতন সাধন আসিয়া থাকে। প্রায় ১১টা কি ১২টায় উপাসনা শেষ হয়। উপাসনার পর সাধকগণ আচার্য্যের বাড়ীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে কুটীরে মিলিত হইয়া স্বহস্তে অন্ন ও নিরামিষ ব্যঞ্জন রন্ধন করেন। রন্ধনকালে উপাধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত বা অন্য

কোন পুস্তক হইতে শাস্ত্রপাঠ করেন। তারপর দৈনন্দিন আবশ্যকীয় নানা বিষয়ে কথোপকথন চলিয়া থাকে। অতঃপর প্রতি জন নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে যান। মণ্ডলীর সংবাদ পত্র বা সাময়িক পত্রের জন্য প্রবন্ধ-লেখা, প্রচারভাণ্ডার সংক্রান্ত অর্থ সাহায্য সংগ্রহ, দাতব্য বিভাগের অর্থ সাহায্য ভিক্ষা, উপাসনা বা দেখাশুনা বা বক্তৃতাদি করা, ছাপাখানা পরিদর্শন, খাদ্যদ্রব্যাদি ক্রয় ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্য, হিন্দু ও খ্রীষ্টিয় ভ্রাতৃগণের সহিত সদ্ভাব সমাগম, বা প্রচার কার্য্যালয়ের পত্রাদি লেখা, হিসাব রাখা, পুস্তক বিক্রয় ইত্যাদি বিবিধ কার্য্য সকলে করিয়া থাকেন। অনন্তর সন্ধ্যা হইলে নিজ নিজ নির্জ্জন সাধন বা একতারা লইয়া ধ্যান ধারণা ঘণ্টা দুই ধরিয়া করেন। সান্ধ্য ভোজনের পর বন্ধুগণ পুনরায় আচার্য্য ভবনে মিলিয়া থাকেন এবং রাত্রি প্রায় ১টা পর্য্যন্ত কথোপকথন করিয়া থাকেন।"

শ্রীব্রহ্মানন্দ তাঁর দলের এই সান্ধ্যমিলন সম্বন্ধেও "নববিধান" পত্রে এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—"যদি তুমি কোন দিন সন্ধ্যার সময় কমলকুটীরে যাও তুমি হয় ত দেখিতে পাইবে জন বারো সাধক মেজেতে কার্পেটে বসিয়া আছেন, দুই একজন হয় ত নিদ্রিত বা অর্দ্ধনিদ্রিত। সেখানে বেশ উৎসাহজনক কথোপকথন চলিতেছে। কখনও তাহা একটু নরম পড়িতেছে, আবার কখনও জ্বলিয়া উঠিতেছে এবং এইরূপ প্রায় রাত্রি দ্বি-প্রহর পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। কি কি বিষয় আলোচনা হইতেছে তুমি মনে কর ?—আমাদের ছেলেবেলার কথা,—স্ত্রী স্বাধীনতা,—লুথরের আধ্যাত্মিক অবনতি,—বৈরাগ্য,—চৈতন্য,—গত দুদিন প্রচারকগণ কিছুই সাহায্য পান নাই—দলের জীবিকা নির্ব্বাহ—গ্ল্যাডষ্টোন গাছ কাটেন,—কি করিয়া আমাদের বই নগদ বিক্রয় করা যায়—রাজভক্তি—স্বহস্তে রন্ধন

—মফস্বলের ব্রাহ্মগণ, তাঁদের অভাব কি?—আমাদের হিন্দি শিখা উচিত—গত দুই বৎসরে আমাদের উন্নতি—লাহোর লাকৌর বিদ্যা—মাদ্রাজিদের সামাজিক অবস্থা—বিলাতযাত্রী হিন্দু—সামাজিক নীতি ইত্যাদি, কি বিচিত্র সমুদয় বিষয়! এবং তথাপি আজ এই বিশ বৎসর, দিনের পর দিন এইরূপই কথোপকথন চলিয়া আসিতেছে!"

বাস্তবিক কি সুখের দলই ব্রহ্মানন্দের এই দল এক সময়ে ছিল। এমন সুখী দল হইলেও ইহা কিন্তু ব্রহ্মানন্দের ঠিক মনের মত হয় নাই। এই দলের উপর তাঁর আধ্যাত্মিক দাবী এতই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইল যে এদলকেও তিনি শেষে অস্বীকার করিলেন এবং আক্ষেপ করিয়া প্রার্থনায় বলিলেন :—

"ক্রমে ক্রমে বন্ধুগণ এবং আমার মধ্যে সমুদ্র বাড়িতে লাগিল, এ পারে আমি ওপারে তাঁহারা রহিলেন। ভবিষ্যতে তাহা হইলে আর আশা হয় না। প্রবর্ত্তকের মতে চলা দূরে থাকুক, কোথায় শ্রী গৌরাঙ্গ আর কোথায় এখনকার বৈষ্ণবেরা। তাঁহারা ব্রাহ্মণ, আমি চামার, কিন্তু একই ব্যবসা। তাই বুঝিয়াছি এই রকমই হইয়া থাকে। জীবন থাকিতে ভূতকালে, বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতেও বুঝি আর আশা নাই।"

অন্যত্র আরো বলিলেন :—

"আমিও লিখি ইহাঁরাও লিখুন। দলপতি দলের বিশ্বাস পাইল না। দলের মধ্যে কোনই অশান্তি গেল না। ধর্ম্মের সম্পর্ক মধুময় নহে। দলের মধ্যে অবিশ্বাস ক্রমে বাড়িতেছে। দলপতি অপেক্ষা অন্য লোকে দলকে ভালবাসে, দলের লোকের সুখ বিধান করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। লেখা রহিল খাতায়, খাতাখান সিন্দুকে পড়িয়া থাকিবে, আমরা চলিয়া যাইব। ভবিষ্যতে লোকে খুলিয়া খাতা দেখিবে দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিবে।

২৫ বৎসরের সাধনে দু পয়সার জমা উপার্জ্জন হয় না। আগে যা ছিল ক্ষমা, ধ্যান, ভক্তি, উপাসনা, উৎসাহ ক্রমে ক্রমে যাইতেছে; ছিল এক দৈনিক উপাসনা তাও কি হইতেছে। পরের সেবা, পরিবার মধ্যে ধর্ম্মস্থাপন সব কমিয়া যাইতেছে, আর যা বাকী থাকিতেছে, বছর বছর ক্রমে কমে আসছে। সত্যকথা লিখে যাব পৃথিবীকে ফাঁকি দিব না। লেখ লেখ আগে যেমন ভালবাসিতাম পরস্পরকে এখন আর বাসি না। নিজের নিজের কিছু কিছু লাভ হয়েছে। আগে যা খারাপ ছিলাম তার চেয়ে ভাল হয়েছি। কারো দুই কোটী কারও তিন কোটী লাভ হয়েছে। বৃদ্ধদের প্রবঞ্চনাপূর্ণ প্রেম, চড়ুকে-হাসি, মনে মনে একত্র থাকিবার ইচ্ছা নাই, বাহিরে কেবল দেখানো। নিজ সম্বন্ধে সকলে জিতেছেন, দল সম্বন্ধে সকলের লোকসান হয়েছে। তবে আর দল কেহ করিবে না, আগেকার মত সকলে একা একা পাহাড়ে কিংবা অন্য স্থানে সাধন করিবে। পুরাতন বিধান রহিবে তবে নূতন বিধানের দল আর রহিল না। বড় দুর্ভাগ্য! মা তুমি যে ঢের টাকা দিয়াছিলে বাণিজ্য করিবার জন্য, শেষে এত দুর্ভাগ্য, এত দেনা? পরলোকে যাবার পূর্ব্বে যেন দেনা শোধ করিয়া খুবলাভের বন্দোবস্ত করিয়া শান্তি নিকেতনে চলিয়া যাইতে পারি।"—প্রার্থনা 'ঋণ শোধ।'

"এখনও সময় আছে, এখনও চেষ্টা করি। মা, যারা পরস্পরের নয় তারা আমারও নয় তোমরাও নয়, নববিধানেরও নয়, একথা মানিতে হইবে। যাঁরা একজন হন তাঁরা তোমার, তাঁরা তোমার বিধানের। আমি চাই সকলে একেবারে তোমার ভিতর বিলীন হইয়া যান। দশ দরোজা নাই স্বর্গের এক দরজা দিয়া যাইতে হইবে। বন্ধুরা একখানা হয়ে আমার সঙ্গে এক হয়ে যাবেন তোমায় গাড়ী করে। একটী বই দরজা নাই।

সেখানে নববিধান দরজায় জিজ্ঞাসা করেন—প্রাণেশ্বরকে ভালবাস? প্রাণেশ্বরের ছেলেদের ভালবাস? যদি বলি "না" প্রবেশ করিতে দেন না। এক শরীর একাত্মা হয়ে তোমরা ভিতর মিশিতে চাই। ভিন্নতা, স্বাধীনতা স্বতন্ত্রতা, "আমি" "আমি" যেখানে সেখানে আমার বাস নাই, আমি সে "আমি" ভূতের রাজ্যে থাকিতে চাই না। আমরা সকলে যেন ভূতের দেশ স্বাধীনতার ভিন্নতা দেশ হইতে শীঘ্র পলায়ন করিয়া সকলে এক প্রাণ হইয়া তোমার পবিত্র প্রেমরাজ্যস্থাপন করিয়া একাত্মা হইয়া তোমার বুকের ভিতর বিলীন হই।—প্রার্থনা 'একাত্মতা।'

শেষে নিম্নলিখিত ভাবে অনুযোগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ এ দল হইতে বিদায়ও চাহিয়াছেন :—

"হে প্রেমস্বরূপ, যদি আমাদের মধ্যে আর উন্নতির সম্ভাবনা না থাকে যাহা হইয়াছে তাহাতেই সকলের উন্নতির পরিসমাপ্তি হয়, তবে আর অকর্ম্মণ্য জীবদিগের পৃথিবীতে থাকিবার প্রয়োজন কি? যদি ইহাদের সকলের মত চরিত্র গঠন হইয়া থাকে, লইবার বা শিখিবার কিছু না থাকে, তবে আর পৃথিবীতে থাকিবার প্রয়োজন কি? যার যা করিবার আপনি আপনি করিয়া লইয়াছে। হে পিতা, ইহাদের ভার লইয়াছ? নাটক শেষ হইয়াছে, মানুষ জোর করিয়া কেন বাজাইবে? যতক্ষণ কাজ ততক্ষণ দরকার।

"একটা অবস্থা আছে, মন যার ও দিকে আর যায় না। খুব ভক্তি প্রেম উপাসনা, তারপর একটা সীমা। একটা সীমা পর্য্যন্ত গিয়ে মানুষ এক আধটু উপাসনা করে কোন রকমে দিন কাটিয়ে দেয়। ঠাকুর ঘরে আমোদের কাজ আর হয় না। আবার আস্তে আস্তে সংসারে চলে যাবেন সকলে। [illegible]

তোমাকে ডাকা, এই রকম ব্যাগারঠেলা হবে। মা, সাধু হব, কিন্তু মিলন হবে না। হরি, এই ভিক্ষা চাই, এই সময়ে সময়োচিত কর্ত্তব্য বলে দাও। বিশ্বাস নাই পরস্পরকে, প্রেম নাই, অধীন কারও হব না, ভাইয়ের জন্য প্রাণ দেব কেন! এক নৌকায় স্বর্গে যাওয়া হবে না, একলা গিয়ে নরকের রাজা হব, কিন্তু সকলের সঙ্গে স্বর্গে যাব না, সকলে এই কথা বলিবে! মা, দেখ কি হচ্চে। হে দেবি, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই অন্ধকারের মধ্যে তোমার শ্রীপাদপদ্ম ধরিয়া যতটুকু আলো পাই তোমার নিকট হইতে সেইরূপ কাজ করি।"— প্রার্থনা, 'দল হইতে বিদায়।'

স্বয়ং ব্রহ্মানন্দই ত এ দলের জীবন, তিনি বিদায় লইলে এ দলের যে এইরূপই অবস্থা হইবে তাহাতে সন্দেহ কি?

শ্রীব্রহ্মানন্দের পত্রাবলী।

শ্রীব্রহ্মানন্দ প্রেরিত মহাশয়দিগকে ও তাঁর অন্যান্য অনুচরদিগকে সময়ে সময়ে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন তাহা হইতেও তাঁহার সহিত তাঁহাদের কিরূপ মধুময় সম্বন্ধ তাহা বুঝা যাইবে। এই উদ্দেশ্যে এই স্থানেই তাঁহার কয়েকখানি পত্রাংশ প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীব্রহ্মানন্দ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়কে লেখেন :—

"প্রচারশালার মনোহর বৃত্তান্তপূর্ণপত্র কয়েক খণ্ডের দ্বারা অনুগৃহীত করিয়াছ, তজ্জন্য তুমি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ কর। ভ্রাতঃ! অগ্রসর হও! আরো অগ্রসর হও! বিধাতা তোমাকে প্রার্থনাশীলতা, বিশ্বাস এবং উৎসাহ প্রদান করুন! যে ব্রত তুমি গ্রহণ

করিয়াছ তৎসংক্রান্ত কার্য্যের স্বাধীনতার উপর আমি বাধা দিতে ইচ্ছা করি না। আমি তোমার প্রভু নহি, কিন্তু "কর্ত্তব্য" তোমার প্রভু। কর্ত্তব্য যেখানে যাইতে বলে, যাও এবং যাহা করিতে বলে তাহা কর। আমরা এক জীবন্ত সময়ে বাস করিতেছি। সুযোগ এবং ক্ষমতা যাহা পাইয়াছি তাহার ব্যবহারের জন্য আমরা প্রত্যেকে ঈশ্বরের নিকট দায়ী।"

অন্য সময়ে লেখেন :—

"আত্মার যোগই প্রকৃত যোগ। শরীর সম্বন্ধে নিকটে কিংবা দূরে থাকিলে লাভ ক্ষতি নাই; আত্মার গভীরতম প্রদেশে যে সম্মিলন হয় তাহাই প্রার্থনীয়। যদি আমরা সকলে ঈশ্বরকে মধ্যবিন্দু করিয়া আন্তরিক যোগে তাঁহার সঙ্গে গ্রথিত হই, তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক প্রণয় হইবে তাহাই যথার্থ স্থায়ী প্রণয়; তাহা সংসার দিতেও পারে না, লইতেও পারে না। কখন কোন্ স্থানে কোন অবস্থাতে আমাদের থাকিতে হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। যদি তাঁহার কার্য্যে সকলে নিযুক্ত থাকি, তিনিই আমাদের যোগ হইবেন এবং আমাদের হৃদয়কে পরস্পরের নিকট রাখিবেন। এত দিন যে প্রণালীতে উপাসনা হইত প্রতিদিন সেইরূপ উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরের পবিত্র সামীপ্য উপলব্ধি করিতে যত্নবান হইবে। কিসে তাঁহাকে নিজের বলিয়া আয়ত্ত করিতে পারি, ইহার জন্য প্রার্থনা কর। যদি বন্ধু হইতে দূরে থাকিলে হৃদয় শুষ্ক ও বিষন্ন হয়, ঈশ্বরকে নিকটে না দেখিলে কি প্রকারে শান্তি হইবে? তিনি বাস্তবিক "আমার," তবে কেন "আমার" ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন না হই? ঈশ্বরের কার্য্যে নিয়মিতরূপে ও শ্রদ্ধার সহিত নিযুক্ত থাকা পাপ ও অসাড়তা নিবারণের প্রধান উপায়।"

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে লেখেন ঃ—

"আমার নির্দয় ব্যবহারের বিষয় তুমি অভিযোগ করিয়াছ। তোমাকে বর্জ্জন! কে বলিল? নিশ্চয় জানিও তোমাদের সকলের এবং প্রত্যেকের নিমিত্ত আমি আমার হৃদয়মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছি; আমি যে তোমার কল্যাণপ্রার্থী তদ্বিষয়ে বিশ্বাসী হইয়া অবস্থান কর। তোমাকে রাখিব কি পরিত্যাগ করিব সেরূপ স্বাধীনতা আমার নাই। যে কোন ব্যক্তিকে ঈশ্বর আমার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন চাকরের মত তাহার সেবা করিতে আমি বাধ্য। পিতার নিকটে তোমাদিগকে পৌছিয়া দিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা এবং সকলকে ভালবাসা আমার জীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। প্রতাপ, আমি ভাড়াটে নই। আমার ব্যবহার প্রণালীর বিষয় কেহ যেন কিছু মনে না করেন। কারণ, চিকিৎসক যেমন রোগীর অভাবানুসারে ঔষধের ব্যবস্থা করে আমিও তেমনি করিয়া থাকি। রোগ আরোগ্য করাই উভয়ের উদ্দেশ্য। যে পরীক্ষা এবং সংগ্রামের পেষণে তুমি ভারাক্রান্ত হইয়াছ তাহা কৃতজ্ঞতা ধৈর্য্য এবং আশার সহিত বহন কর; কেন না, তাহা তোমার মঙ্গলের জন্য। তোমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে কি না তাহা তোমাকে দেখাইবার জন্য তাহারা আসে। অতএব অবিশ্রান্ত ব্যাকুল প্রার্থনা দ্বারা তাহা তুমি গ্রহণ কর। আমি তোমাকে কতবার বলিয়াছি, পূর্ব্বে যাহারা কখন গণ্ডগোলে পড়ে নাই, তাহাদের ঘর সুদৃঢ় করিবার পক্ষে ইহা এক শিক্ষা। পরীক্ষা বিপদের ভিতর দৈব কার্য্যের রহস্য লোকে বুঝিতে পারে না এবং চায় না; সেই জন্য তাহারা না বুঝিয়া সন্দেহ এবং নৈরাশ্যে পড়িয়া সচরাচর ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দেয়। সমস্ত যদি চলিয়া যায়, তথাপি তুমি বিশ্বাস এবং আশাকে নিশ্চয় পোষণ করিবে। বিধাতার উপর

নির্ভর এবং ভাল হওয়ার আশা যদ্দ্বারা পরীক্ষিত হয় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা। ঈশ্বরের পথ করুণার পথ, পরীক্ষার সময় ইহা স্মরণে রাখিবে।"

শ্রীযুক্ত ত্রৈলক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয়কে লেখেন :—

"আজ কাল এখানে জীবন দেখা যাইতেছে। আশ্রমের বিশেষ কিছু হয় নাই। প্রচারকদিগকে লইয়া পড়া গিয়াছে। স্বাধীনতা ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সৈন্যের ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া বিধানের অধীন হও, এক মাসের মধ্যে তোমরা ফল দেখিতে পাইবে। এখন আমার এই উপদেশ, এই শাস্ত্র। করিয়া দেখ, অধীন হইলে উপকার হয়, ফল দ্বারা বুঝিতে পারিবে। একদল গোরা ক্ষেপিলে যেমন হয়, তোমরা কয় জন দলবদ্ধ হইয়া মাতিলে ঈশ্বররাজ্য সহজে স্থাপিত হইবে।"

অন্য সময়ে লেখেন—

"তোমরা কি ভাবিয়াছ? তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিলে আমারতো অত্যন্ত কষ্ট ও আশঙ্কা হয়। যাহা কলিকাতায় দেখিয়া আসিলাম তাহা অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। তাহা স্মরণ ও চিন্তা করিলে আমার মন কখন শান্ত থাকিতে পারে না। যদি এত অবিশ্বাস আমাদের দলের মধ্যে আসিয়াছে তাহা হইলে কি হইবে? হে ঈশ্বর কি হইবে? কি হইবে। হাতের সামগ্রী, বুকের সামগ্রী এই দলটী কি ভাঙ্গিবে? আমাকে কি প্রাণের ভাই বন্ধু সব ছাড়িয়া একে একে পলায়ন করিবে? ঈশ্বর মঙ্গল করুন। আমাকে স্বার্থপর লোভী সংসারপরায়ণ অভক্ত মনে করাতে আমার কিছুই ক্ষতি হইবে না, কিন্তু যাঁহারা বলিবেন তাঁহাদের দশা কি হইবে এই ভাবিয়া আমার প্রাণ কাতর। আমি প্রেমের খাতিরে খুব গালাগালি সহ্য করিয়াছি এবং আরো কত সহিতে হইবে। খুব

নিকটস্থ যাহারা তাঁহারা কি আমায় নিষ্কৃতি দিয়াছেন? ঐ দেখ বিজয়! তাঁহার কি হইল? আমার প্রতি অবিশ্বাস করিলে যদি দয়াময়ের মুক্তি-প্রদ বিধানকে অগ্রাহ্য করা হয় তাহা হইলে কি হইবে এই ভাবনায় আমার কষ্ট হয়। আমাকে অস্বীকার ও অতিক্রম করিয়া যদি কেহ বাঁচিয়া যাইতে পারেন তাহাতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহা কি সম্ভব? আমি অবিশ্বাসকে বড় ভয় করি। ইহা ভয়ানক, ভয়ানক পাপ হইতেও ভয়ানক। খুব পরস্পরকে শাসন কর, এবং সকলে বিশ্বাসী হও, স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী হইবে।"

শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার মহাশয়কে লেখেন :—

"তুমি পূর্ব্বে আমাকে কোন পত্র লিখিয়াছিলে কি না তাহা আমার স্মরণ নাই, কিন্তু উপস্থিত পত্র পাঠে অতীব আনন্দিত হইলাম এবং হৃদয়ের সহিত তোমাকে শুভাশীর্ব্বাদ অর্পণ করিতেছি। তোমরা যতদিন আমার প্রণয় পাশে আবদ্ধ হইয়াছ তত দিন নিয়ত তোমাদের মঙ্গল চেষ্টা মঙ্গল প্রার্থনা ও মঙ্গল চিন্তা করিতেছি। বাহিরে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারি বা না পারি নিশ্চয় জানিও হৃদয় মধ্যে যে সকল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছি তন্মধ্যে তোমরা সদা অবস্থান করিতেছ, এবং দূরে থাকিলেও সম্পূর্ণ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই। যে জন্য এই সম্বন্ধ পরস্পর মধ্যে ঈশ্বর সংস্থাপন করিয়াছেন, এখন যাহাতে সেই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় তাহাই প্রার্থনীয়। তিনি সর্ব্বসাক্ষিরূপে সর্ব্বদা নিকটে রহিয়াছেন ইহা স্মরণ করিয়া পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে, এবং পরস্পরকে পাপের নিবারক ও শাস্তা এবং ধর্ম্মপথে সহায় মনে করিয়া সমবেত চেষ্টা দ্বারা সাধুতা রক্ষা করাও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমাদের মধ্যে যে যোগ তাহার লক্ষ্য সাধন করিতেই হইবে, নতুবা পরস্পর হইতে

বিয়োগ এবং প্রত্যেকের বিয়োগ। প্রাত্যহিক উপাসনাকে আরও বিনম্র ও জীবন্ত কর, এবং সমস্ত অনুরাগের সহিত দয়ালু পিতার চরণ ধারণ কর; পবিত্র উৎসাহসাগরে পাপের নৌকা ডুবিয়া যাইবে। তোমাদের মঙ্গল হউক।"

শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়কে লেখেন :—

"তোমার কয়েকখানি পত্র যথাসময়ে প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তোমার প্রচারবার্ত্তা পাঠে আনন্দলাভ করিয়াছি। ঈশ্বর তোমাদের আত্মোন্নতির জন্য যে সকল বিশেষ সদুপায় করিয়া দিয়াছেন, যেরূপ বিশেষ করুণা করিতেছেন তদ্বারা তিনি তোমাদিগের জীবন তাঁর রাজ্য বিস্তারের জন্য ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। তোমাদের বল বুদ্ধি শরীর সকলই তাঁহার চরণে বিক্রীত হইয়াছে; তাহার উপর আর তোমাদিগের অধিকার নাই এই মনে করিয়া এখন সম্পূর্ণরূপে তোমরা তাঁহার অনুগত দাস হইয়া তাঁহার পবিত্র নাম প্রচার করিয়া নিজের ও দেশের মঙ্গল সাধন কর, ইহাই আমার হৃদয়ের ইচ্ছা; ইহা দেখিলে আমি কৃতার্থ হই। যাহা লিখিয়াছিলে তাহা পাঠ মাত্র অমূলক মনে করিয়াছিলাম, আমার সংশয় সপ্রমাণ হইল আনন্দের বিষয়। এবার চাঁদা সম্বন্ধে কাণপুরের কথা যাহা লিখিয়াছ তাহা পাঠ করিয়া কি পর্য্যন্ত উল্লসিত হইয়াছি বলিতে পারি না। অবিশ্বাসীরা বুঝিতে পারে না, কিন্তু আমাদের জন্য ঈশ্বর সকলই করিতেছেন।"

সাধু শ্রীঅঘোর নাথ গুপ্ত মহাশয়কে লেখেন :—

"তোমার পত্র পাঠে কৃতার্থ হইলাম। আজ আমার শুভদিন, এই হিমাচলে বসিয়া এমন মনোহর মঙ্গল সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম। দয়াময়ের দয়ার এত গুলি কথা পাঠাইলে. কিন্তু আমার [illegible]

স্থান নাই, আর যে ধরে না ; কোথায় রাখিব ? অবাক্ হইলাম, দেখে শুনে স্তম্ভিত হইলাম। আরো কত আছে বলিতে পারি না। "ব্রহ্ম-নামে মাতিল (আমার প্রিয়তম মুঙ্গের)। ধন্য দয়াল প্রভু! ইচ্ছা হয় একবার দৌড়িয়া গিয়া তোমাদের সঙ্গে মিলে তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়ি। তোমরা চিরকাল এইরূপে স্রোতে পড়িয়া থাক, মৃত মুঙ্গের জীবন পাইয়া অন্ধ মুঙ্গের চক্ষু পাইয়া দয়াময়ের অতুল কৃপার কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া থাকুক। দেখি এক বার কেউ বলে কি না, তাঁর নামের গুণে মরা মানুষ বাঁচিতে পারে। ঈশ্বরের ঘরে কেবল ভিখারীর মত দাঁড়াইয়া থাকিতে চাও ; ভাল, দীনভাবে দাঁড়াইয়া থাক, দেখিবে নিশ্চয় বলিতেছি, দেখিবে ঈশ্বরের সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না শরীর ও মনের উপর ব্যপ্ত হইয়াছে। আমাদের গুণে ত কিছুই হয় না। তিনি কেবল এক বার করুণাচক্ষে পাপীদিগের প্রতি দৃষ্টি করেন, দীন দেখিলেই সেই দয়াময়ের চক্ষু হইতে একটি কোমল সুমধুর আলোক সেই দীনের উপরে পড়ে, অমনি উহার জ্বালা নিবৃত্তি হয় ; সকল দুঃখ ঘুচিয়া শান্তি হয়। তাঁর কটাক্ষে কি না হয় ? অঘোর, আবার সেই পুরাতন কথা বলি, পায়ে ধরে পড়ে থাক সকল কামনা পূর্ণ হইবে। যিনি আবেদন পত্রে যাহা লিখিয়াছেন তিনি তাহাইপাইবেন, নিশ্চয়ই পাইবেন, কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্য কিছু পাইবেন না। এই জন্য বলিতেছি, কে কি চাও এই বেলা স্থির করিয়া লিখিয়া দাও। অঙ্গীকার করিতেছি, তাহা প্রাপ্ত হইবে। মরিবার সময় তাহা সম্বল করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে। আবার কবে মুঙ্গেরের সকলকে হৃদয়ে বেঁধে পিতার কাছে দাঁড়াব।

প্রিয় জগদ্বন্ধুকে আমার হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ জানাইবে। তিনি বড় দীন আমি জানি দীনবন্ধু তাঁহাকে চরণের বলি দিয়া আশ্রয়

করুন। আর দুই দীন কি করিতেছেন? প্রসন্ন কেমন আছেন? মৈত্রেয় মহাশয় সঙ্গে আসিতে পারিলেন না বড় দুঃখ হয়, পিতার সম্পত্তি সেখানেও অনেক। সে দিন প্রাত্যহিক উপাসনার পরে তাঁহাকে মনে পড়িল। নবকুমার কি করিতেছেন? আর সকলে কেমন আছেন? তাঁহাদের নাম লিখিলাম না, কিন্তু তাঁহারা হৃদয়ে আছেন। অন্নদার পত্র পাইয়াছি, গত কল্য অক্ষয় তুষারাবৃত পর্ব্বত শিখর সকল দূর হইতে দেখিলাম, নিম্নে মেঘ সকল ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, বিলক্ষণ শীত। ঐ সকল পর্ব্বতে যিনি বাস করেন, তিনি মহান্ ভূমা, তিনিই মুঙ্গেরের দয়াময় পিতা।

মুঙ্গের কি "যদি" কথাটি ছাড়িয়াছেন? স্বর্গরাজ্য সম্মুখে, "যদি"-বিহীন সংশয়বিহীন বিশ্বাস ধারণ করিয়া অগ্রসর হও, অসীম ধন ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত রহিয়াছে। মনের সহিত বলিতেছি, মুঙ্গের! তোমার মঙ্গল হউক।

মুঙ্গেরের ভক্তি প্রবাহ সময়ে সেখানকার কোন ভক্তিপ্রাণ সাধককে লেখেন:—

"ভক্তিঘাটের সমারোহ দেখিয়া ও কোলাহল শুনিয়া প্রাণ শীতল হইতেছে। চারিদিক্ হইতে কেবল ভক্তির কথা শুনিতেছি। তোমাদের পত্র গুলি বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলে বড় আনন্দ লাভ হয়। আর কিছু তোমাদের থাকুক বা না থাকুক যদি কেবল ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভক্তের প্রতি ভক্তি থাকে তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হই, কেন না ভক্তিই মুক্তির দ্বার। এই ভক্তি যাহাতে প্রগাঢ় হয়, তাহার চেষ্টা কর, তজ্জন্য প্রার্থনা কর, যাহা চাও সকলি পাইবে। দয়াময়ের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে, ভক্তিভাবে ভক্তবৎসলের পদতলে পড়িয়া থাকিতে, আমি তোমাদিগকে

এই করার জন্য আমার প্রতি দয়াময়ের আদেশ। বর্ত্তমান অবস্থার জন্য তাঁহার শ্রীচরণ ধরিয়া থাকাই ঔষধ। তিনি এই কথা বলিয়াছেন, সুতরাং এই কথা দাস হইয়া তোমাদিগকে বার বার বলিতেই হইবে। পরে তিনি আরও বলিবেন, সময় অনুসারে সমুচিত ঔষধ তিনি বিধান করিবেন। সে বিষয়ের জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই, জিজ্ঞাসু হইবার অধিকার নাই। প্রভুর যখন যে আজ্ঞা হইবে তখন তাহা পালন করিতে হইবে। এখন তিনি যে পথ দেখাইতেছেন বিনীত ভাবে সেই পথে চল। অন্য কথা কহিও না, পরে কি হবে কোথায় যাব ভক্তদিগের এ বিষয় আলোচনা করা অন্যায়, ইহা অনধিকার চর্চ্চা, ইহা অবিশ্বাস। তাঁর চরণে মাথা রাখ তিনি টানিয়া লইয়া যাইবেন; মাথা উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিও না; প্রভু কোথায় লইয়া যাও, এ যে ভাল পথ বোধ হয় না; এ ভয়ানক অবিশ্বাসের কথা মুখে আনিও না। বিশ্বাস কর প্রভু নিজে বলিতেছেন তাঁহার চরণ ধরিয়া থাকিলে মহাপাপীদের পরিত্রাণ হইবে। এ সময়ের এই বিশেষ প্রত্যাদেশ। আমি যখন মুঙ্গেরে "দয়াময়ের চরণ চাই," বলিয়া তোমাদের দ্বারে দ্বারে বেড়াইতাম, তখন সময়ের ধন কিনিতে অনুরোধ করিতাম। অসময়ের দ্রব্য আমি কোথায় পাইব, তোমরাই বা তাহা পাইলে কি করিতে পার? তোমরা যদি সহস্র বার বল, আমরা যে মহাপাপী আমি সহস্র বার বলিতে চাই পিতার চরণে লুটাইয়া পড়। কেন না তিনি স্বয়ং বলিয়া দিয়াছেন এখন-কার রোগের এই ঔষধ। যদি বল আর কোন উপায় বলিয়া দিন, এই উপায় কার্য্যকর হইতেছেনা, আমি এ কথা এখন শুনিব না, শুনিতে পারি না। দয়াময়ের আদেশ প্রচার করিব, আমার নিজের মত চালাইব না। কিন্তু পরে তোমাদের কথা শুনিব, আর আর উপায় বলিব যখন

পিতা বলাইবেন। যখন এক পথ শেষ করিয়া অপর পথের উপযুক্ত হইবে তখন সেই নূতন পথ দয়াময় দেখাইবেন, ভয় নাই, চিন্তা নাই। পাপের জন্য ঘৃণা, ব্যাকুলতা, ক্রন্দন, নিজের প্রতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস। আপনার উপর নির্ভর করিতে গেলে চারিদিক্ অন্ধকার—তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থা এই তাহা আমি জানি, কিন্তু পরিত্রাণের জন্য এ সমুদয় আবশ্যক। এখন যদি হাসিতে চাও, তাহা হইবে না, প্রতিদিন আনন্দের সহিত ব্রহ্মপূজা করিতে চাও, তাহা হইবে না। পাপ থাকিতে শান্তি লাভ করিতে চাও, তাহা হইবে না। এখন কাঁদিতে হইবে, শষ্য সংগ্রহের সময় হাসিবে ; এখন ব্যাকুলতা, নবজীবন পাইবার সময় শান্তি হইবে ; তাই বলি এখন খুব ব্যাকুল হও, পাপের জন্য আপনাকে খুব ঘৃণা কর, পাপকে খুব ভয় কর, গেলাম গেলাম বলিয়া তাঁর চরণে পড়ে খুব কাঁদ। এখন যত কান্না তখন তত হাসি, এখন যত ভক্তি তখন তত মুক্তি। * * *

"পিতার তো ইচ্ছা যে একেবারে খুব আনন্দ দেন, কিন্তু সন্তানের যে পাপের জন্য গ্রহণ করিতে অক্ষম। তবে যাতে পাপ যায় এস সকলে মিলে তাই করি, পাপের সঙ্গে সংগ্রাম যতই হয় এখন ততই ভাল সেই সংগ্রামে তোমার তোমাদের বড় কষ্ট হইতেছে, এক এক বার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, অনেক ভাবনা হইতেছে, ভয় হইতেছে, এ সকল আমি বিলক্ষণ বুঝিতেছি, এবং তোমাদের দুঃখে আমার বড় দুঃখ হয়, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু কি করিবে বল? যত কষ্ট হইতেছে এ সকল তিনি দিতেছেন পাপ মোচনের জন্য। তিনিই পাপকে যন্ত্রণাদায়ক করিতেছেন। এখন এই প্রার্থনা কর, যত দিন এই সংগ্রামের তরঃ

তাঁহার পবিত্র মঙ্গল চরণে পড়িয়া থাকিতে পার। যখন এই তরঙ্গ চলিয়া যাইবে, তখন মাথা উঠাইয়া চক্ষু খুলিয়া দেখিবে, কেবলই শান্তির জ্যোৎস্না এখন দীননাথের শরণাপন্ন হইয়া থাক, পরে আনন্দস্বরূপের শান্তি নিকেতনে প্রবেশ করিবে। তোমরা পাপের জন্য খুব ক্রন্দন কর, তাতে আমার তত ভয় হয় না। পাছে দীননাথের চরণ ছাড় এই আশঙ্কা। তোমাদিগকে আবার বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি তোমরা কিছুতেই তাঁর চরণ ছেড় না। এই জন্য তোমার রচিত সেই গীতটী আমার বড় ভাল লাগে, এবং তোমাদিগকেও সেইটী নিয়ত ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি, "দাঁড়াও একবার বক্ষঃস্থলে।" ভয় কি দীননাথকে সঙ্গে লইয়া চল, অগ্রসর হও, সুদিন হইবে। তোমাদের অধিক ক্রন্দন করিতে না হয় তাহা হইলেই আমি বাঁচি। আজ তাঁর কাছে এই প্রার্থনা করিয়াছি।"

শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার মহাশয়কে লেখেন ঃ—

"সেইত ধরা দিতেই হইবে, তবে কেন আর ছাড়িয়া পলায়ন কর; অবশেষে পরাস্ত হইতেই হইবে, তবে কেন তাঁহার দয়ার সহিত তোমরা সংগ্রাম কর। ঐ দেখ যত বার তোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছ, তিনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতেছেন, বলিতেছেন "আর কেন পালাও অবাধ্য সন্তানের', ধরা দেও।" আমিও তাই বলিতেছি, আর কেন? তাঁর দয়াত সামান্য নহে, সে দয়ার কাছে অবাধ্যতা কত দিন তিষ্ঠিতে পারে? এস সকলে মিলে বলি, পিতা তোমার চরণে পরাস্ত হইলাম, জানিতাম না তোমার এত দয়া। পাপী জনে এত করুণা, এ মুর্খ পামরেরা জানিত না। কেমন আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল তিনি তোমাদিগকে দেখাইতেছেন, কেমন আশ্চর্য্যরূপে মুঙ্গের ধামে তাঁহার দয়া প্রকাশিত হইতেছে। তোমাদের পরম সৌভাগ্য যে তোমরা এ সকল চক্ষে দেখিতেছ। যাহা দেখি-

তেছ তাহা মনের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস কর। প্রত্যেক ঘটনা সেই অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের এক একটী শ্লোক। প্রত্যেক দিনের ব্যাপার এক একটী পরিচ্ছেদ, সমুদয়ের মধ্যেই নিগূঢ় যোগ আছে, সমুদয়টী অভ্রান্ত সত্য, মুক্তিপ্রদ প্রত্যাদেশ বলিয়া বিশ্বাস করিলে তবে পরিত্রাণ হইবে। অগ্রে তাঁহার কথায় ও কার্য্যে বিশ্বাস, পরে মুক্তি। সমুদয় ঘটনাগুলিকে তাঁহার পবিত্র চরণের সহিত গাঁথিয়া গলার হার করিয়া রাখ, এই আমার আশীর্ব্বাদ। দীন, তুমি দীননাথের চরণে বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাক, তিনি তোমার দীনতা দূর করিবেন।"

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সেন মহাশয়কে লেখেন :—

"তোমার পত্রগুলি পাইয়াছি। শীঘ্র পুস্তকগুলি ছাপাইয়াছ তজ্জন্য ইতিপূর্ব্বে ধন্যবাদ করিয়াছি, ঈশ্বরের কার্য্যে খুব পরিশ্রমী ও উৎসাহী হও। মনের আনন্দে তাঁহার সেবা কর। তুমি সর্ব্বদা সকল ভ্রাতার পদানত হইয়া থাক এই আমার ইচ্ছা। অনেকে তোমার বিরোধী তাহা তুমি জান, তোমার ব্যবহারে অনেকে সময়ে সময়ে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন ইহা তুমি অস্বীকার করিতে পার না। এই বিরোধ তোমার পক্ষে একটী শিক্ষার ব্যাপার, তোমার দোষ কি অন্যের দোষ তাহা তোমার ভাবিবার প্রয়োজন নাই। এইটী মনে রাখিও যে দয়াময় তোমাকে এমন দলে আনিয়াছেন যেখানে তোমাকে নির্য্যাতন করিতে প্রস্তুত। ইহাতেই তোমার মঙ্গল। কেন না তুমি অত্যন্ত বিনয়ী হইয়া ক্রমে সকলকে বশীভূত করিয়া ফেলিবে। তাহারই জন্য সচেষ্ট হও। উৎসবে তোমরা খুব উপকার লাভ করিয়াছ। উৎসবের পরে তোমরা কেমন আছ তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। আর কি আবার পতন হইবে? আবার কি জ্বালাতন হইবে ও জ্বালাতন করিবে? এবার তোমাদের সকলের কাছে

চিরপ্রেম ভিক্ষা চাই। এখন তোমাদের অতি ক্ষুদ্র দল, এই সময়ে কি শীঘ্র বাঁধিয়া ফেলিতে পার না? ত্রৈলক্য আমাকে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন। আমার শুভাশীর্ব্বাদ দিয়া বলিবে যে যদি তিনি সকলের সহিত মিলিত হইয়া থাকিতে পারেন ও আর সকলে তাঁহার সঙ্গে থাকিতে চান তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই। এ বিষয়ে আমার তো কিছুই হাত নাই। সকলের অভিপ্রায় হইলেই হইল। তাঁহার কিছুতে অমঙ্গল হয় ইহা আমি ইচ্ছা করিতে পারি না।"

শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়কে লেখেন ঃ—

"সংবাদ গুলি তত মনোহর নহে। যাহাহউক সকলই আমার জানা উচিত। কিন্তু হইল কি? এত দিনে ক্ষমা সহিষ্ণুতা জন্মিবে না? আর আমার বলা বৃথা। বলাতে যদি কিছু হইত এত দিনে নিশ্চয়ই হইত। কিন্তু দেখিতেছি, আমার উপদেশে আর তত হইবার নাই। তাই এখন তোমাদের ভার তোমাদেরই হাতে। কলিকাতায় আমায় থাকিতে হইলে কেবল অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত বকা। তাহাতে সকলকে কষ্ট দেওয়া মাত্র। এখন আরামের অবস্থা হইল। উপদেশ শুনিবার লাঞ্ছনা কিছু কালের জন্য মিটিয়া গেল। আর এখন আমাকে প্রয়োজন নাই; কাহার বিশেষ অভাব বোধ হইতেছে না, এখানে আমারও হস্তে যথেষ্টই কার্য্য। এখানে নূতন সংহিতা লিখিয়া তোমাদের সেবা করিতে পারি। ঋষিভাব উদ্দীপক হিমালয় আমার পরম বন্ধু। ইঁহার আশ্রয়ে শরীর ও আত্মা উভয়ের উপকারের সম্ভাবনা। বিশেষতঃ ইটি ধর্ম্ম সম্বন্ধে বড় অনুকূল। সংহিতা প্রভৃতি নূতন নূতন সত্য ইনি অনেক আনিয়া দেন। এস্থলে কেবল সত্য ধরিতে ও লিখিতে ইচ্ছা হয়। বোধ হয় ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিবার এই স্থান। তোমরা সকলে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন মন্বাদি শাস্ত্রকার আমার হৃদয়ে

অবতীর্ণ হইয়া আমাকে সত্যাগ্নিতে প্রদীপ্ত করেন। সংহিতার প্রতি ভাইদের তত আদর দেখিতেছি না। কিন্তু শত শত বৎসর পরে সেবকের পরিশ্রম কি সফল হইবে না? এই আমার প্রত্যাশিত পুরস্কার। ব্রাহ্ম বিবাহ এবং শ্রাদ্ধের মন্ত্রাদি আমাকে খুব শীঘ্র ডাকযোগে পাঠাইবে। হিন্দু শাস্ত্রাদির কোন অংশ তোমার ভাল বোধ হয় তাহাও আমাকে লিখিতে পার। সংস্কৃত বাঙ্গালায় মূল অর্থ, পরে পরে লেখা আবশ্যক।"

অন্য সময়ে লেখেন ঃ—

"কে ১১ই মাঘের মধ্যে শুদ্ধাচার হইতে পারেন? রাগ, লোভ, হিংসা অপ্রেম দমন করিয়া কে উৎসবের পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী হইতে পারেন? এবার এই পরীক্ষা দিতে হইবে। দেখা যাউক কে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মিথ্যা আড়ম্বরে কি প্রয়োজন? ভক্তি প্রেমের ধুমধাম বাহিরে দেখাইলে কি হইবে? যে ক্ষমা না করে, যে রাগ করে, সে কি আমার লোক? যে দলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি নাই, সে দলকে কি আমার দল বলিয়া স্বীকার করি? খাঁটি লোক চাই, খাঁটি লোক দাও। আর আমার প্রতি শত্রুতা করিও না। আমার প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা করিয়া দাও পুণ্য দৃষ্টান্তের জল ঢালিয়া। এই উপকার চাই।

শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত মহাশয়কে লেখেন ঃ—

"আমার সঙ্গে যোগ আছে কি না ইহা আমার বলা ঠিক নহে। এ কথাটি তো আমার উত্তরসাপেক্ষ নহে। লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে হইবে। আমার যোগ বৈরাগ্য চরিত্র যেখানে সেইখানে আমি। আমার সহিত গূঢ় যোগ সেইখানে। এ সকল না থাকিলে ভালবাসা হইতে পারে, মায়া হইতে পারে; কিন্তু যোগ ও বিশ্বাস সম্ভব নহে। আমার দলের সমস্ত লোক এবং প্রত্যেক লোকের আমি যেমন দেবত্বের অংশ ও

ব্রহ্মাবাতরণ দর্শন করি সেইরূপ দর্শন করিতে হইবে। দল ছাড়া আমি এক জন আছি ইহা ভ্রান্তি, সুতরাং দল ছাড়িয়া আমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা কিরূপে সম্ভব হইবে? দল ও আমি এক জন, সমুদয় লইয়া নববিধান। একটি লোকের প্রতি ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা আমাকে অস্বীকার, প্রত্যেকের পদধূলি ভক্ষণ ও প্রত্যেকের মধ্যে "প্রেরিতত্বকে দর্শন ইহা ভিন্ন আমাকে পাইবার উপায় দেখিতেছিনা। রিপুগুলি ছাড়িয়া পরস্পরের হইয়া আমাকে লইতে হইবে। কে প্রস্তুত? দল ছাড়া দলপতির নিকটে আসিবার পথ নাই। অন্য পথ চোরের পথ। আমরা এক জন, আমি বিশ্বাস করি।"

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তীকে নরপূজার আন্দোলন সময়ে লেখেন ঃ—

"সত্যের জয় হইবে, সে জন্য ভাবিত হইও না; ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গলময় ধর্ম্মরাজ্য স্বয়ং রক্ষা করিবে। তোমাদের নিকটে কেবল এই বিনীত প্রার্থনা যেন বর্ত্তমান" আন্দোলনে তোমাদের হৃদয় দয়াময়ের চরণে স্থির থাকে এবং কিছুতেই বিচলিত না হয়। অনেক দিন হইতে আমার হৃদয়ের সঙ্গে তোমরা গ্রথিত হইয়া রহিয়াছ, তোমাদের যেন কিছুতে অমঙ্গল না হয় এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। অনেক দিন হইতে আমি তোমাদের সেবা করিয়াছি; এখন আমাকে অতিক্রম করিয়া যাহা বলিতে চাও বল, যেরূপ ব্যবহার করিতে চাও কর। কিন্তু দেখ যেন আমার দয়াময় পিতাকে ভুলিও না। এ আন্দোলন সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার তাহা তিনি জানেন। তিনি তাঁহার সত্য রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস আমার প্রাণ। তাঁহার চরণে তাঁহার মধুময় নামে আমার হৃদয় শান্তি লাভ করুক।"

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্রকে ইংরাজীতে লেখেন ঃ—

"প্রভুর মণ্ডলী বিপক্ষতার তরঙ্গের উপর দিয়া জয় স্রোতে ভাসিয়া উঠিতেছে এবং এখানে ও বিলাতে সকল ভাল লোকেই ফিরিয়া আসিবে। বীরত্বের সহিত যুদ্ধ কর, প্রার্থনা সহকারে যুদ্ধ কর, আমাদের প্রিয় নববিধান মণ্ডলীর জন্য সর্ব্বান্তকরণে যুদ্ধ কর এবং পবিত্রাত্মা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। আমার প্রিয় প্রতাপ, অগ্রসর হইও, ভীত হইও না, কম্পিত হইও না। আমরা লজ্জাস্কর পরাজয়ের জন্য স্থষ্ট হইনাই, কিন্তু গৌরবান্বিত জয় লাভের জন্য হইয়াছি। আমরা হারিব? তাহা হইতে পারে না। কলিকাতা হইতে ভ্রাতৃমণ্ডলীর মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদের সংবাদ ক্রমাগতই আসিতেছে। কিন্তু ইহা আমার মণ্ডলীর পক্ষে কিছুই নয়। ইহা ভবিষ্যৎ মহাফলের প্রতিরোধ করিতে পারিবেনা। মানুষের পাপ কি ঈশ্বরের কার্য্যকে ব্যর্থ করিতে পারে? আমি সতর্ক করিতে ও তিরস্কার স্বরূপে যথেষ্টই বলিয়াছি, কিন্তু সকলই বৃথা। তুমি কি মনে কর এই ময়লা আমি সর্ব্বদা ঘাটিব?"—(অনুবাদিত।)

শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর দাস কবিরাজ মহাশয়কে লেখেন ঃ—

" 'ঘরে ফিরে যেতে মন চাহে না যে আর।' সে এক ভাব আর এ এক ভাব। কলিকাতায় কি আকর্ষণ আছে? দেখা যাউক আছে কি না। যদি না থাকে সর্ব্বনাশ। মনে হইল যেন আমার দল বিষ্ঠা ভিক্ষা করিতেছে। ছি ছি ছি ছি! বলে কাপড় দাও, টাকা দাও, মান দাও, উচ্চপদ দাও, বাহবা দাও, বাহাদুর উপাধি দাও। অর্থাৎ বিষ্ঠা দাও। আমি দিতে পারিব না, দিব না। এই জন্য আমাকে কলিকাতা যাইতে বল। কোটী টাকার সোণার স্বর্গ দিয়াছি। এখন ময়লা দিব কি লজ্জার কথা।"

অন্য এক প্রচারক মহাশয়কে লেখেন ঃ—

"শুভাশীর্ব্বাদ,—এত প্রহার ও উৎপীড়ন কেন? আমি গেলাম যে! অক্ষমা, হিংসা, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা পরস্পরের প্রতি উদাসীনতা আমাকে মারিয়া আধমরা করিয়া খাটে ফেলিয়া আবার তার উপর মারিতেছে, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। এত অত্যাচার কেন? আমি কি দোষ করিয়াছি? পরস্পরকে খুব শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ও বিশ্বাস না দিলে আমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত। আমি শুনিতে চাই প্রত্যেকে বলুন ভ্রাতাতে মন একেবারে মাতিয়াছে, না দেখিয়া থাকিতে পারি না, বুকের রক্ত বলিয়া প্রত্যেককে বোধ হইতেছে, যেন গলাগলি প্রণয়, একটু আত্মপর ভেদ নাই, সকলে এক প্রাণ হইয়া স্বর্গরাজ্যে বাস করিতেছে, কেহ কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট নহেন। আমার ফিরিবার পূর্ব্বে কে এই কথা বলিতে পারেন?"

নিম্নলিখিত কয়েকখানি পত্র কয়েকজন অনুচরকে লেখেন ঃ—

"প্রিয় কাশীরাম,—তোমার অন্তরস্থ আলোককেই বিশ্বাস করিবে ও অনুসরণ করিবে এবং প্রার্থনা ও ব্যাকুলতা সহকারে ঈশ্বরেরই আদেশ অন্বেষণ করিবে। কোন পুস্তক বা কোন মানুষই তোমাকে আলোক দিতে পারিবে না। কেবল স্বর্গস্থ প্রভুর দিকে চাহিয়া থাক।—(অনুবাদিত।)

"আমার পিতার বন্দোবস্ত মত কাজ না হইলে আমি কি করিয়া সুস্থ হইতে পারি? যদি আমার স্রষ্টার সহিত শান্তিযুক্ত না হই আমি বড়ই দুর্ভাগ্য। আমি সংসারের সম্বন্ধে বড়ই দুঃখী ও অসুখী এবং তুমি জান আমাকে অগ্নিতে বাস করিতে হয়। কেবল আমার পিতার প্রসন্ন মুখই আমাকে সমুন্নত করিয়া রাখে ও আনন্দিত করে।—(অনুবাদিত।)

"প্রিয় প্রিয়,—তোমার ক্রমাগত অসুখের সংবাদ শুনিয়া আমি সত্যই ভাবিত। আমি তোমার বিষয় অনুসন্ধান করিতেছিলাম এমন সময় তোমার পত্র আসিল। ইহাতেই কিছু আশ্বস্ততা দিল। আশাকরি দেশীয় ঔষধে তোমার উপকার হইবে। কিন্তু তোমার যাহা প্রয়োজন তাহা ঔষধ নয়, কিন্তু বিশ্রাম। সকল প্রকার ভাবনা ও মস্তিকের কাজ ছাড়িয়া দাও এবং ব্যায়াম, নির্ম্মল বায়ু সেবন ও বলকর পথ্যাহার করিলে শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিবে। আমার এ সম্বন্ধে যথেষ্টই অভিজ্ঞতা আছে এবং তোমাকে বিশ্বস্ততার সহিত পরামর্শ দিতে পারি। বিশ্রাম, বিশ্রাম, বিশ্রাম ছাড়া কিছুই নয়।

সর্ব্বোপরি তোমার অন্তরকে অবিচলিত এবং আত্মাকে স্থির রাখিবে। অবসন্ন হইবে না, শান্তিবিহীন বা নিরাশ হইবে না। রোগ যে পরীক্ষা, এবং ঈশ্বর জানিতে চান আমরা কিরূপে তাহা বহন করি। যাঁহাদিগকে তিনি অধিক ভাল বাসেন তাঁহাদিগকেই তিনি অধিক পরীক্ষা করেন। সুতরাং আমাদের অনুযোগ বা দুঃখ করিবার কারণ নাই। দুঃখের দণ্ডতলে যেন আমরা অবনত হই ও তাহাকে চুম্বন করি। পরীক্ষা এবং কষ্টের মধ্যে সহিষ্ণু নির্ভরশীল জীবন যাপন করিয়া আমাদের পিতার প্রেমের সাক্ষ্যদান করিতে পারা আমাদের সৌভাগ্য। আমরা কি অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াও তাঁহাকে মহিমান্বিত করিতে পারি না? আমাদের ন্যায় অনুগত ভক্ত সন্তানদিগের নিকট ইহাই তিনি চান। আমরা অন্য লোকের মত হইব না। আমরা যেন পরীক্ষা দ্বারায় উপকার লাভ করি। রোগ এবং দুঃখের বিদ্যালয়ে আমরা যেন শিক্ষা, আনুগত্য এবং চিরন্তন শান্তি লাভ করি। প্রভু পরমেশ্বর এখন এবং চিরদিন তোমার [illegible] এবং [illegible] হউন।"—(অনুবাদিত।)

অন্য এক অনুগতকে লেখেন ঃ—

"শুভাশীর্ব্বাদ, তোমাকে ভালবাসি তাহা তুমি জান। তুমি যে দীন তাহা আমি জানি। কিন্তু স্বর্গরাজ্য দীনেরই জন্য। দুঃখীজনেরই ত মজা ধর্ম্ম-রাজ্যে। দীননাথের খেলা দীন ভিন্ন কে বুঝিবে? দীনবন্ধু নামের সুধা দীন ভিন্ন কে আস্বাদন করিতে পারে? আমি দীন দরিদ্র বিশ্বাসী-দিগের পক্ষপাতী! আমি তাঁহাদেরই সেবক। ছিন্নবস্ত্র যাঁহাদের তাঁহারাই আমার প্রভু, তাঁহারাই আমার চক্ষের অঞ্জন ও হৃদয়ের ধন। যাঁহারা প্রাণেশের প্রেমে দীনতাব্রত লইয়াছেন তাঁহারাই আমার শরীরের রক্ত। ধন্য দীনাত্মা।"

প্রেরিত মহাশয়দিগের চিরমিলনের উপায় ব্যবস্থা।

শ্রীব্রহ্মানন্দ নানা স্থানে বলিয়াছেন যে যাঁহাদের স্থির নীতিতে আনু-গত্য অটল, এবং যাঁহাদের এক ঈশ্বর, এক ধর্ম্ম ও এক নীতি তাঁহারাই চিরমিলনে মিলিত হন। এই নিমিত্ত প্রেরিত মহাশয়গণ যাহাতে কয়েকটী স্থির নীতি অবলম্বনে চির ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে নববর্ষ দিনে ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে নিম্নলিখিত ঘোষণা জ্ঞাপন করেন ঃ—

"অদ্য নববর্ষের প্রথম দিনে দয়াসিন্ধু পরমেশ্বরকে নমস্কার করিয়া, সমস্ত পরলোকবাসী সাধু মহাত্মাকে নমস্কার করিয়া উপস্থিত অনুপস্থিত সমুদয় ভ্রাতৃগণকে, প্রেরিতবর্গকে ঈশ্বরের আদেশানু-সারে ঘোষণা করিয়া এই জ্ঞাপন করা হইতেছে যে, এই নববর্ষের প্রথম হইতে বৈরাগ্য, প্রেম, উদারতা ও পবিত্রতার মহাব্রত গ্রহণ করিতে হইবে।

বৈরাগ্যের নিয়ম পূর্ণ ভাবে পালন করিবার জন্ত ঈশ্বরের আদেশ হইয়াছে। সমস্ত সাংসারিক চিন্তার হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে হইবে। আহার ও পরিধান সম্বন্ধে কোন ভাবনাই থাকিবে না। তোমরা নিজে স্বর্ণ রৌপ্য অন্বেষণ করিতে পার না। ঈশ্বরের হস্ত হইতে সাক্ষাৎ ভাবে যাহা আসিবে, তাহাই গ্রহণ করিতে পারিবে। এতদিন কিয়ৎ পরিমাণে প্রচারভাণ্ডারের উপর নির্ভর করিতে, আবার কিয়ৎ পরিমাণে পরকীয় সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে, এখন হইতে আর তাহা হইবে না।

"এতদিন তোমরা কঠোর বৈরাগ্য ব্রত পালন করিতে, কিন্তু তোমাদের পত্নীরা স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতেন, তোমাদের স্ত্রীরাও তেমনি অপরের দান গ্রহণ করিবেন না। তোমাদের পত্নীদিগকে বৈরাগ্য পথের সঙ্গিনী করিয়া লও। প্রচারক পরিবার বৈরাগী ও বৈরাগিণীর পরিবার হইবে; সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর পরিবার হইবে। তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা অন্ন অর্থ স্পর্শও করিবে না। বৈরাগী স্বামী ও সংসারাসক্ত স্ত্রীর মিলন হইতে পারে না। এক জন ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিবেন, অন্তজন সংসারের ধন খুঁজিয়া বেড়াইবেন, ইহা কোন ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে।

"এই স্থান হইতে সমস্ত সাহায্যকারী দাতাদিগকেও ঘোষণা করা যাইতেছে, আমাদের প্রেরিত প্রচারকদিগের হস্তে তাঁহারা একটি পয়সাও অর্পণ করিবেন না। যাহা কিছু দিতে হইবে এই স্থানে অথবা প্রচারভাণ্ডারে অর্পণ করিতে পারিবেন। উঁহারা দিবেন না, লইবেন না। ভাণ্ডারীর হস্তে সমস্ত ধন আসিবে। কোন বিশেষ বন্ধু কোন বিশেষ বন্ধুর জন্তও দান করিতে পারিবেন, কিন্তু ভাণ্ডারীই তাহা গ্রহণ করিবেন। ভাণ্ডারীর হস্তেই তাহা দিতে হইবে। প্রচারকেরা ধন চাহিবেন না, ধন লইবেন না কিন্তু [illegible]

আরও ধন আসুক, কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। ভাণ্ডারপতি স্বয়ং ঈশ্বর, ভাণ্ডারের উপরে যাহারা নির্ভর করে, তাহাদের মুখ কখন শুষ্ক হয় না, বালক বালিকাগণ দৈন্যসাগরে ডোবে না। পবিত্রাত্মা সেখানে বিতরণ করেন।

কন্যাকার জন্য চিন্তা বন্ধ করিয়া দাও; বৈরাগী ও সন্ন্যাসী হয়। বৈরাগ্যের পূর্ণ উজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রকাশিত হউক। প্রত্যেকে বৈরাগী হইয়া সহধর্ম্মিণী সহ বৈরাগ্যব্রত সাধন কর। এত দিন বিরোধী ছিলেন স্ত্রী; এখন দুই জনে একত্র হইয়া অর্থ পিপাসা পরিত্যাগ করিয়া, ধনলোভ অপবিত্র জানিয়া পৃথিবীর শাস্ত্রেতে জলাঞ্জলি দিয়া, পতিপত্নী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী হইয়া বাস কর। নববর্ষের এই নব নিয়ম।

"দ্বিতীয় নিয়ম ভালবাসা। পরস্পরে প্রেম কর। কলহ বিবাদ পরিত্যাগ কর। যদি ভয়ানক কলহ বিবাদের কারণ আসে, লিখিয়া দরবারে উপস্থিত করিতে হইবে, মুখে উপস্থিত করাও হইবে না। প্রশ্ন লিখিয়া দরবারে দাও, পবিত্রাত্মা তাহার উত্তর দিবেন। এতদ্ব্যতীত লঘু বিষয় সকল প্রেমের দ্বারাই মীমাংসিত হইবে। কোটী কোটী কারণ অন্যপক্ষে থাকিলেও পরস্পরে প্রেম করিবে। কোন বিষয়ে মতে না মিলিলেও প্রেম করিবে। তোমাদের প্রেমের কীর্ত্তিস্তম্ভ যেন পৃথিবী দেখিতে পায়। ভালবাসার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখাইবে। প্রেমের অভূত-পূর্ব্ব উদাহরণস্থল হইবে। প্রেমের ভিতরে ক্ষমা সহিষ্ণুতা থাকিবে। প্রেম দোষ ভুলাইয়া দেয়। প্রেম উৎপীড়ন সহ্য করে। প্রেম শত্রুর সহিত এক ঘরে বাস করে। এইরূপ প্রেমে প্রেমিক হইয়া নববিধানে কত প্রেম, তাহাই পৃথিবীকে দেখাও। যেখানে যাইবে, প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইবে।

"তৃতীয় নিয়ম উদারতা। সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সমন্বয় হইয়া উদার ভাব প্রদর্শিত হইবে। কোন বিশেষ সম্প্রদায় আর

থাকিবে না। ঈশা মুষা প্রভৃতি তোমাদের উপর নির্ভর করিয়া আছেন। সকলকে সম্মানিত করিবার জন্য তোমরা নববিধান কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছ। ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ভাব ত্যাগ কর। এই যুগে ঈশা মুষা শাক্য গৌরাঙ্গের সম্মান বাড়িল, এই যেন দেখা যায়। উদার হইয়া উদার ধর্ম্ম পরিপোষণ কর। উদার ধর্ম্মেতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ কর। প্রেরিতগণ! কোন সত্য ছাড়িও না। এই উদ্দেশ্যে এক এক বিষয়ের বিশেষ ভাব গ্রহণ করিয়া প্রদর্শন করিবার জন্য বলা যাইতেছে। সকল দেবদেবীর ভাব সুরক্ষিত হইবে বিশেষ বিশেষ রক্ষকের দ্বারা। এক এক মুনির হাতে এক একটি রত্ন অর্পণ কর; এক এক ধর্ম্মরাজ্য এক এক দেবকুমারের হস্তে ন্যস্ত কর। এক এক ভিন্ন ভাবের প্রতিনিধি এক এক জন বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হউন। এক এক জন এক এক ধর্ম্মের সমস্ত ভাব গ্রহণ ও বিতরণের ভারগ্রস্ত হউন। দেখাইতে হইবে, আমাদের বাড়ীতে সমস্ত দেবদেবীরই আদর, সমস্ত মিলিয়া একটি দেহ; এক এক প্রেরিতের দ্বারা একটি একটি অঙ্গের পূর্ণতা হইল; সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিলনে নববিধানে পূর্ণধর্ম্ম প্রকাশিত। এই প্রকার উদারতাকে আহ্বান করিতেছি। নববর্ষে সঙ্কীর্ণতা যেন আর না থাকে।

"চতুর্থ এবং শেষ প্রত্যাদেশ পবিত্র হও, শুদ্ধ হও। নীতিকে অমান্য করিও না। ধর্ম্মের উচ্চসাধন করিতে গিয়া নীতির প্রতি উদাসীন হইও না, যোগ করিতে গিয়া দুর্নীতি পরায়ণ হইও না, ভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া নীতি উল্লঙ্ঘন করিও না। রসনাসম্বন্ধীয় নীতিতে, আনুষ্ঠানিক নীতিতে, চিন্তার নীতিতে, চক্ষের নীতিতে, শ্রবণের নীতিতে, সমুদয় নীতিতে আপনাদিগকে সমুজ্জ্বলিত কর। অঙ্গে নীতি, হৃদয়ে নীতি; ক্রমাগত নীতি সাধন করিয়া পৃথিবীকে বুঝাইয়া দাও,

নববিধান সাক্ষী, ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গ সাধন করিতে গেলে নীতি চলিয়া যায় না। ঘর সাজান, দ্রব্যাদি যাহাতে নষ্ট না হয়, খরচ যাহাতে ঠিক হয়, বাক্য সুমিষ্ট হয়, ব্যবহার পবিত্র হয়, কথাগুলি ঠিক সত্যের সঙ্গে মিলে, বিধবা অনাথদের প্রতি যাহাতে ঠিক কর্ত্তব্য করা হয়, এই সকল বিষয়েই নীতিকে বিশেষ ভাবে রক্ষা করিতে হইবে। প্রেরিতগণ! দেখাও বড় বড় প্রশংসনীয় কার্য্যে তোমরা যেমন সুনিপুণ, ছোট ছোট কার্য্যে-তেও সেইরূপ। বড় বড় বিষয়ে বিচার কর, উত্তীর্ণ হইবে; ছোট ছোট বিষয়ে পরীক্ষা কর উত্তীর্ণ হইবে, এই কথা প্রমাণ করিয়া ব্যক্ত কর।

বৈশাখের প্রথম দিবসে তোমরা এই চারি লক্ষণের সাক্ষী হও; সমস্ত বৎসর তোমাদের মধ্যে এই চারি নিয়মের সাধন ও পালন দর্শন করিবে। প্রেরিত প্রচারকেরা এই ব্রত গ্রহণ করিলেন, প্রেরিত দরবার সমক্ষে এক বৎসরের জন্য। পরম দেবতা সহায় হউন। তাঁহার সমক্ষে তাঁহার অনুচর পিতার সন্তানগণের সমক্ষে গলায় বস্ত্র দিয়া প্রেরিতেরা যে ব্রত গ্রহণ করিলেন, তাহার ফল দেখিবার জন্য ভারত আশা করিয়া থাকিল; পৃথিবীও আশা পথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিল।"

নববিধানের মুখ্য উদ্দেশ্য,—সুখীপরিবার, সুখীদল; বিধানের আদর্শচরিত্র, দৈনিক সাধন।

শ্রীব্রহ্মানন্দ বলেন "নববিধানের মুখ্য উদ্দেশ্য পরিবার গঠন।" এক সুখী পরিবার এবং এক সুখী দল গঠনই নববিধানের প্রধান উদ্দেশ্য। বাস্তবিক নববিধান আমাদের সুখের শান্তির বিধান। এই জন্য ইহার প্রবর্ত্তক বিধাতারই বিধানে "ব্রহ্মানন্দ" নামে অভিহিত হইলেন

ও ব্রহ্মেতে যাঁর আনন্দ এবং ব্রহ্ম যাহাতে আনন্দিত সেই ব্রহ্ম নন্দময় জীবনে ভূষিত হইয়া জগজ্জনকে ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগের পা দেখাইলেন। সুতরাং তাঁর দল যাহাতে হরিসুখে সুখী পরিবা ব্রহ্মেতে আনন্দিত দল হয় ইহাই তিনি প্রার্থনা করিলেন। তা বলিলেন :—

"হে প্রাণের বন্ধু, জগতের প্রতিপালক, এই পৃথিবীতে পরিবার লই সুখী হওয়া ধর্ম্মের প্রধান তাৎপর্য্য। তোমার অভিপ্রায় এই, আম সাধন করিয়া একটি শান্ত সুখী পরিবার লইয়া সুখী হইব। তো নববিধানের মুখ্য উদ্দেশ্য, পরিবার প্রস্তুত করা। তোমার ইচ্ছা এ স্বামী এবং স্ত্রী, মাতা এবং পিতা, ভাই এবং ভগিনী একটী নবভাব লা পৃথিবীতে জীবন কাটাইবেন। এমন ভাবে ধর্ম্মেতে পরিবারের মি হয় নাই, যেমন নববিধানে হইবে।

"মানুষ পরিবারের সুখে সুখী হইবে এমন ভাব পৃথিবীতে হয় ন সমুদয় ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সর্ব্বত্যাগী হইয়া অনেকে বৈরাগী হইয়াছে এ পথ অনেকে দেখাইয়াছেন, অনেক মহাপুরুষ তোমার এই আজ্ঞা প করিয়াছেন। তাঁহারা পরিবার লইয়া যে সুখী হইবেন, পাঁচজন বান্ধব লইয়া সামাজিক সুখে সুখী হইবেন তাহা তুমি তাঁহাদের ' না। তাঁহারা সর্ব্বত্যাগী হইয়া বাঘের ছালে বসিয়া অরণ্যে যে সাধনে বসিলেন। তাঁহারা সকল দুঃখ বহন করিয়াও, প্রাণেশ্বর, যে আদেশ পালন করিলেন। কত কষ্ট তাঁহাদের পাইতে হইয়াছিল।

"হে করুণাসিন্ধু, এখনকার সাধকদেরত সে কষ্ট নাই! ট টাকার ভাবনা ভাবিতে হয় না; স্ত্রী পরিবার গৃহ বন্ধু সব আছে তাঁহাদের দুঃখ ছিল, আর কি সুখই আমাদের! কিছুরই অভাব

আমাদের কিছুরই কষ্ট নাই। মাতঃ, নববিধানের ভক্তকে পালন করিবার জন্য তোমার বন্দোবস্ত এই।

"মা, তুমি এবার সুখ দিবে। কেননা পরিবারের সুখ যে অতি মিষ্ট সুখ। ভাই বন্ধু পরিবার লইয়া তোমাকে ডাকা যে বড় সুখ। এবার সুমিষ্ট সুখের সজন সাধন। এ ত পরিবার গৃহ সুখ সম্পদ ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন সাধন নয়।

"কিন্তু হরি, আমাদের দায়ীত্ব অনেক। আমাদিগকে সুখী পরিবার দেখাইতে হইবে; বাপেতে ছেলেতে, মাতে মেয়েতে, ভাই ভগিনীতে খুব ধর্ম্মের মিলন, ধর্ম্মের বন্ধন, খুব সৌহৃদ্য, এরূপ হইতে হইবে। কেবল অসার সংসারস্থাপন করিলে হইবে না, পূর্ব্বকালে তাঁহারা গৌরবের মুকুট পরিলেন বটে, কিন্তু সে দুঃখ পাইয়া। তাঁহারা স্ত্রী পরিবার সব ছাড়িয়াছিলেন।

"আর আমাদিগকে তুমি কত সুখ দিলে। অভাগাদের সৌভাগ্য হইল। আমরা স্ত্রী পরিবার সমুদয় লইয়া ধর্ম্ম সাধনে সুখী হইবার অধিকার পাইয়াছি। হরি, এ ঋণ কিসে পরিশোধ হইবে? স্ত্রীপুত্র সমুদয় একটি একটি করিয়া তোমার চরণে সমর্পণ করিতে হইবে। আপনারত সমুদয় লিখিয়া পড়িয়া তোমাকে দিতে হইবে। আবার স্ত্রী সন্তান সকলকে ষোল আনা তোমাকে দিতে হইবে। বড় ছোট সকলকে একটি একটি করিয়া তোমার চরণে দিব। মা, তবেত এ ঋণ শোধ হইবে, প্রাণে শান্তি হইবে।

"আমরা সমুদয় গুলি তোমার ভক্ত হইব। তোমার সাধনভক্ত, তোমার দর্শনভক্ত হইব, তোমার নববিধানভক্ত হইব। তোমার ছেলে

গুলি মেয়েগুলি এক্ষানি অখণ্ড পরিবার হইবে। একখানি সচ্চিদা-নন্দের পরিবার হইবে। সকল গুলি তোমার হইবে।

"নববিধানের সুখের পরিবার গঠন কর একটি একটি সুখের জ্যোতির্ম্ময় পরিবার তুমি চাও। তাহাই দিতে হইবে। আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন দুষ্ট অভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া নববিধানের মূল সঙ্কল্প সাধন করিয়া এক একটি সুখী পরিবার, শুদ্ধ পরিবার হইতে পারি।"—দৈঃ প্রার্থনা ৭ম, 'সুখী পরিবার।'

বাস্তবিক এই এক অখণ্ড সুখী পরিবার বা সুখী মানব দল গঠন করিতেই নববিধান অবতীর্ণ। ব্রহ্মানন্দ প্রেরিতমহাশয়দিগকে লইয়া তাহাই করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে উদ্দেশ্য সাধন না হইলে নব বিধান পূর্ণই হইবে না।

তিনি আরো প্রার্থনায় বলেন :—

"হে প্রেমময়, আগেকার চেয়ে আমাদের নিকট হয়েছ, আগেকার লোকদের চেয়ে তুমি আমাদের কাছে স্পষ্টতর রূপে প্রকাশ হইলে তুমি নিকট হইলে এজন্য তোমায় খুব ধন্যবাদ করি। তুমি নিরাকার হইয়াও সাকারকে লজ্জা দিলে, পুরাতন লক্ষ্মী অপেক্ষা নূতন লক্ষ্মী উজ্জ্বলতর রূপে আমাদের গৃহে রহিয়াছেন, ইহার জন্য যেন তোমার পদারবিন্দে কৃতজ্ঞতা দিই। পরমেশ্বর, এই সকল সুখের জন্য আমরা তোমার নাম দেশ বিদেশে ঘোষণা করিব।

"তোমার নাম কীর্ত্তন হইল, নগর কীর্ত্তন হইল, কিন্তু এ কথা পৃথিবীতে প্রচার হয় ইচ্ছা করে যে, আমরা কখন দুঃখ পাই নাই। লোকে জানুক একটা দলের শরীরে কখন দুঃখের কাঁটা লাগে নাই, তাহারা দিন দিন উপাসনা করিয়া সুখী এবং প্রশান্ত হইয়াছে। যাহারা বারম্বার পরীক্ষি

হইয়াও, পরীক্ষা বিপদে পড়িয়াও, কষ্ট পাইল না, ঘোর অন্ধকারের মধ্যে যাহাদের হৃদয়ে পূর্ণ চন্দ্রের আলো, যাহারা দুঃখের ভিতরও সুখী, যাহাদের হৃদয়ে নিত্যানন্দের বাগান, শান্তি যাহাদের ভিতর খেলা করে।

"সুখী কে ? না যে নববিধানবাদী। দয়াসিন্ধু, যদি এমন সুখের ধর্ম্ম আনিয়া দিলে, তাহা হইলে নবীন কথা ইচ্ছা হইতেছে, মা, খুব উৎসাহের সহিত প্রচার করি। এই পাড়ার কাহারো মনে কষ্ট হইতে পারে না। কাহারো দুঃখ থাকিতে পারে না। মনের কষ্ট শরীরের কষ্ট, খাবার পরিবার কষ্ট—একথা যে বলে, আমরা খাঁড়া লইয়া সে কথার প্রতিবাদ করিব। আমাদের কষ্ট নাই, দুঃখ কখনও এ জীবনে পাই নাই।

"শান্তিতে হৃদয় পূর্ণ, কোন বিষয়ে দুঃখ আমাদের নাই। বাড়ীটী সুখের বাড়ী, বন্ধুগুলি সুখের বন্ধু, ধর্ম্ম সুখের ধর্ম্ম, সমুদয় সুখের সংযোগে সকলই প্রস্তুত। যে দেবীর মুখ দেখিলে প্রাণ শান্তি সলিলে ডুবিয়া যায় সেই মুখখানি দেখাইয়া ফেলিয়াছ। দয়াল, যা করেছ সকলই চূড়ান্ত ব্যাপার করেছ।' ভাল! সুখের স্বর্গে বসাইয়াছ যদি তবে সুখের সমাচার, এবারকার মথি লিউকেরা প্রচার করুন।"—দৈঃ প্রার্থনা ৬ষ্ঠ, 'সুখের সমাচার।'

প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বাস করিতে হইলে ইহাই বিশ্বাস করিতে হয় যে আমাদের আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম নিত্য আনন্দই বিধান করেন, সুতরাং যাহা কিছু তাঁর বিধান তাহা আনন্দেরই বিধান। কাজেই এ বিধানে বিশ্বাস করিতে হইলে সকল অবস্থাতেই আনন্দ ইহাই উপলব্ধি করিতে হয়। ব্রহ্মানন্দও নিজ জীবন দ্বারায় ইহাই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহর্ষি ঈশার ধর্ম্ম পূর্ণ করিতেই ব্রহ্মানন্দের আগমন, তাই তাঁকে অন্তর খ্রীষ্ট বর্হি ব্রহ্মানন্দ বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছি।

তবে কিরূপে পৃথিবীর ক্রুশ, দুঃখ বহন করিতে হয়, মহর্ষি ঈশা জীবা
ইহাই দেখাইয়াছেন, তাই তাঁহাকে কেহ কখনও হাসিতে দেখে না
এবং সেই জন্য দুঃখের অবতার (Man of Sorrows) নামেই তি
অভিহিত; কিন্তু সংসারের দুঃখ এমন কি মৃত্যু যন্ত্রণাতেও কে
করিয়া আনন্দিত হওয়া যায় ইহা ব্রহ্মানন্দই জীবনে দেখাইলেন। মৃ
যন্ত্রণাতেও হাসিয়া বলিলেন "আমার সঙ্গে মা খেলা করিছেন?" তি
"প্রকৃত বিশ্বাস" পুস্তকে কতদিন পূর্ব্বে লেখেন "মৃত্যুশয্যাতেও বি
হাস্য মুখ," কার্য্যতঃও তিনি, তাহাই কি অপূর্ব্বভাবে দেখাইলেন। পৃথি
এ দুঃখ দেহের মৃত্যু যে কিছুই নয় তাই দেখাইয়া পূর্ণ যোগা
ব্রহ্মানন্দ কিরূপে মানব জীবনে সম্ভোগ করিতে হয় তাহাই প্র
করিলেন। সংসারের দুঃখ কষ্ট কেবল যে সহ্য করিতে পারি
মানব জীবনের পূর্ণতা হইল তাহা নহে। দুঃখ কষ্ট মৃত্যুতেও যদি ব্র
আনন্দ মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দে পূর্ণ হইতে পারা যায় তবেই ইহ জী
স্বর্গের সুখ সম্ভোগ হইল। ব্রহ্মানন্দ তাহাই দেখাইয়া যথার্থ ব্রহ্মানন্দ
ধন্য হইলেন এবং ধর্ম্মবিধান পূর্ণ করিলেন। কারণ ঈশার দুঃখ সহ্য ক
ভাবও অভাবাত্মক, ব্রহ্মানন্দের দুঃখে আনন্দ সম্ভোগই ভাবাত্মক ভা

এক্ষণে এই জীবন লাভ করিতে হইলে কি আদর্শ অবলম্বনে
সাধন করিতে হয় ব্রহ্মানন্দ নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"নববিধান বিশ্বাসীগণ নববিধানের এই আদর্শ চরিত্র সর্ব্বদা চক্ষের স
রক্ষা করিবেন এবং নিত্য উপাসনা কালে ইহা স্মরণ করিয়া এরূপ আ
জীবন গঠনে সচেষ্ট হইবেন :—"আমি নারীকে দেবকন্যা জানিয়া শ্রী
সম্মান করি এবং তাঁহার সম্বন্ধে কোন প্রকার অপবিত্র চিন্তা নাই কা

"আমি আমার শত্রুদিগকে প্রীতি এবং ক্ষমা করি এবং কোন প্রকারে উত্যক্ত হইলে রাগ করি না।

"আমি অন্যের সুখে সুখী হই এবং আমি হিংসা বা ঈর্ষা করি না।

"আমি নম্র স্বভাব আমার অন্তরে কোন প্রকার অহঙ্কার নাই। কি পদের, কি ধনের কি বিদ্যার, কি ক্ষমতার, কি ধর্ম্মের অহঙ্কার।

"আমি বৈরাগী, আমি কল্যকার জন্য চিন্তা করি না; আমি পার্থিব ধন অন্বেষণ করি না বা স্পর্শও করি না, কেবল যাহা বিধাতার নিকট হইতে আসে তাহাই গ্রহণ করি।

"আমি আমার উপর যাহাদিগের কর্ত্তৃত্ব-ভার আছে সাধ্যানুসারে তাহাদিগের সেবা করি। আমি আমার স্ত্রী এবং সন্তানদিগকে পবিত্রতা এবং ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করি।

"আমি ন্যায়বান্ এবং প্রত্যেককে তাহার প্রাপ্য প্রদান করি। আমি যথা সময়ে দ্রব্যাদির মূল্য এবং লোকের বেতন প্রদান করি।

"আমি সত্য বলি, সত্য বই কিছু বলি না এবং সকল প্রকার মিথ্যাকে ঘৃণা করি।

"আমি দরিদ্রদের প্রতি দয়ালু এবং দুঃখ মোচনে ব্যাকুল। আমি আমার সঙ্গতি অনুসারে দাতব্যে সাহায্য দান করি।

"আমি অপরকে ভালবাসি এবং মানব জাতীর কল্যাণ সাধনে সর্ব্বদা যত্ন করি। আমি স্বার্থপর নই।

"আমার হৃদয় ঈশ্বর এবং স্বর্গীয় বিষয়েতে সংস্থাপিত। আমি সংসারাসক্ত নই।

"আমি এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, এবং সম্পূর্ণরূপে পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করি।

"আমি সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করি এবং কোন প্রকার জাতীভেদ স্বীকার করি না।

"আমি সকল সম্প্রদায় এবং সকল শাস্ত্রের সত্যকে সম্মান করি এবং গ্রহণ করি এবং আমি সাম্প্রদায়িকতারূপ পাপের অতীত। আমি বিশ্বাস করি যে সত্য এবং পবিত্রতা কোনও মণ্ডলী বিশেষের নিজস্বরূপে নিবদ্ধ নহে।

"আমি ঈশ্বরের সকল বিধানে এবং যাঁহাদের ভিতর দিয়া ঈশ্বর সময়ে সময়ে তাঁহার বাণী প্রেরণ করিয়াছেন সেই সকল সাধু ভক্তদিগকে বিশ্বাস করি।

"আমি বিজ্ঞানকে ঈশ্বরালোক বলিয়া বিশ্বাস করি এবং যাহা কিছু অবৈজ্ঞানিক তাহাকে ঘৃণা করি।

"আমি সর্ব্বসমন্বয়কারী নববিধান ধর্ম্মের প্রেম, যোগ, বৈরাগ্য, জ্ঞান, কর্ম্মরূপ বিভিন্ন অঙ্গ সর্ব্বদা সাধন করি এবং ইহার কোন অঙ্গকে উপেক্ষা করিয়া কোন একটী অঙ্গকে বিশেষত্ব দিই না।

"আমি যিশু এবং অন্যান্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের অনুগতভক্ত। তাঁহাদিগের প্রতি বিশ্বাসে আত্মীয়ের অনুরক্তি এবং ভক্তি সংযুক্ত।

"আমি আপনাতে এবং জগতে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়রূপ ধর্ম্ম বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করি।

"আমি আমার ঈশ্বরকে দেখিয়াছি এবং তাঁহার বাণী শুনিয়াছি এবং তাঁহাতেই আমি অত্যন্ত আনন্দিত।"

ইংরাজী নববিধান পত্রে ব্রহ্মানন্দ যাহা লেখেন, তাহা হইতেই আমরা উপরোক্ত বিষয়টী অনুবাদ করিয়া দিলাম। প্রেরিত মহাশয়দিগকে এক সময় যে ব্রত দান করেন তাহাতে ইহার কিয়দংশ মাত্র বাঙ্গালায় লিখিয়া

প্রতিদিন পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ইহাও বলিতে হইত যে "আমি প্রত্যেক প্রেরিত ভ্রাতাকে আপনার বলিয়া খুব ভালবাসি এবং সম্মান করি। এবং এই দল মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য আমি সর্ব্বদা ব্যাকুল ও যত্নবান।" ইংরাজীতে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে এ কথাটী নাই। যাহাহউক প্রেরিত মহাশয়গণ ও মণ্ডলীর ভ্রাতৃগণ এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে এ মণ্ডলী কি আর বিচ্ছিন্ন হইতে পারে এবং এই প্রতিজ্ঞামত সকলে কার্য্য করিলে এই মণ্ডলী এক অখণ্ড মণ্ডলীতে পরিণত হইতে কি আর বিলম্ব হয়।

নববিধানের এই আদর্শ জীবন লাভাকাঙ্খীর কিরূপ দৈনিক সাধন অবলম্বন করা উচিত, ব্রহ্মানন্দ সংক্ষেপে নববিধান পত্রে এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—"প্রত্যুষে ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে। শরীরকে ঈশ্বরের মন্দির জানিয়া ব্যায়াম দ্বারায় বল সঞ্চয় করিবে। পরিত্রাত্মার দ্বারায় পুত্রত্বের ভিতর দিয়া পিতৃত্বে জলসংস্কার স্নান করিবে। উপাসনা ধ্যান প্রার্থনা দ্বারা পারিবারিক পূজা করিবে। দৈনিক অন্নপানের ভিতর ব্রহ্মপুত্রের প্রেম ও পবিত্রতা আত্মস্থ করিবে। পরিশ্রম সহ পরম প্রভুর সেবা ও কার্য্য করিবে। প্রভুর শাস্ত্র পাঠ করিবে এবং সর্ব্বত্র তাঁহার সত্য অন্বেষণ করিবে। প্রভুর আদেশমত গৃহধর্ম্ম করিবে এবং গৃহ তাঁহারই উপযুক্ত হয় এমন করিবে। নির্জ্জনে পরমবন্ধুর সহিত আলাপ করিবে এবং যোগানন্দে মগ্ন হইবে। পুনরায় সাধুভক্তদিগের জীবন অন্নপান রূপে গ্রহণ করিয়া আত্মাকে পরিপুষ্ট করিবে। যাঁহারা ঈশ্বরেতে আনন্দানুভব করেন তাঁহাদের সহিত ধর্ম্মালোচনা করিবে। রাত্রে পুনরায় ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে।"

ব্রহ্মানন্দ ইহাও নির্দ্দেশ করেন যে প্রতিদিন 'উপাসনার শেষে সাধকগণ নিম্নলিখিত সপ্ত সন্নিধানে নমস্কার করিবেন। (১) সকল শাস্ত্রকে

(২) সকল সাধু ভক্তদিগকে (৩) নারীজাতীকে (৪) ক্ষুদ্র শিশুদিগকে (৫) শত্রু দিগকে (৬) নববিধানকে (৭) পবিত্রাত্মা পরমেশ্বরকে।"

শ্রীব্রহ্মানন্দের ব্রহ্মোৎসব।

নববিধান মণ্ডলীর ঘনীভূত ভ্রাতৃমিলনাদর্শ প্রদর্শনের জন্য যেমন শ্রীদরবার, নববিধানের উপাসনা সাধনের ঘনীভূত সম্ভোগের নিমিত্ত তেমনই ব্রহ্মানন্দের ব্রহ্মোৎসব। দৈনিক উপাসনা যেমন কেবল নিয়ম রক্ষা মৌখিক ব্যাপার নয়, ব্রহ্মোৎসবও নববিধানের একটা নৈমিত্তিক ক্রীয়াকলাপের বাহ্যাড়ম্বর নয়। সমস্ত সাধনের ঘনীভূত সাধন, সমস্ত বর্ষের জীবন যাপনের উচ্চ সংকল্প সাধন ব্রহ্মানন্দের এই ব্রহ্মোৎসব সাধন। তাই যখন তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন তখন হইতে স্বর্গারোহণ দিন পর্য্যন্ত বর্ষে বর্ষে নব নব উৎসবের আয়োজন করিয়া তিনি সত্যই জগতে ব্রহ্মেতে যে আনন্দ লাভ হয় তাহাই বিলাইয়াছেন। এই উৎসব সম্বন্ধে ব্রহ্মানন্দের কি ভাব ছিল তাঁর নিম্নলিখিত উক্তি গুলি হইতে অনেক আভাস পাওয়া যাইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মানন্দ একবার এইরূপ উপদেশ প্রদান করেন:—

"আমাদের প্রিয়তম ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে আমরা অদ্য এখানে উৎফুল্ল হৃদয়ে সমাগত হইয়াছি। চতুর্দ্দিকে মহা সমারোহ। কিন্তু আমাদের উৎসব বাহিরে নহে, অন্তরে।

"আমরা যে উৎসবে আহুত হইয়াছি, তাহা অতি উন্নত, তাহা আধ্যাত্মিক ও অতীন্দ্রিয়। ইহার নিগূঢ় তত্ত্বে অভিনিবিষ্ট হইয়া ইহার প্রকৃত

গৌরব সম্পাদনে যত্নবান হও। একবার স্মরণ করিয়া দেখ, যে দিবস ও যে ঘটনাকে মহীয়ান্ করিতে আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা কেমন গুরুতর ও মহৎ। কুসংস্কারের দুর্ভেদ্য শৃঙ্খল হইতে ও পাপের বিজাতীয় দাসত্ব হইতে আমাদিগকে এবং সমুদয় ভারতবর্ষকে বিমুক্ত করিবার জন্য যে দিবস ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্ম জ্ঞানের অভ্যুদয় হইল, পৃথিবীস্থ সমস্ত লোককে দেশ কাল জাতি নির্ব্বিশেষে একত্র করিয়া অদ্বিতীয় অনন্ত পরব্রহ্মের পদানত করণোদ্দেশে যে দিবস ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, অদ্য সেই ১১ই মাঘ। ইহার কি অসামান্য মাহাত্ম্য!

"এ উৎসব গভীর ও অতলস্পর্শ, উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে আমরা উপরে ভাসিতেছি; কিন্তু যতই ইহাতে নিমগ্ন হইব, ততই ইহার প্রকৃত তত্ত্ব উপভোগ করিতে সমর্থ হইব। অদ্য অনন্তপূজার সাম্বৎসরিক উৎসব—যে পরিমাণে অনন্তে মনোনিবেশ করিতে পারিব, ক্ষুদ্র ভাব ও পরিমিত উপকরণ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তের ধ্যানে নিমগ্ন হইব, সেই পরিমাণে অদ্যকার উৎসব সুসম্পন্ন হইবে এবং আমরা বিশুদ্ধ জ্ঞান ও শান্তিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইব।

"অতএব আইস, এই উৎসবক্ষেত্রের বাহ্য শোভার আবরণ ভেদ করতঃ আমরা প্রকৃত ব্রহ্মোৎসবে প্রবেশ করি। বহির্জ্জগতের সমুদয় পদার্থের নিকট বিদায় লই, সাংসারিক চিন্তা বিষয় কামনার নিকটও বিদায় লই। সূর্য্যের আলোক নির্ব্বাণ হইল, জগৎ বিলুপ্ত হইল, সময় অন্তর্হিত হইল যাহা কিছু ক্ষুদ্র, যাহা কিছু সঙ্কীর্ণ, যাহা কিছু ক্ষণভঙ্গুর সকলই অদৃশ্য হইল। আমরা অনন্ত রাজ্যে উপস্থিত, কেবলই অনন্তের ব্যাপার লক্ষিত হইতেছে। দিবা, নিশি, পক্ষ, মাস, ঋতু, বর্ষ একীভূত

হইয়া অনন্তকালে বিলীন হইয়াছে। যেমন কালে কেবল অনন্ত, সেই রূপ ব্যাপ্তিতেও কেবল অনন্ত দেখা যাইতেছে। ঊর্দ্ধে অধোতে, দক্ষি বামে, কিছুই ব্যবধান নাই। চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ তারা, ভূলোক ও দ্যুলো সকলই অনন্ত আকাশে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা কোথায় রহিয়াছি অনন্তরাজ্যে যেখানে অনন্ত আকাশ ও অনন্তকাল ঈশ্বরেতে ওতপ্রো ভাবে স্থিতি করিতেছে। অনন্ত ঈশ্বর দেদীপ্যমান, সম্মুখে অনন্ত জী প্রসারিত; এখানে কেবলই অনন্ত।

"বিশুদ্ধ চিত্ত সাধকেরা অভিন্ন-হৃদয় হইয়া পরিবার নির্ব্বিশেষে সে সাধারণ ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন এবং অনন্তজীবনে অগ্রসর হ তেছেন। তাঁহাদের উপাসনা মৌখিক নহে, ইহা বাহ্য আড়ম্বর না ইহা সমস্ত জীবনের অবিশ্রান্ত কার্য্য। ইহাতে সংসারের চাঞ্চল্য না বিষয় লালসার উত্তেজনা নাই, স্বার্থপরতার কুটিলতা নাই, ইহা প্রশ নিষ্কাম অনন্যগতি হৃদয়ে আত্মসমর্পণ। ইহা কঠোর ব্রত নহে, ই প্রেমার্দ্র হৃদয়ের আনন্দোৎস। এই জীবন্ত গম্ভীর উপাসনা দ্ব সাধকেরা গূঢ়রূপে অনন্তের সহিত অধ্যাত্ম-যোগ নিবদ্ধ করিতেছে দেশ, কাল ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া তাঁহারা জ্ঞান, প্রীতি ও পবিত্র সহকারে ক্রমে পবিত্র-স্বরূপের সহবাসজনিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অধি তর উপভোগ করিতেছেন, এবং অনন্তজীবন সঞ্চয় করিতেছেন।

"দেখ, অনন্তের উপাসনা কেমন গম্ভীর ও আধ্যাত্মিক, ইহাতে আ ও পবিত্রতা, প্রীতি ও জ্ঞান, কেমন সুন্দররূপে সম্মিলিত হয়। অধ্যাত্ম-যোগ সমন্বিত উপাসনাই অনন্তদেবের প্রকৃত পূজা। আ ইহারই উৎসবে এখানে একত্র হইয়াছি। অতএব যাঁহারা অধ্যা উৎসব সম্যক্‌রূপে উপভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বাহ্য শে

দর্শন করিয়া তৃপ্তি বোধ করিবেন না, তাঁহারা হৃদয়মধ্যে অধ্যাত্ম-যোগের জন্য প্রস্তুত হউন। তাঁহারা সংসারের পাপ তাপ নীচতা ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ করিয়া, ইহকাল ও ইহলোক বিস্মৃত হইয়া আত্মাকে অনন্তেতে সমাধান করুন। অদ্য সকলে অনন্তদেবকে প্রত্যক্ষ কর; ও অনন্তজীবন সম্মুখে দর্শন কর। এবং উভয়ের সহিত যোগ নিবদ্ধ কর; অদ্যকার এই কার্য্য, এই লক্ষ্য, এই আনন্দ।"

এ উৎসবানন্দের উচ্ছ্বাসও তাঁর প্রথম জীবনের কথা, নববিধানের অভ্যুদয়ে ব্রহ্মানন্দের ব্রহ্মোৎসবের মাত্রা ক্রমেই চড়িয়া গেল। এখন আর এক দিন মাঘোৎসব করিয়া তাঁর পোষাইল না। বৎসরের মধ্যে এ মাঘোৎসব অর্থাৎ যখন রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন তদুপলক্ষে উৎসব ছাড়া ভাদ্রোৎসব অর্থাৎ যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার স্মরণীয় উৎসব, দুর্গোৎসব, শারদীয় উৎসব, বসন্তোৎসব এই কয়টী বিশেষভাবে ব্রহ্মানন্দ প্রবর্ত্তন করেন। এখন তাঁর জন্মোৎসব ও তিরোধান দিন নববিধান মণ্ডলীর এক একটী মহাসাধনের উৎসব হইয়াছে।

এই সকল উৎসব সম্বন্ধেই ব্রহ্মানন্দের বিশেষ বিশেষ প্রার্থনা প্রকাশিত আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহার আর কিছু এখানে উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে হইল না। তবে মাঘোৎসব তিনি যে ভাবে সাধন করিতেন তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। তিনি এই মাঘোৎসব ইদানীন্তন ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত এক মাস ব্যাপী সাধনের ব্যবস্থা করেন, ইহার প্রথম দশ বার দিন প্রারম্ভিক সাধন হয়। ব্রহ্মানন্দ স্বর্গারোহণের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে অর্থাৎ ১লা জানুয়ারী নবদেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন, সুতরাং এই দিন প্রত্যুষে এই উপলক্ষে নবদেবালয়ে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মানন্দের নব-

দেবালয় প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা করা হয়। ইহাই তাঁর পৃথিবীতে শেষ প্রার্থনা ও উপদেশ, তাই এইখানেই তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

"এয়েছি মা তোমার ঘরে। ওরা আস্তে বারণ করেছিল, কোন-রূপে শরীরটা এনে ফেলেছি। মা, তুমি এই ঘর অধিকার করেছ। এই দেবালয় তোমার ঘর, লক্ষ্মীর ঘর। নমঃ সচ্চিদানন্দ হরে! আজ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী, মঙ্গলবার; ১৮০৫ শকের ৫ই পৌষ; এই দেবালয় তোমার শ্রীচরণে উৎসর্গ করা হইল।

"এই ঘরে দেশ দেশান্তর হইতে তোমার ভক্তেরা আসয়া তোমার পূজা করিবেন। এই দেবালয়ের দ্বারা এই বাড়ীর, পল্লীর কল্যাণ হইবে। এই সহরের কল্যাণ হইবে, ও সমস্ত দেশের ও পৃথিবীর কল্যাণ হইবে।

"গত কয়েক বৎসর আমার বাড়ীতে ক্ষুদ্র দেবালয়ে স্থানাভাবে তোমার ভক্তেরা ফিরিয়া যাইতেন। আমার বড় সাধ ছিল, কয়েকখানা ইট কুড়াইয়া তোমাকে একখানা ঘর করে দিই। সেই সাধ মিটাইবার জন্য মা লক্ষ্মী তুমি দয়া করিয়া স্বহস্তে ইট কুড়াইয়া তোমার এই প্রশস্ত দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিলে।

"আমার বড় ইচ্ছা, এই ঘরের ঐ রোয়াকে তোমার ভক্তবৃন্দসঙ্গে নাচি। এই ঘরই আমার বৃন্দাবন, ইহা আমার কাশী ও মক্কা, ইহা আমার জেরুশালম; এই স্থান ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব? আমার আশা পূর্ণ কর। মা, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার ভক্তেরা এই ঘরে আসিয়া তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া যেন অদর্শন-যন্ত্রণা দূর করেন। মা, আমার বড় সাধ তোমার ঘর সাজাইয়া দিই।

"প্রিয় ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগকেও বলি, আমার মা বড় সৌখিন মা ভাই তোমরা মনে করিও না, আমার মা পাথরের মত শুষ্ক মা, তাঁহা

কোন সখ নাই। তোমরা সকলে কিছু কিছু দিয়ে ঘরখানি সাজিয়ে দিও। কিছু কিছু দিয়ে তাঁহার পূজা করিও। মিছে মিঁছে অমনি কেবল কতকগুলি কথা দিয়ে মায়ের পূজা করিও না। মা তোমাদিগকে বড় ভালবাসেন। তোমরা একটী ক্ষুদ্র ভক্তিফুল মার হাতে দিলে, মা আদর করিয়া তাহা স্বহস্তে স্বর্গে লইয়া গিয়া দেব দেবী সকলকে ডাকিয়া তাহা দেখান এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, দেখ্ পৃথিবীর অমুক ভক্ত আমাকে এই সুন্দর সামগ্রী দিয়াছে।

"ভাই রে, আমার মা বড্ড ভাল রে, বড্ড ভাল; মাকে তোরা চিন্‌লি নে। তোরা মার হাতে যাহা দিস, পরলোকে গিয়ে দেখ্‌বি, তাহা আদর যত্নের সহিত সহস্র গুণ বাড়াইয়া তাঁহার আপনার ভাণ্ডারে তিনি রাখিয়া দিয়াছেন।

"এই মা আমার সর্ব্বস্ব। মা আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, মা আমার ভক্তি দয়া, মা আমার পুণ্য শান্তি, মা আমার শ্রী সৌন্দর্য্য, মা আমার ইহলোক পরলোক, মা আমার সম্পদ সুস্থতা। বিষমরোগ যন্ত্রণার মধ্যে মা আমার আনন্দসুধা! এই আনন্দময়ী মাকে নিয়ে ভাই-গণ, তোমরা সুখী হও। এই মাকে ছাড়িয়া অন্য সুখ অন্বেষণ করিও না। এই মা তাঁহার আপনার কোলে রাখিয়া তোমাদিগকে ইহলোকে চিরকাল সুখে রাখিবেন। জয় মা আনন্দময়ীর জয়! জয় সচ্চিদানন্দ হরে।"

তার পর এই দিনই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা পিতামহ রাজা রামমোহন ও ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতাসূচক উপাসনা হয়। ধর্ম্মপিতা ধর্ম্মপিতামহের আধ্যাত্মিক বংশধর হইয়া ব্রহ্মানন্দের সহোদর হইতে না পারিলে কিরূপে বিধানরাজ্য সম্ভোগে আমাদের অধিকার হইবে, এই নিমিত্তই প্রথম দিনে এই সাধন ব্যবস্থা।

পরদিন অর্থাৎ ২রা জানুয়ারী নববিধানের প্রতি, ৩রা জানুয়ারী মাতৃভূমির প্রতি, ৪ঠা গৃহের প্রতি, ৫ই শিশুদিগের প্রতি, ৬ই ভৃত্যদিগের প্রতি, ৭ই দীনজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সেবাসূচক সাধন করিতে হয়।

৮ই জানুয়ারী শ্রীব্রহ্মানন্দের স্বর্গারোহণের দিন, এই উপলক্ষে এই দিন বিশেষভাবে পরলোকসাধন ও ব্রহ্মানন্দ-তীর্থগমন হয়। ব্রহ্মানন্দের যোগ বিষয়ে প্রার্থনা করা হয়। পূর্ব্ব রজনী হইতে প্রয়াণ প্রকোষ্ঠে সাধকগণ রাত্রি জাগরণ করিয়া ধ্যানাদি করেন এবং প্রত্যূষে যে সময়ে খাটের চারিধারে দাঁড়াইয়া শেষ তাঁহার সহিত ব্রহ্মস্তোত্র করিয়াছিলেন সেইভাবে সমস্বরে স্তোত্র পাঠে ব্রহ্মানন্দসনে আধ্যাত্মিক যোগানুভব করা হয়। পরে তিরোধান সময়ে দেবালয়ে উপাসনা হয়। এই দিন বিশেষ ভাবে ধ্যান ধারণা, পাঠ, আত্মচিন্তা দ্বারায় পরলোকস্থ ভক্তসঙ্গ করাই সমুচিত।

৯ই জানুয়ারী মহাজনগণের প্রতি, ১০ই জনহিতৈষীগণের প্রতি, ১১ই উপকারীদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা, ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপক উপাসনা হয়। এবং ১২ই বিরোধীদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সাধন হইয়া থাকে।

ইহার পর একদিন আত্মার জন্যও প্রার্থনাদি হয় ও একদিন জাগরণ বা উৎসবের জন্য প্রস্তুতের বিশেষ উপাসনা হইয়া থাকে। এই ভাবে প্রার্থনা করিয়া ব্রহ্মানন্দ উৎসবের জন্য প্রস্তুত করেন ঃ—

"হে দয়াময়, সমক্ষে নূতন উৎসব, পশ্চাতে পুরাতন জীবন। নব-উদ্যমের সহিত যেন উৎসবে যোগ দি। মহারাজাধিরাজ, তুমি আমা-দিগকে অনুতাপ করিতে দেও। নববিধান আমাদিগের জীবন, এই আমাদিগের জীবনের কর্ম্ম। বিশ্বব্যাপী এক নূতন ধর্ম্ম জগতে আসিয়াছে, আমরা কয় জন তাহার দূত। ঠাকুর, কেবল নববিধান কিসে পূর্ণ হইবে ইহাই আমাদের জীবনের কার্য্য। হে পরম পিতা, তুমি দয়া করিয়া

আমাদের পুরাতন জীবন কাড়িয়া লও। যাও পুরাতন জীর্ণ শীর্ণ জীবন যাও। হে নূতন মানুষ, তুমি অণ্ড ভেদ করিয়া এস। তোমার ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল, পথের কড়ি নববিধান। এই জীর্ণ আবরণ ভেদ করিয়া একটী প্রিয়দর্শন মানুষ বাহির হইবে। একেবারে নবীন। এই দিকে ছেলেমীর চূড়ান্ত ঐ দিকে বুড়োমির চূড়ান্ত। ব্রহ্মাণ্ডপতি, তুমি এবার কি না দিলে? তাহাতেও তৃপ্তি হয় না। খুব ক্ষমা দীনতা বৈরাগ্য শিখিতে হইবে। পুরাতন মানুষ মরিয়া গিয়া আমাদের প্রত্যাদেশের নূতন মানুষ বাহির হইবে। যত কিছু বিবাদের কারণ চলিয়া যাইবে। হে বিধাতঃ, এই মানুষকে বাহির করিয়া তোমার বিধান পূর্ণ কর এই প্রার্থনা।"

ইহার পর ১লা মাঘ ব্রহ্মমন্দিরে উৎসবের উদ্বোধনসূচক আরতি হয়। আরতি উপলক্ষে যাহা করা হয় আমরা ব্রত অনুষ্ঠানাদির মধ্যেই তাহা উল্লেখ করিয়াছি, তবে এ উপলক্ষে ব্রহ্মানন্দের গভীর প্রার্থনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলেই ইহার ভাব অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে। তিনি প্রার্থনা করেন:—

"শঙ্খ ঘণ্টাসহকারে আরতি আরম্ভ হইল, আরতির বাদ্য বাজিল। স্বর্গ এবং পৃথিবী যোগ দিল। যোগী ঋষি সকলে নববিধানাশ্রিত ভক্তদিগের সঙ্গে যোগ দিলেন। গম্ভীর আরতির বাদ্য নির্জ্জীবকে উৎসাহী ও প্রফুল্ল করে। সেই উজ্জ্বল দেদীপ্যমান মূর্ত্তি দর্শন কর, ব্রহ্মের বিরাট মূর্ত্তি দর্শন কর।

"হে ঈশ্বর, আমরা তোমার নিয়োজিত ভৃত্য। আমরা তোমার যত সাধুদিগকে প্রণাম করিয়া তোমার আরতি করি। ব্রহ্ম, আমরা তোমার আরতি করি। পুণ্যের প্রদীপ, প্রেমের প্রদীপ, ভক্তির প্রদীপ, বিশ্বাসের

প্রদীপ, নিরাকার বিবেক প্রদীপ আমাদের হস্তে। এই পঞ্চ প্রদীপ লইয়া তোমার মুখের কাছে ঘুরাইতেছি। জয় ব্রহ্ম, জয় হৃদয়ের ঈশ্বর বলি, আর তোমার মুখের চারিদিকে দীপ ঘুরাই। প্রচ্ছন্ন ব্রহ্ম আরও উজ্জ্বল হইতেছে, ব্রহ্মমূর্ত্তি দেখা দেও। আকাশ জোড়া তোমার রূপ।

"আমাদের প্রদীপ উত্তর হইতে দক্ষিণে, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে নৃত্য করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল। ভক্তহাতে প্রদীপ নাচে, তোমার মুখ আরও উজ্জ্বল হইল। আলোক, দেখাও তো মার রূপ মার মুখ দেখাইয়া দেও। এই যে আমার জননীর মুখ।

"বঙ্গদেশ, ভারত, পৃথিবী, আজ জগজ্জননীর আরতি কর। আজ স্নেহগুণে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে ব্রহ্মারতি প্রবর্ত্তিত হউক। ভক্তহৃদয়বিলাসিনীর আনন্দ মুখদর্শনে কৃতার্থ হইলাম, সুখী হইলাম।

"মা, তোমার যত যোগী, যত ভক্ত, মা তোমার যত ধর্ম্ম যুগে যুগে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে সমুদয় স্মরণ করি। নববিধানের জয় ঘোষণা করি। প্রাচীন কাল হইতে যত অমূল্য তত্ত্বকথা সোণার থালে সাজাইয়া লইয়া নববিধান অবতীর্ণ। উৎসবক্ষেত্রে আগত যাত্রীদিগকে পুণ্য শান্তি বিতরণ করিতে জননী কর্ত্তৃক নববিধান প্রেরিত হইয়াছেন।

"আজ আমরা আরতির বাদ্য সহকারে উৎসবের দ্বার খুলিলাম। রাজা সম্রাটদিগের মুকুট পদতলে রাখিয়া সেই নিশান আজ আমরা উড়াইলাম। তোমার প্রেরিত নববিধান নিশান হস্তে ধারণ করি। এখন ভক্তের বিনীত প্রার্থনা, ভীরুতা অপবিত্রতা অসরলতা দূর কর। মা, তোমার পবিত্র দর্শন বিধান কর। দ্বার খুলিল কানাৎ করিয়া, দেব দেবী দেখা দিলেন। সকল লোকের সঙ্গে সকল ভাই ভগীর সঙ্গে ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে

"গুণনিধি তোমার সেবকের বক্ষে দাঁড়াও। যদি ইচ্ছা হয় মা যোগী ফকীর কর। এবারকার উৎসবে স্বর্ণকলস পূর্ণ করিয়া কি আনিয়াছ জানি না। এই তোমার সমক্ষে নববিধান নিশান নিখাত হইল। নিশ্চয়ই নববিধান, অক্ষয় অমর দিগ্বিজয়ী হইবে। আমরা মা ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। আমাদের সেনাপতি ব্রহ্মাণ্ডপতি এস ব্রহ্মমূর্ত্তি একবার কোল দেও। আজ সচ্চিদানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া শুদ্ধ হই। মা জগজ্জননী, মা পতিতোদ্ধারিণি, মা, আমার মা, আমার ভাই বন্ধু সকলের মা, দুঃখিনী ভারতমাতার মা, পৃথিবীর মা, পাপীর মা, আমার মত পাপাসক্ত অহঙ্কারী লোকের মা, মা আরও কাছে এস।

"জগজ্জনে তোমায় মা বলে ডাকে, মা উত্তর দাও। যদি উত্তর না দেও, তবে আমাদের চলে না। আমরা কথা কয়ে বাঁচি। আমি তোমায় মা বলে ডাকি, ছুত করে মা বলে ডাকি। উৎসব খোলা হইল, মা, একবার মুখভরে আনন্দমনে তোমায় মা বলে ডাকি; আশা ভক্তির সহিত বার বার তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করি।"

ব্রহ্মানন্দের এই মহাভাব পূর্ণ প্রার্থনাই যথার্থ নিরাকার ব্রহ্মের আরতি।

ইহার পর এক এক দিন এক একটী অনুষ্ঠান হয়। তাহার মধ্যে প্রধানতঃ এই গুলি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ঃ—মহিলাগণ কর্ত্তৃক নিশান বরণ ও আর্য্যনারী সমাজের উপাসনা, মঙ্গল বাড়ীর উৎসব, প্রচারাশ্রমের উৎসব, নগর কীর্ত্তন, প্রকাশ্য বক্তৃতা, আনন্দবাজার। এ সকল বিষয়েই ব্রহ্মানন্দের উপদেশ ও প্রার্থনা আছে। স্থানাভাবে এখানে অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। দৈনিক প্রার্থনা পুস্তকে ও "মাঘোৎসব" নামক পুস্তকে সে সমুদয় মুদ্রিত হইয়াছে।

দেশ দেশান্তর হইতে সাধকগণ আসিবেন বলিয়া তাঁহাদের উৎসবে যোগ দানের সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার সুবিধার জন্য এবং সর্ব্বস্থানের উৎপন্ন দ্রব্য বিশেষতঃ মহিলাদিগের শিল্পাদি প্রদর্শনের উৎসাহ দিবার জন্য, অথচ ধর্ম্মভাবে কিরূপে দোকানদারীও করা যায় তাহা সাধন শিক্ষার নিমিত্ত ব্রহ্মানন্দ আনন্দবাজারের ব্যবস্থা করেন। এখানে খাঁটী জিনিষ এক দরে বিক্রয় হইবে এবং বিশেষভাবে ধর্ম্ম সাধনের উপযোগী সমুদয় দ্রব্য, যেমন খোল, কর্ত্তাল, একতারা, আসন, গৈরিক, নিশান, শাঁক, ঘণ্টা, মটো, ধর্ম্মপুস্তক ইত্যাদি যাহাতে অল্প মূল্যে বিক্রয় হয় এই জন্য এই বাজার স্থাপন করেন। সকল দ্রব্যেই নববিধান নিশান অঙ্কিত থাকে এই ব্রহ্মানন্দের অভিপ্রায়, কেন না তাহাতে সমুদয় দ্রব্য যে ঈশ্বরাগত এবং পবিত্র ইহা ক্রেতা এবং বিক্রেতা সকলেরই মনে হইবে। বাস্তবিক ব্যবসা বাণিজ্য আমোদ আহ্লাদের ভিতরও ধর্ম্ম আছে, ইহা শিক্ষা ও সাধনের জন্যই এই নূতন উপায় ব্রহ্মানন্দ উদ্ভাবন করেন।

ব্রহ্মানন্দের দেহে অবস্থানকালে অল্পমতি বালকদিগের মাদক সেবন ও দুর্নীতিতে বীতরাগ জন্মাইবার নিমিত্ত "ব্যাণ্ড অব হোপ" বা "আশা সৈন্যদল" নামে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের একটী দল তিনি গঠন করেন; উৎসবের সময় তাঁহাদের লইয়া মাদক দানবের এক সোলার পুতুল করিয়া তাহা পুড়াইয়া এবং তার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া তিনি শিশুদের আমোদের সঙ্গে কতই শিক্ষা দিতেন।

উৎসবের সময় প্রচারযাত্রা, প্রীতিভোজন, মহাসঙ্কীর্ত্তন আবার

এখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বর্গারোহণ দিনও এই সময়ের মধ্যে পড়িয়া তাহাও একটী উৎসবের অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এইরূপে সমস্ত মাসব্যাপী মহোৎসবের ব্যাপার কোন ধর্ম্মে কোথাও আছে কি না জানি না! এবং ইহা কেবল বাহ্য নিয়ম রক্ষা বা আড়ম্বর নয়। মানব আত্মাকে পূর্ণানন্দে ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ করিবার জন্য এই মহোৎসব। যথার্থই ব্রহ্মানন্দ এই উৎসবে স্বয়ং মাতিয়া জগৎকে ব্রহ্মের আনন্দে মত্ত করিবার জন্যই এই ব্যবস্থা করেন। তাই তিনি বলিলেন :—

"দয়াসিন্ধু, তোমার এই লোকগুলি মধুকরের দৃষ্টান্তে যেন চলে। গোলাপের প্রতি আকৃষ্ট হয় যেন। ভাদ্রোৎসব, মাঘোৎসব তোমার বাগানের গোলাপ। মধুর টানে মধুকর আসে, কিন্তু আবার উড়ে যায়। যদি ডুবিয়ে রাখিতে চাও সুধাতে উড়ে যেতে যদি না দাও, তা হ'লে হৃদয়েশ্বরী হও।

"মা, উৎসবের উপলক্ষে একবার তোমার কাছে সকলে আসে, আর একটু মধু খেয়ে পালায়; কিন্তু ঐ গোলাপে চিরগোলাপি হওয়া, ঐ রাঙ্গা চরণের মধুপানে চিরকাল মত্ত থাকা, মুখ আর না সরান, এটা আর হয় না। হরি, সুধা পান করে যেন অচেতন হই। ব্রহ্মের কাছে বসে থাকিতে থাকিতে যখন ঠিক নেশা হয়, তখন গান বাজনা নৃত্য নাই, নির-বলম্ব নির্লিপ্ত সাধন। কাল ভ্রমর সুন্দর হয়, তার গোলাপি রং হয়; সুন্দরীর কাছে বসে তার বর্ণ সুন্দর হয়। দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মরূপ মাধুরীতে মন মগ্ন হয়ে যায়। দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মরূপে ডুবে গেলাম। আমি খালি জল, তুমি সরবৎ; আমার জল তোমাতে ঢালিলাম, তোমার জল আমাতে ঢালিলাম, ঢালিতে ঢালিতে আমিও মিষ্ট সরবৎ হয়ে গেলাম।

"শ্রীহরি, বেদের ব্রহ্ম, উপাসনা আর কি? তোমার জলে মিশে এক হওয়া। উপাসনা আর কি? রং পরিবর্ত্তন। উপাসনায় আমা লোহাটা তোমাকে স্পর্শ করে সোণার রং হয়ে গেল। মা, এই ভিক্ষা চাই, মদের কাছে এতক্ষণ বসে থাকি, যেন মদের ঘোরে প্রাণ আচ্ছ হয়, নেশা হয়; প্রাণের মত্ততায় যেন এলিয়ে পড়ি। গেলাসাপি নে ক্রমে চড়ে যায়; নেশাতে ভাব চিন্তা কার্য্য এলোমেলো হয়ে যায়। সময়ে পাপ অসম্ভব। মাতালের কাছে পাপ আসিলে পাপকে সে চিবি খেয়ে ফেলে। নেশা যত, তত যোগী। সব যোগীগুলো নেশাখোর হবেই তো। ব্রহ্মের নেশা বড় ভয়ানক। এ নেশা ছোটান যায় ন এ রঙ্গিনের রং তোলা যায় না। তোমার নেশা আর সংসারের নে তফাৎ কত।

"স্বর্গের ভাঁটিতে চুঁইয়ে চুঁইয়ে কি মদই করেছ! এক কৌটা খ আর জয় মা বলে নেশায় ভোঁ হব। পাপ করিব, ইন্দ্রিয় প্রবল থাকি ভিতরে জ্ঞান থাকিবে, এ যদি হয়, তবে হবে না; সে চালাকির নেশ নেশায় ভোঁ হয়ে যাব। এই ভোঁ হওয়াকে বুদ্ধ বলিলেন, নির্ব্বা আর গোরা নাচে আর হাসে, হাসে আর কাঁদে। কি হয়েছে তো বলে ভক্তি। মাতাল হয়ে বল্লে কি না ভক্তি। নূতন মদ তৈয়ার ক খেয়ে নেচে কেঁদে বলিল, এ ভক্তি। যা বল তাই। আমাদের বিধানে নির্ব্বাণের নেশাও থাকিবে, ভক্তির নেশাও থাকিবে। মা, আ শক্তি এবার পুরো মাত্রায় মাতাল কর! সব বাড়ীতে মদের ভ বসাবে? তবে এবার মজালে! এবার বুঝি পাকাপাকি নেশা হ পাঁচ রকম নেশা একেবারে একটা মাদক দ্রব্য হলো, তার নাম দি

বুদ্ধের নির্ব্বাণ, পাহাড়ে যাওয়া, বৈরাগী হওয়া, গৌরাঙ্গের মত নৃত্য করা, সব একেবারে। এ যে আসল মাদক বাহাদুর আস্‌ছে। এবার কে কত পান করবি করে নে।

"ঐ আদ্যাশক্তি আস্‌চেন! এবার সব মাতাবে, সব নেবে। এবার বুদ্ধি জ্ঞান দেহ মন টাকা কড়ি স্ত্রী পরিবার সব নেবে? ব্রহ্মজ্ঞানী হতে বলিলে, তাই হলাম। আবার নীচ মাতাল হতে বল্‌ছ? ওমা শক্তি ফলালে আর তৃষা অশক্তি থাক্‌বে না। একা এগিয়ে পড়িব।

"নেশা যত বাড়িবে তত আনন্দ বাড়িবে। দে না দে অন্নদে মোক্ষদে, নেশা দে, যোগের নেশা, ভক্তির নেশা, নির্ব্বাণের নেশা, জ্ঞানের নেশা, বিজ্ঞানের নেশা দে। যেন নেশায় বিহ্বল হইয়া কালিদাস হইয়া সকল প্রকার পাপকে অসম্ভব করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই।"

ব্রহ্মানন্দ-জীবনে উৎসবের ভাব ক্রমে কি গভীর এবং উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এই প্রার্থনাতেই তাহা সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বাস্তবিক এই উৎসব কেবল যে বাহ্যাড়ম্বর নয় কিন্তু ইহা সম্ভোগে যে জীবনের পরিবর্ত্তন হয় রং বদ্‌লে যায় ইহাই ব্রহ্মানন্দের উপরোক্ত উক্তিতে প্রকাশ। ইহাতে আরো ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা হয়, পরস্পরের মধ্যে ব্রহ্ম সঞ্চারিত হন ইহাই ব্রহ্মোৎসবের ফল। তাই তিনি প্রার্থনায় বলিলেন:—

"অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় ঠাকুর, মত হইতে অনুষ্ঠান বহু দূরে। ব্রাহ্মসমাজ হইতে নববিধান বহু দূরে, সাধনক্ষেত্র হইতে মুক্তিধাম বহু দূরে, আমাদের চেষ্টা হইতে কার্য্য বহু দূরে। তোমার সঙ্গে এক হয়ে প্রেমে তফাত আর তন্ময় দেখিব। উৎসবে ধন দান করেছ, আশীর্ব্বাদ করেছ এখন তন্ময় হয়ে যাব, ব্রহ্মচক্রে ঘুরিব, ব্রহ্ম আকাশে উড়িব। শরীর স্বর্গময় হয়ে যাবে। তাই হয়ে যাব, ঈশার গৌরাঙ্গের যা হয়েছিল।

তোমার ভূষণে তন্ময়। হরি আমাতে আমি হরিতে, তোমার ভিতর ঐ আমি আর আমার ভিতর এই তুমি, এই যে নিবিষ্ট হওয়া, এইটি তুমি এই কয় জন ভক্তকে হরি করে দাও। এলে যদি, তবে দুর্গন্ধ পাপ কলঙ্কিত শরীরকে রূপবান্ কর, কৃষ্ণাঙ্গকে গৌরাঙ্গ কর, তন্ময় কর। ঋষিতেজ আমাদের ভিতর দাও, তুমি আমার হয়ে যাও, আর আমি তোমার হয়ে যাই। আমি এবং আমার বন্ধু বান্ধব সকলে এক হয়ে তন্ময় হয়ে যাই। তন্ময় হরিতে আর তন্ময় ভাই বন্ধুতে, সকলে এক হয়ে গেলেন। ভিতরে কেবল ব্রহ্মনিনাদ শুনি, ব্রহ্মবাদ্য শুনি, চিরকাল উৎসব সম্ভোগ করি।"—প্রার্থনা, "হরিত তন্ময়ত্ব।"

"হরি হে, এই দুই দিনের মধ্যে উৎসবচক্র থামিবে। সম্ভাবনা এই, ইহার পর পাপী আবার পাপ করিবে। ধর্ম্মরাজ্যের সুবসন্ত এমনি করে আসে আবার চলে যায়। শ্রীহরি, পৃথিবীর এই জোয়ার ভাটা নিবারণের উপায় কি আছে? পাপ একেবারে কি দূর করে দিবার উপায় নাই? দয়াসিন্ধু, উপায় কিছু করে দাও। এই যে আমরা একটা মাস সংসারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এয়েছি, আছি ভাল। এই অবস্থাটা স্থায়ী করে দাও।

"হে প্রেমসূর্য্য, চিরউজ্জ্বল থাকিয়া হৃদয়ের গগন পরিষ্কার করিয়া রাখ। এবার বৃন্দাবনে এসে সপরিবারে নিজস্ব বাড়ী জায়গা জমি কিনিয়াছি। এমন বৃন্দাবনের সুখ হইতে কি বিচ্যুত করিবে? বৃন্দাবনের শ্রীহরি, হাত যোড় করিয়া তোমার কাছে প্রার্থনা করি, তোমার আনন্দের শ্রীবৃন্দাবনে চিরবাসী করিয়া রাখ।—প্রার্থনা, "নিত্য বৃন্দাবনবাস।"

রস হও, প্রাণের রক্ত হও। তুমি যদি সহায় হও, তবে এবার জন্মের মত সংসারকে ফাঁকি দিলাম। তুমি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এরূপ ভাব স্থাপন কর, স্বামী স্ত্রীকে স্ত্রী স্বামীকে দেখিবে তোমার ভিতর দিয়া। দুই জনের মধ্যে ব্রহ্ম। এমনি হবে পিতাপুত্র ভ্রাতাভগিনীর সম্বন্ধ। চক্ষে চক্ষে ব্রহ্মদর্শন, তার পরে স্ত্রীদর্শন, পুত্রদর্শন, ভাই ভগিনী দর্শন। যাহা দেখিব, হরিভাবে দেখিয়া তবে উপলব্ধি করিব। ব্রহ্মের ভাবে সকলকে দেখিব। তোমার পুণ্যের অঞ্জনে চক্ষুকে রঞ্জিত করিয়া তবে সকলকে দেখিব।

"এবার ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা, কেবল ব্রহ্মসমাগম নয়। এই প্রার্থনা করি তোমার কাছে এবার চক্ষে চক্ষে কর্ণে কর্ণে রক্তের ভিতর বসিয়া যাও। এবার আমাদের হাড়ে হাড়ে ব্রহ্ম হবে।

"হরি, আমরা যদি উৎসবধন সঞ্চয় করিয়া বুকের ভিতর বাক্সবন্দী করিয়া চাবি হরির অতলস্পর্শ প্রেমসমুদ্রে ফেলে দি, তবে ইচ্ছা করিলেও ধনক্ষয় করিতে পারিব না, পাপ করিতে পারিব না। তিনি নিরাপদ যাঁর চাবি নাই হাতে। প্রেমজলে চাবি ফেলে দি আজ। হে হরি, এমনি করে পাপ শেষ করে ফেল যেন আর আসিতে না পারে। আপনার হাতে ধর্ম্ম যার, তার কু-প্রবৃত্তি ফিরিয়া আসিবেই। দয়াসিন্ধু, মানুষের ধর্ম্ম তার ক্ষমতার অতীত করে দাও।

"আমাদের পক্ষে পতন হওয়া যেন একেবারে অসম্ভব হয়; আর ভয় যেন না থাকে; কেহ যেন মনের শান্তিভঙ্গ করিতে না পারে। এবারকার ধন চাবিবন্ধ ধনের মত হয়ে রহিল। হাড়ের ভিতর শিষ্ট ভাব মধুর ভাব পুণ্য ভাব যেন প্রবেশ করে মা, মঙ্গলময়ী, কৃপা করিয়া আমাদিগকে

বাস্তবিক ব্রহ্মানন্দের এই ব্রহ্মোৎসব এক সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ মানব-জীবন-উন্নতকারী আধ্যাত্মিক ও মানসিক মহা ভোজের ব্যাপার। এক মাস ধরিয়া এই ভোজ প্রকৃতভাবে সম্ভোগ করিলে সমস্ত বর্ষই অধিকতর উন্নত জীবনে সাধকগণ যে জীবনযাপন করিতে পারিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি। এই উৎসব সাধন যাহাতে সুখপ্রদ হয় ব্রহ্মানন্দ তজ্জন্য কতই প্রার্থনা করিয়াছেন। বস্তুত ব্রহ্মানন্দ কিনা ব্রহ্মেতেই আনন্দিত তাই নিরাকার ব্রহ্মকে লইয়া কিরূপে মহা আনন্দিত হইতে হয় তাহাই তিনি ব্রহ্মোৎসবে দেখাইলেন। এই ব্রহ্মোৎসবই ব্রহ্মানন্দ-জীবন।

ধর্ম্মপ্রচার, সমাজসংস্কার, কর্ম্মযোগ, দুর্নীতি ও মাদকনিবারণ, রাজভক্তি, দেশহিতৈষণা।

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেবল প্রাচ্যভাব বশবর্ত্তী হইয়া নববিধান সাধন করিয়াই নিবৃত্ত রহিলেন না, ইহা যাহাতে প্রচার হয় তাহারও ব্যবস্থা করিলেন। তিনিই ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মপ্রচার প্রথম আরম্ভ করেন, এবং আপনি বিষয়কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ও স্বীয় দৃষ্টান্ত দ্বারায় অপর কয়েকজন যুবাকেও বিষয় কর্ম্মত্যাগ করাইয়া প্রচারক দল গঠন করতঃ দেশে দেশে এই নবধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তাঁহারই উত্তেজনায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করেন। এই জন্য যখন ব্রহ্মানন্দের তিরোধানের কয়েকদিন মাত্র পূর্ব্বে শ্রীমহর্ষি-দেব ব্রহ্মানন্দকে দেখিতে আসেন, আমেরিকায় শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্রের [illegible] করিয়া তিনি কেশবচন্দ্রকে বলিলেন ‘বাবা

বাস্তবিক কেবল ব্রাহ্মসমাজ বা নববিধানে কেন, বর্ত্তমান যুগে ধ্যান- রায়ণ নির্জ্জন সাধন-প্রিয় হিন্দু জাতির মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারের ভাব যা বর্ত্তন হইয়াছে, তাহা যে ব্রহ্মানন্দেরই গুণে ইহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে ীকার করিতে হইবে। যদিও খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ বর্ত্তমান কালে এ দশে প্রচারের প্রণালী আনয়ন করেন সত্য, কিন্তু ব্রহ্মানন্দের ব্রাহ্মধর্ম্ম চার ও প্রেরিত প্রচারক দল গঠন দেখিয়াই যে হিন্দুসমাজের বিভিন্ন ল নূতন নূতন ভাবে প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন ইহা কে অস্বীকার করিবে।

যাহাহউক ব্রহ্মানন্দ স্বয়ং এবং নববিধান প্রচারক মহাশয়গণ ভারতের র্ব্বত্র এবং ইংলণ্ড, ও কেহ কেহ আমেরিকা, পারস্য এবং আরব পর্য্যন্ত মন করিয়া এই ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দের এই প্রচার কিন্তু কেবল মুখে মত প্রচার করা নহে। তাঁহার প্রচার, জীবন প্রচার। তিনি কখনও কোন মত বা তত্ত্ব যতক্ষণ না জীবনে সাধন করিতেন, ততক্ষণ তাহা কেবল পুস্তকে পড়িয়া বা লোকমুখে শিখিয়া প্রচার করিতেন না। তিনি বলিতেন যে ৩৬৫ দিনে তিনি দুখানি বইও পড়িতেন কি না সন্দেহ। তিনি যাহা প্রচার করিতেন জীবন্তরূপে পবিত্রাত্মার দ্বারায় পরিচালিত না হইলে করিতেন না। তাই একবার বলিলেন "যদি আমি প্রত্যাদেশ অনুভব না করি, আমি কিছু বলিতে গেলে যেন মনে হয় আমার ব্যাকরণ অশুদ্ধ হইল, দুটী কথাও মুখ খুলিয়া বলিতে পারি না, আর প্রত্যাদেশ পাইলে আমি এমন অগ্নিময় সত্য প্রচার করিতে পারি, যে তাহাতে ভ্রান্তির দুর্ভেদ্য দুর্গ চূর্ণ হইয়া যায়।"

প্রতি বর্ষে টাউনহলে তিনি যে বক্তৃতা করিতেন সমস্ত বর্ষ জীবনের সাধনায়

করিতে যান তখন তিনিই স্বয়ং ঈশা দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হইয়াছেন অনেকে ইহা ভাবিয়া কতই তাঁহাকে সম্মান করিয়াছেন। একবার এক বৃদ্ধা নারী মহা ভিড়ের মধ্যে তাঁর গায়ের চোগার কোণটুকু ছুঁইবার জন্য মহা আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু সেখানেও বক্তৃতাকালে তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করেন "আমি কেবল শিখিতে আসিয়াছি।" যথার্থ শিক্ষার্থীর ভাবে কেবলমাত্র পবিত্রাত্মার দ্বারায় পরিচালিত হইয়া জীবনের অভিজ্ঞাত সত্য প্রচারই তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার। এই জন্য জীবনবেদে তিনি বলেন "যখনই বলিতে হইল সত্য আপনাপনি সতেজে বাহির হয়। দিবার জন্য আসি নাই বুঝিতে পারিয়াছি, আসিয়াছি শিখিতে।" আরও "কাল যা বক্তৃতা করিয়াছি সেই বক্তৃতা যদি পুনরায় করি মনে হইবে অসার গুরুগিরি করিতেছি। আমার আত্মায় সত্য আসিলেই অন্যের হইবে।" এই নিমিত্ত প্রতিদিন তিনি নব নব সত্য প্রচার করিয়া তাহার গৌরব আপনি না লইয়া সকল গৌরবই তাঁর ভগবানকেই দিয়াছেন। আরও বলিলেন, "অধ্যাপকের সংখ্যা এত বাড়িতেছে কেন? সকলেই যে শিখাইতে চায় কেহই যে শিখিতে চায় না, সুমতি দাও সকলকে শিখিলেই শিখান হইবে।" বাস্তবিক এক অপবিত্রাত্মার প্রেরণাই তাঁর প্রচারের নিয়ন্তা।

এইরূপে পবিত্রাত্মা প্রেরিত হইয়া তিনি যেমন নিত্য নব নব সত্য প্রচার করিয়াছেন, তেমনি তাঁর প্রচার প্রণালীও নূতন নূতন। ব্রহ্মানন্দ তাঁর নবধর্ম্মবিধান প্রচারার্থ প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রণালী অবলম্বন করেন:—(১) ব্রহ্মমন্দিরে উপদেশ। (২) প্রকাশ্য সভায় ——। (৩) মাঠে ঘাটে উন্মুক্ত স্থানে বক্তৃতা। (৪) সঙ্গীত সঙ্কী-

র্ত্তন। (৭) নব নৃত্য অর্থাৎ বৃদ্ধ, যুবা ও বালকগণের তিন দল
লী আকারে আবদ্ধ হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে পরস্পরের
পরীত গতিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য। (৮) বন্ধু সম্মিলন। (৯) একা
কা প্রচারযাত্রা বা সদলে প্রচারযাত্রা। (১০) পত্রাদি লেখা দ্বারায়
চার। (১১) অভিনয় দ্বারায় প্রচার ইত্যাদি।

পত্রযোগে ব্রহ্মানন্দ কিরূপে ধর্ম্ম প্রচার ও শিক্ষা বিধান করিতেন
ার দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর প্রিয় জামাতা কোচ বেহারের মহারাজাকে ১৮৭৯
ালে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে উপহার স্বরূপ যে পত্র লিখিয়া উপদেশ
য়াছিলেন তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। সেই উপদেশ উপহার
এই :—

"ধর্ম্ম বিষয়ক কর্ত্তব্য :—আত্মাতে এবং সত্যেতে প্রতিদিন ঈশ্বরের
পূজা করিবে এবং তোমার প্রার্থনা যেন সংক্ষিপ্ত ও মিষ্ট হয়। ঈশ্বরকে
তোমার পিতা মাতা জানিয়া ভালবাসিবে, তাঁহাকে তোমার প্রভু জানিয়া
অনুসরণ করিবে, তোমার রাজা ও বিচারক জানিয়া ভয় করিবে, তোমার
বন্ধু জানিয়া বিশ্বাস করিবে এবং তোমার পরিত্রাতা জানিয়া পূজা
করিবে। সৌভাগ্যের সময় তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবে, বিপদ দুঃখের সময়
সাহায্যের জন্য তাঁরই দিকে তাকাইবে। সকল অবস্থাতে ঈশ্বরপরায়ণ
হইবে, তিনি ইহলোক এবং পরলোকে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

"নৈতিক :—তোমার রিপুকে সংযত করিবে এবং সকলের প্রতি দয়া
ও ক্ষমাশীল হইবে। সৎসাহস ও মনুষ্যত্ব সহকারে সত্য বলিবে।
গরীবের সাহায্য করিবে, দুঃখীকে সান্ত্বনা দিবে, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিবে,
বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করিবে। ন্যায়বান হইবে, যাহার যাহা প্রাপ্য
তাহাকে তাহা দিবে।

"পারিবারিক :—তোমার মাতাকে ভক্তি করিবে। অবিচলিত বিশ্বস্ততাসহ তোমার স্ত্রীকে ভালবাসিবে। তোমার সকল আত্মীয় স্বজনকে প্রীতিপূর্ণ আত্মীয়তা প্রদর্শন করিবে। পবিত্র এবং সুখী পরিবারেরই সুখ অন্বেষণ করিবে।

"শারীরিক :—যত্নপূর্ব্বক স্বাস্থ্যরক্ষা করিবে, কারণ শরীরই আত্মার বাসভবন। বিশুদ্ধ বায়ু তোমার রক্তকে পরিষ্কার করুক এবং পুরুষোচিত ব্যায়াম তোমার অঙ্গকে বলীয়ান করুক। তোমার আহার নিয়মিত এবং মিতাচার সম্পন্ন হউক, যেন অল্প কিম্বা অধিক না হয়। "সকাল সকাল শয়ন ও সকাল সকাল উত্থানের" বিধি অবলম্বন করিবে। যাহাতে মত্ততা হয় এমন দ্রব্য স্পর্শ বা আস্বাদন করিবে না।

"জ্ঞান বিষয়ক :—তোমার মনকে আবশ্যকীয় জ্ঞান সঞ্চয় দ্বারায় পূর্ণ করিবে এবং এমন ভাবে অধ্যয়ন করিবে যাহাতে মনে প্রজ্ঞা ও সাধনপরতন্ত্রতা বিধান করে। সৎ পুস্তক সকলকে বন্ধু বলিয়া এবং নির্জ্জন সঙ্গী বলিয়া ভালবাসিবে। শিক্ষারই জন্য শিক্ষার আদর করিবে এবং বিজ্ঞানে আনন্দ অন্বেষণ করিবে। চিন্তা, অভিজ্ঞতা, ভ্রমণ, তত্ত্বালোচনা এবং মানব-চরিত্র ও সকল বস্তু অধ্যয়ন দ্বারায় তোমার শিক্ষাকে পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিবে।

"সামাজিক :—সকলের প্রতি প্রিয় ও ভদ্র ব্যবহার করিবে। নারী জাতিকে সম্মান করিবে। যাঁহারা তোমাপেক্ষা বয়সে, মান্যে বা বিদ্যায় জ্যেষ্ঠ তাঁহাদিগকে ভক্তি করিবে। সমাজে তোমার উপযুক্ত পদমর্য্যাদা রক্ষা করিবে। তোমার মর্য্যাদানুরূপ বেশ ভূষা করিবে, তাহা মূল্যবান্‌দীন

"রাজনৈতিক ঃ—ভক্তি করিবে তোমার সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে, ...কে ঈশ্বর এ দেশ শাসনের জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন। আইন অধ্যয়ন ...রিবে, ন্যায় বিচার ও আইনের উচ্চ ভাব আলোচনা করিবে এবং ...ন তুমি রাজত্ব করিবার উপযুক্ত হইবে তখনকার উপযুক্ত রাজ-...্যাদানুরূপ জ্ঞানেতে এবং নীতিতে আপনাকে সুশিক্ষিত করিবে। ...মার উচ্চ ভবিষ্যৎ পরিণতি এবং মহান দায়ীত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবে। ... লক্ষ লোক উচ্চ আশান্বিতচিত্তে তোমার রাজ্য শাসনের প্রতি চাহিয়া ...হিয়াছে। তোমার প্রজাদিগকে সুশাসনের নৈতিক এবং বৈষয়িক সৌভাগ্য ...ধান করা তোমার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা হউক এবং ঈশ্বরের আলোক যেন ...তামার রাজ্যকে আদর্শরাজ্য করিতে তোমার সহায় হয়।—(অনুবাদিত)।

যেমন এই উচ্চ বিষয়ে তেমনি আবার শিশুভাবেও ব্রহ্মানন্দ শিশু-...দগকে উপদেশ ও শিক্ষা দিতেন। "ব্যাণ্ড অব হোপ" সভায় ও "বালকবন্ধু" ...ত্রে শিশুদের উপযোগী কতই মৌখিক বা লিখিত শিক্ষা দেন। কোচ-...বহারের জ্যেষ্ঠ রাজকুমারকে এক সময় যে পত্র লেখেন তাহাই প্রমাণস্বরূপ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

"শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার রাজ রাজেন্দ্র ভূপ বাহাদুর—

শুভ আশীর্ব্বাদ,

"আগামী কল্য ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে তুমি আমার ভবনে মধ্যাহ্ন-ভোজন করিয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিবে। বৃদ্ধ মাতামহের সঙ্গে কিঞ্চিৎ অন্ন খাইয়া এবং সকলের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করিয়া গৃহ মাতাইবে। তুমি—

"সুনীতিনন্দন হৃদয়রঞ্জন।
নৃপেন্দ্রনন্দন নয়নরঞ্জন।

প্রসন্নবদন মধুরগঠন।
প্রাণের ভূষণ মোহনদর্শন।

"এখানে আসিয়া "পাপা চিয়া, চপ," কুস্তি, চুম্বন, যত মজার ব্যাপার জ্ঞান সমুদয় থলি ঝাড়িয়া বিদ্যা বুদ্ধি বাহির করিয়া সকলকে সুখী করিবে। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, কিছু মনে করিবে না। আমাদের ভালবাসা জানিবে এবং Kiss Hand শীঘ্র পাঠাইয়া দিবে।

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী

মাতামহ।"

অভিনয় যোগে ধর্ম্ম প্রচার এ দেশে সম্পূর্ণরূপে এক অভিনব প্রণালী। যদিও শ্রীগৌরাঙ্গদেব যাত্রার দ্বারায় প্রচার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বর্ত্তমানকালে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় একটা কেবল আমাদেরই ব্যাপার সকলে জানিত। বিশেষতঃ আমাদের দেশে রঙ্গমঞ্চ এমনি কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল যে ইহার সহিত ধর্ম্মের কোন রকম যে সংস্রব থাকিতে পারে ইহা কেহ কল্পনাই করিতে পারিতেন না। রঙ্গমঞ্চ জঘন্য চরিত্র নরনারীর একটা কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থের ও বিলাস পরতন্ত্র আমোদ প্রমোদের প্রধান আড্ডা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ তাঁহার স্বর্গীয় উদ্ভাবনী শক্তি প্রভাবে এমন জঘন্য রঙ্গমঞ্চকেও উদ্ধার করিয়া তাহাতে নবজীবন এবং ধর্ম্মজীবন সঞ্চার করিলেন এবং তাহাকে তাঁহার উক্ত ধর্ম্ম প্রচারের এক প্রধান উপায়রূপে পরিণত করিলেন আশ্চর্য্য এই যে, যে সমুদয় উপদেশ ব্রহ্মমন্দিরে প্রদান করিলে লোকে বিশেষতঃ দেশের প্রধান প্রধান শিক্ষিত লোকে শুনিতে কখনই যাইতেন

একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করতঃ মহা পরিতৃপ্ত হইতেন। বাস্তবিক সর্ব্বসাধারণ লোকদিগের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারের এক অতি উৎকৃষ্ট উপায় যে রঙ্গমঞ্চ তাহা ব্রহ্মানন্দই দেখাইয়াছেন, এবং আমোদ আহ্লাদের সঙ্গে যে ধর্ম্ম সাধন ও ধর্ম্ম প্রচার হইতে পারে তাহা সুন্দররূপে প্রমাণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দ তাঁহার কোন অনুচরকে এই সময়ে ইংরাজীতে লেখেন "আমাদের অভিনয় উৎসব সময়ে তোমার আমাদের সঙ্গে থাকা উচিত ছিল। এ একটা ঠিক নূতন উৎসব। রঙ্গমঞ্চে আমরা অভিনয় করি, আর আমাদের প্রভুকে গৌরবান্বিত করি এবং আমাদের কতই আনন্দ হয়। রঙ্গমঞ্চ ঈশ্বরের ঠিক মন্দির হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যেখানে সাধকগণ নূতন প্রকারে তাঁকে পূজা করেন ও তাঁর সেবা করেন। লোকেরা এ ভাব লইয়া বিদ্রুপ করে, তাহারা ইহা ধারণ করিতে পারে না, কেননা ইহা এতই উচ্চ। আমোদ প্রমোদকে পবিত্রাত্মার স্পর্শে পবিত্র করা, যে রঙ্গমঞ্চ এতদিন অপবিত্রতা এবং জঘন্যতার সোপান ছিল তাহাকে বিশুদ্ধ করা এক পবিত্র কার্য্য।"

রঙ্গমঞ্চের ন্যায় খোল, কর্ত্তাল, কীর্ত্তনও তখন কেবল ইতর শ্রেণীর বৈষ্ণবদিগের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। উচ্চ শ্রেণীর ভদ্র সমাজে তাহা আদরণীয় ছিল না। ব্রহ্মানন্দই সে সমুদয়কে উদ্ধার করিয়া ভদ্র সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এমন কি দেশীয় খ্রীষ্টানধর্ম্মাবলম্বীগণও তাঁহারই দৃষ্টান্তে এই খোল কর্ত্তাল কীর্ত্তনকে ধর্ম্ম প্রচারের প্রধান উপায়রূপে এখন গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দই বর্ত্তমান দেশীয় সমাজ সংস্কারের প্রথম প্রবর্ত্তক। ... মাধব সহিত ব্রহ্মানন্দের যে মতভেদ হয়

এই সমাজ সংস্কারই তাহার প্রধান কারণ এবং এই কারণেই তিনি মহর্ষি কর্তৃক বর্জ্জিত হন। জাতিভেদ নিবারণ, বাল্যবিবাহ নিষেধ, অসবর্ণ ও বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, নারীদিগের ধর্ম্মে স্বাধীনতা বিধান এ সকলের মূলে ব্রহ্মানন্দই হস্ত।

এক ঈশ্বর যখন সকলেরই পিতা তখন সকল মানবই তাঁর সন্তান এবং পরস্পরে ভ্রাতা ইহা বিশ্বাস করিলে কি আর জাতিভেদ স্বীকার করা যায়। বিধাতার ইঙ্গিতে যাহারা বিশ্বাস করেন যৌবনকালই যে বিবাহের প্রকৃষ্টকাল তাঁহারা কি আর অস্বীকার করিতে পারেন? তাই বাল্যবিবাহ নিবারণ করিয়া ব্রহ্মানন্দ যৌবন-বিবাহ প্রবর্ত্তন করেন, তবে স্ত্রী পুরুষ কাহারই অধিক বয়সে বিবাহ তিনি অনুমোদন করেন নাই এবং যদিও বিধবাবিবাহ প্রথা তিনি অনুমোদন করেন সত্য, কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধেই তাঁহার মত এক অতি নূতন মত। তিনি বলেন "পরিণয় একটী স্বর্গীয় অনুষ্ঠান এবং সেইভাবে ইহাকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে। আত্মাই বিবাহ করে এবং প্রভু পরমেশ্বর এবং তিনিই কেবল একটী অমরাত্মার সহিত অপর একটী অমরাত্মার উদ্বাহগ্রন্থি বন্ধন করিয়া দেন। মনে রাখিও ঈশ্বর স্বয়ং যে বিবাহে পৌরহিত্য না করেন তাহা বিবাহই নহে।" সুতরাং এইভাবে স্বয়ং ঈশ্বরের প্রেরণায় বিবাহ সম্পাদিত হইলে আর তাহাতে জাতি বা অবস্থা ভেদও কিছুই থাকিতে পারে না এবং কোন প্রকার অন্যায়ও হইতে পারে না।

পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় পাত্র পাত্রীর কেবল মনোনয়নের দ্বারায় বিবাহও ব্রহ্মানন্দ অনুমোদন করেন নাই। তিনি বলেন, "হয় পাত্র পাত্রী পর-

তাহা হইলেই তাহাতে যে ঈশ্বরেরও অনুমোদন আছে অনেক পরিমাণে সিদ্ধান্ত হইবে। তিনি আরও নিয়ম করিয়াছেন, "কোন পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিবে না; কোন স্ত্রীরও একাধিক স্বামী থাকিবে না।" এবং "বিবাহিত ব্যক্তি পরস্পরকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, পুনর্ব্বার বিবাহও করিতে পারিবে না।"

বিধবাবিবাহ বা বিপত্নীকের পুনর্বিবাহ সম্বন্ধেও তিনি বলেন "যদি নিতান্ত অল্প বয়সে পতি বা পত্নী পরলোকগত হয় তাহা হইলে যে জীবিত থাকিবে সে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু যদি অধিক বয়সে মৃত্যু হয় তাহা হইলে জীবিত ব্যক্তির পুনর্ব্বার বিবাহ বিষয় চিন্তা না করিয়া প্রভু পরমেশ্বরের পদে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করাই শ্রেয়ঃ।" তিনি আরও নিয়ম করেন যে "বিবাহার্থিদিগের মধ্যে জাতীয় প্রথা নিষিদ্ধ জ্ঞাতিত্ব অথবা পারিবারিক কোন প্রকার নিকট সম্বন্ধ থাকিবে না। নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তিকে কেহ বিবাহ করিবে না, কারণ তাহা ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিক, নীতি বিগর্হিত এবং অনিষ্টকর।"

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধেও তাঁর মত অতি নূতন। পুরুষোচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা স্ত্রীপ্রকৃতি সমন্বিত বলিয়া তিনি অনুমোদন করেন নাই। তিনি এজন্য স্ত্রীশিক্ষার এক অভিনব প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপন করেন ও তাহাতে তাঁর আদর্শ প্রণালীমত শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন।

স্ত্রী স্বাধীনতা সম্বন্ধেও ব্রহ্মানন্দের বিশেষ মত এই ছিল, যে নারীগণ প্রকৃত ধর্ম্মার্থিনী হইয়া তাঁহাদের নিজ নিজ ঈশ্বর নিয়োজিত কার্য্য স্বাধীনতাসহ সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইলে তাহা করিবেন; কিন্তু তিনি বলেন "যে

বা অন্যান্য কার্য্যে মত্ত হয় এবং পুরুষের অভ্যাস অনুকরণ করিয়া স্বভাব বিরুদ্ধে ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করে তাহাকে ধিক্। মহা বিনাশ তাহাকে প্রতীক্ষা করিতেছে এবং লজ্জা, অধঃপতন তাহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী।" ব্রহ্মানন্দই সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মসমাজে আপন সহধর্ম্মিণীকে আনয়ন করেন এবং তজ্জন্য স্বজনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হন। হিন্দুসমাজে যেমন অবরোধ প্রথা দৃঢ় হইলেও ধর্ম্মার্থে স্বাধীনতা আছে, ব্রহ্মানন্দ সেইভাবের স্বাধীনতাই অনুমোদন করিয়াছেন। নরনারীর অবাধে অবৈধ সংমিশ্রণ ও স্বেচ্ছাচারিতার কিছুতেই তিনি প্রশ্রয় দেন নাই। ধর্ম্মমণ্ডলীর মধ্যে যাঁহাদের সহিত পরস্পর ধর্ম্মসম্বন্ধ দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহারা নারীকে ব্রহ্মকন্যা এবং নরকে ব্রহ্মসন্তান বলিয়া সম্মান করিতে শিখিয়াছেন তাঁহাদের স্বাধীনভাবে মিলন অবৈধ নহে। ফলে নরনারীর পরস্পর মিলনে কোন প্রকার নীতি ধর্ম্মের অপলাপ হইয়া স্বাধীনতার অপব্যবহার না হয় ইহাই ব্রহ্মানন্দের ঐকান্তিক চেষ্টা।

কর্ম্মযোগও ব্রহ্মানন্দের নবধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ। নিষ্ক্রিয় নিদ্রালু যোগী নববিধানের লোক নহেন। কার্য্যতঃ ধর্ম্ম সাধন নববিধানের প্রধান লক্ষণ। কারণ ব্রহ্মানন্দ বলেন "প্রকৃত পরিশ্রমই উপাসনা, ইহা ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির পূজা।" সুতরাং সেইভাবেই তিনি নববিধান মণ্ডলীতে বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করেন। ব্রহ্মানন্দ যে সমুদয় কর্ম্মানুষ্ঠান করেন তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান :—(১) প্রচারক ও ব্রাহ্ম পরিবারদিগের জন্য ভারত আশ্রম। (২) মঙ্গলবাড়ী। (৩) ব্রাহ্মছাত্রদিগের নিমিত্ত নিকেতন। (৪) সাধন কানন। (৫) ব্রহ্ম-[illegible]। (৬) ব্রাহ্মবিবাহের রাজবিধি। (৭) আলবার্ট কলেজ

আলবার্ট হল। (১১) ইণ্ডিয়া ক্লব। (১২) ভারত সংস্কার সভা। (১৩) ইংরাজী দৈনিক "ইণ্ডিয়ান মিরার" প্রকাশ। (১৪) সুলভ সংবাদ পত্র সাপ্তাহিক "সুলভ সমাচার।" (১৫) ধর্ম্ম প্রচারের জন্য পাক্ষিক "ধর্ম্মতত্ত্ব।" (১৬) ইংরাজী রাজনীতি প্রচারার্থ 'লিবারেল।" (১৭) ধর্ম্ম প্রচার জন্য "নিউ ডিস্পেন্সেসন্।" (১৮) মহিলাদিগের জন্য "পরিচারিকা।" (১৯) বালকদিগের জন্য "বালক বন্ধু।" (২০) মাদক নিবারণের জন্য "বিষবৈরী।" (২১) মহিলাদিগের আর্য্যনারী সমাজ। (২২) মাদক নিবারণ জন্য "ব্যাণ্ড অব হোপ" সভা। (২৩) যুবকদিগের নীতি সভা। (২৪) প্রচার কার্য্যালয় ও মুদ্রা যন্ত্র। (২৫) সাধকদিগের জন্য বিধান ব্যাঙ্ক এবং (২৬) পুস্তক প্রণয়ণ ও প্রচার ইত্যাদি।

পৃথিবীতে তাঁর শেষ কার্য্য কমলকুটীরের নবদেবালয় প্রতিষ্ঠা এবং এই উপলক্ষে যাহা বলেন তাহাই তাঁর শেষ প্রার্থনা এবং উপদেশ। ইতিপূর্ব্বে কমলকুটীরের একটী প্রকোষ্ঠই পারিবারিক দেবালয়রূপে ব্যবহৃত হইত; কিন্তু নবসংহিতা রচনাকালে একটী স্বতন্ত্র দেবালয় গৃহ নির্ম্মাণের নিমিত্ত তাঁর প্রতি ঈশ্বরের আদেশ হয়। তাই তিনি ভয়ঙ্কর দুরারোগ্য রোগশয্যায় পড়িয়াও এই দেবালয় নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন। দেবালয় নির্ম্মাণের ইট কিনিবারও টাকা তখন ছিল না, বাড়ীর পশ্চিমদিগের কতকগুলি চাকরদের অতিরিক্ত ভাঙ্গা ঘর ছিল, তাই ভাঙ্গাইয়া প্রচারকদিগের দ্বারায় ভিত্তি স্থাপন করাইয়া তাড়াতাড়ি এই দেবালয় নির্ম্মাণ করান। যে দিন প্রতিষ্ঠার দিন স্থির হয় সে দিন তাঁর এমন অবস্থা যে শয্যা হইতে উঠিবার শক্তি নাই, তথাপি এমনই ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করিলেন যে তাঁহাকে চেয়ারে বসাইয়া সকলে আনিতে বাধ্য হইল। দেবালয়ের দ্বারে আনীত হইলেই হাত জোড় করিয়া হাসিতে হাসিতে কাঁপিতে কাঁপিতে চেয়ার হইতে

উঠিয়া বেদীর উপরে শেষ বসা বসিয়া দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই উপলক্ষে যে মহাভাবপূর্ণ সরল শিশুর ন্যায় প্রার্থনা করেন ও উপদেশ দেন তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশ করা হইয়াছে।

এই নবদেবালয় সত্যই জগজ্জনের এক মহাতীর্থ। আজ না হউক কাল না হউক এক দিন না এক দিন ইহা তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইবেই এবং তিনি যেমন বলিয়াছেন "ইহা দ্বারায় জগতের কল্যাণ হইবে।" সুধু তাই কেন তাঁর কলুটোলাস্থ জন্মস্থান এবং তাঁর বাসস্থান কমলকুটীর তত্ত্ববিদ্‌দের দর্শনীয় স্থান বলিয়া এখনই যেমন গভর্ণমেণ্ট দ্বারায় মর্ম্মর ফলক স্থাপিত হইয়াছে, এক সময়ে অসংখ্য ভক্ত সাধকদিগের নিকট এই স্থান এবং বিশেষভাবে এই দেবালয় ও পূর্ব্বে যে প্রকোষ্ঠে দেবালয় ছিল ও তাঁর মহা প্রয়াণ কক্ষ, তাঁর সতী দেবীর প্রয়াণাগার ও জলসংস্কারের কমলসরোবর এবং তাঁর রন্ধন ও ভোজন-স্থান এবং সাধনকুটীর প্রত্যেকটীই এইরূপ তীর্থরূপে সমাদৃত হইবে।

এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের বহুল বৃত্তান্ত তাঁর জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই সকলে জানিতে পারিবেন, সুতরাং বাহুল্য ভয়ে আমরা এখানে তার অধিক সমালোচনা অনাবশ্যক মনে করি। এক কথায় বলিতে হইলে মানব-চরিত্র উন্নত করিবার বিশেষতঃ ভারতবাসীগণের পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং জ্ঞানশিক্ষার উন্নতি বিধানার্থ যাহা কিছু আবশ্যক এমন কোন অনুষ্ঠানই ছিল না যাহার সংস্কার তিনি প্রবর্ত্তন করেন নাই। এমন কি বেশভূষাদির সংস্কার সম্বন্ধেও তাঁর উপেক্ষা ছিল না। তিনি নিজে এ বিষয়ে অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিলেন এবং পবিত্রতার [illegible]

পরিষ্কার অথচ বেশী জাঁকাল না হয় এবং অল্প ব্যয়সাধ্য হয় এজন্য তিনি এক বিজ্ঞাপন দিয়া সাধারণের অভিমত আহ্বান করেন। পুরুষদিগের পোষাকে অফিষের বেশ মধ্যে পূর্ব্বে প্রায় সকলে শালের চোগা ব্যবহার করিত, তাহার পরিবর্ত্তে তিনিই আল্‌পাকার নূতন চাপকান চোগা প্রবর্ত্তন করেন।

আহার পান সম্বন্ধে মিতাচারিতাই ব্রহ্মানন্দের নীতি ছিল। আহার পান বিষয়ে সংযম ও বৈরাগ্য সাধন করিতেই তিনি সকলকে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি নিজে নিরামিষ ভোজী ছিলেন এবং "যাঁহারা দীনতা এবং সামান্যরূপে জীবিকানির্ব্বাহের ব্রত লইয়াছেন এবং ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা হইতে আপনাদিগকে এবং প্রতিবেশীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আত্ম-ত্যাগে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাঁহারা মৎস্য মাংসাহার না করেন" ইহাই তাঁর উপদেশ। ফলে "যাহা তোমার দুর্ব্বল ভ্রাতার পতনের কারণ হয় তাহা হইতে বিরত থাকিবে" বিশেষভাবে ইহা শিক্ষা দিয়াছেন।

দেশের সামাজিক দুর্নীতি নিবারণ, বিশেষভাবে মাদক সেবন নিবা-রণের জন্য ব্রহ্মানন্দ যারপর নাই চেষ্টা করেন। তিনি যুবাদিগের মধ্যে নীতি বিস্তারের জন্য একটী "সুনীতি সমিতি" গঠন করেন এবং তাঁহারই উৎসাহে কতিপয় যুবা এক প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া নীতি সাধনে ও যুবকদিগের মধ্যে নীতি প্রচারে কৃতসংকল্প হন। এ সমিতি সম্বন্ধে নব-বিধান পত্রে ব্রহ্মানন্দ এইরূপ লেখেন:—"আমাদের যুবক ভ্রাতৃগণ আপনাদের কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র চরিত্র হইবার নিমিত্ত একটী নীতি সমিতি গঠন করিয়াছেন। ইহা প্রশংসাজনক উদ্দেশ্য, এবং সহানুভূতি ও উৎসাহ পাইবার যোগ্য। অপবিত্র থিয়েটার ও সুরাপানের প্রাবল্য সময়ে মুষ্টিমেয় যুবক আত্মা যে কোন প্রকার বাহ্যাড়ম্বর বা হৈ চৈ

না করিয়া আপনাদের চরিত্রের পবিত্রতা উন্নতির জন্য সম্মিলিত হইয়াছেন ইহাও সুখের বিষয়। ঈশ্বর এই যুবাদের আশীর্ব্বাদ করুন।"

এই যুবক নীতি সমিতির সভ্যগণ নিম্নলিখিত মর্ম্মে প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া দলবদ্ধ হন:—"আমি এতদ্দ্বারায় এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমার চিন্তা, বাক্য এবং কার্য্যে নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করিতে সতত চেষ্টা করিব এবং অন্যেরও দুর্নীতি নিবারণে সচেষ্ট থাকিব। ঈশ্বর আমার সহায় হউন।"

এইরূপ মাদক নিবারণী যুবকদল গঠন করিয়াও ব্রহ্মানন্দ তাঁহাদিগকে এই মর্ম্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেন:—

"আমি এতদ্দ্বারায় প্রকাশ্যভাবে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি সুরা বা কোন প্রকার মাদক সেবন করিব না এবং কোন আকারে তামাকও সেবন করিব না কিম্বা ঔষধার্থে প্রয়োজন ব্যতীত কোন মাদক দ্রব্যই ব্যবহার করিব না। আমি আরও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে অন্যকেও মাদক সেবনে বিরত ও নিরুৎসাহিত করিতে চেষ্টা করিব। ঈশ্বর আমার সহায় হউন।"

বাস্তবিক মাদক নিবারণের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান যুগে ব্রহ্মানন্দ যেমন সংগ্রাম করেন এমন কেহই করিয়াছেন কি না সন্দেহ। তিনি বিলাতে গিয়া যত সভা সমিতিতে বক্তৃতা করেন তাহার প্রত্যেক সভাতেই ইংরাজের সুরা ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন এবং এতদ্দেশেও যুবাদিগের মাদকের বিরুদ্ধে ঘৃণা উদ্দীপনের নিমিত্ত নানাপ্রকার উপদেশ ও বক্তৃতা দিয়া এবং এমন কি সোণার মাদক দানব করিয়া বালকদিগের দ্বারায় তাহা দগ্ধ করাইয়া আমোদচ্ছলে কতই শিক্ষা দেন। আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারি এঁর প্রভাব ও উৎসাহবলে আমাদের সময়ের

স্কুলের ছাত্রদের মধ্য হইতে সুরাপান কি চুরুট নস্য তামাক পর্য্যন্ত প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল এবং সেই সমসাময়িক অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি যাঁহারা এখন উচ্চ পদস্থ হইয়া জীবিত রহিয়াছেন তাঁহারাও এখনও তামাক পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন না এমন অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মানন্দের প্রেরণায় পরিচালিত "বিষবৈরী" পত্র ক্ষুদ্র হইলেও ইহা দ্বারায় তখন যথেষ্টই কাজ হয়। কিন্তু হায়! এখন সে রকম মাদক নিবারণের কোন সভা সমিতি বা পত্রাদিও নাই, আর অতি শিশুগণের মধ্যেও অবাধে সিগারেট চুরুট সেবন প্রচলিত দেখা যায়। সুরাপানের প্রচলনও নাকি যুবাদের মধ্যে হইতেছে শুনা যায়, ইহা অত্যন্তই কষ্টের বিষয় বলিতে হইবে।

ব্রহ্মানন্দের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রভাব এতই প্রবল ছিল যে, যে কেহ তাঁহার সমীপস্থ হইয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিত সে ব্যক্তি হাজার দুর্নীতি পরায়ণ হইলেও তাঁহার দ্বারায় পবিত্রতা সঞ্চালিত হইত। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে আমাদের কোন বন্ধু মুখে শুনিলাম, তাঁহাদের সহিত এক ছাত্রনিবাসে একজন যুবা দুশ্চরিত্র যুবাদের দলে মিশিয়া সুরাপায়ী ও দুর্নীতি পরায়ণ হইয়া উঠে। একদিন আমাদের বন্ধু ঐ যুবাকে ব্রহ্মানন্দের উপদেশ শুনিতে ব্রহ্মমন্দিরে আনেন, যুবা আসিবার সময় পথের ধারের ছাই স্ত্রীলোকদের প্রতি কুদৃষ্টি বিদ্রূপাদি করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু উপদেশ শুনিয়া যখন বাটী ফিরিল তখন আর তার সে ভাব নাই, আর কোন দিকে তার তাকান নাই। পরসপ্তাহে যুবা বলিল "এক রাত্রের উপদেশের প্রভাব আমার তিন দিন ছিল, তিন দিন মন কোন দুষ্কার্য্য বা দুশ্চিন্তা কত্তেও সাহসী হয় নাই। আর সেখানে যাবো, না গেলে আমার সব যাবে।" উপরোক্ত বন্ধু সঙ্গে আরও একজন একদিন ব্রহ্মমন্দিরে গিয়া শেষে একেবারে নববিধানের প্রচারক হইয়া পড়েন। বাস্তবিক বিশ্বাস

প্রেম, পবিত্রতা যাঁহার জীবনের আদর্শ নীতি, "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" এই ব্রহ্মস্বরূপ যাঁহার প্রাণে সর্বপ্রথম উদ্ভাবিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সাধন মন্ত্রে সন্নিবিষ্ট হইল, তিনি যে মণ্ডলীতে ও দেশে সুনীতি ও পবিত্রতা সঞ্চারের জন্য এইরূপ প্রভাবই বিস্তার করিবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি? সহস্র বৎসরের মধ্যেও মণ্ডলীতে কোন রকম দুর্নীতি প্রবেশ না করে ইহাই তাঁহার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা।

সাধারণ রাজনীতি বিষয়ে ব্রহ্মানন্দ তত একটা মাথা বকাইতেন না। তাঁর রাজনীতি রাজভক্তি। হিন্দু প্রকৃতি যেমন স্বভাবতঃই রাজভক্ত, ব্রহ্মানন্দ সেইরূপ রাজভক্তি সকলকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং নববিধানের মূল সত্যরূপেও ইহা নিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন "প্রতি পরিবারে পিতা মাতা যেমন ভক্তি ও পূজার যোগ্য সমগ্র রাজ্যেও পিতা মাতা স্বরূপ তেমনি রাজা ও রাণী। স্বদেশীয়ই হউন আর বিদেশীয়ই হউন সকল রাজা রাণীকেই প্রজা মাত্রেরই পিতা মাতার ন্যায় আন্তরিক ভক্তি করা উচিত। কেন না ঈশ্বরের দ্বারায় প্রেরিত হইয়াই তাঁহারা প্রজা পালনের জন্য রাজ পদাভিষিক্ত ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে।"

বিশেষতঃ যাঁহারা বিধান বিশ্বাসী তাঁহারা রাজা রাণী যে বিধাতা কর্তৃক নিয়োজিত ইহা বিশ্বাস না করিয়াই পারে না। কারণ বিধাতার নিয়ন্ত্রণ বিনা কি এত বড় একটা রাজ্য শাসন ব্যাপার আকস্মিক হইতে পারে? এই নিমিত্ত ব্রহ্মানন্দ রাজভক্তির একান্ত পক্ষপাতী। এই রাজভক্তি প্রণোদিত হইয়াই তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মোৎসব উপলক্ষে একবার এইরূপ প্রার্থনা করেন :—

"হে প্রেমময়, হে ভারতের রাজা আজ হরিভক্তির সঙ্গে রাজভক্তি

রাজ্ঞীর জন্মদিন উপলক্ষে ভারত আনন্দের উৎসব করিতেছে। আরও আনন্দিত হউক, আরও উৎসব করুক।

"হে পরমপিতা, আমরা সংসার জানি না, পরিবারের মাতাকে জানি না, আমরা কেবল এক ঈশ্বরকে জানি। আমাদের সকলি তুমি আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়া তোমারি। আমাদের ভারত শাসন পরিত্রাণের শাসন, কল্যাণের হেতু, আমরা তাহাই জানি। এই রাজ্ঞী তোমারি প্রেরিত এই আমরা মানি। হরি, সংসারে আমাদের মা যেমন, রাজ্যে তেমনি আমাদের মা মহারাণী। যাহা তোমার তাহাই আমার, তাহাই আমাদের, যাহা তোমার নয় তাহা আমাদের নয়।

"আমাদের রাজার কীর্ত্তি আমরা একটুও বাদ দিতে পারি না। মা, তোমার বিধানের ভিতরে এই রাজ্য, তোমারি ভিতরে এই রাণী। এই আর এক খানি রূপ। মা কত রূপ দেখাও। রাজ্যে গিয়া রাণী হও, রাণীর মন্ত্রী হও। কীর্ত্তি তব অনেক প্রকার, কিন্তু ভক্তের কাছে এক প্রকার। যত দিন বাঁচিব তোমার কীর্ত্তি মাথায় করিব।

মা, তুমি যাঁহাকে রাজেশ্বরী করিলে কোটী কোটী লোক যাঁর অধীনে, আমরা তাঁহাকে মানিব না? মা, তুমি আমাদের বলিলে তোমাদের কল্যাণের জন্য আমি একটি ছোট মাকে পাঠাইলাম, তোমরা ইহাঁকে মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, রাজভক্তি সব দিবে। মা, আমাদের যাহাকে যাহা বলিতে বলিবে তুমি, আমরা তাঁহাকে তাহাই বলিব। দেখিতেছি তুমি আজ তোমার সদ্গুণে ভূষিতা, সুনীতিসম্পন্না রাজকন্যাকে নিজে অভিষিক্ত করিতেছ।

"মা, তুমি একবার সকল ভক্তকে লইয়া তোমার ভারতের রাণীকে লইয়া এইখানে বস আমরা দেখি। আমরা কেমন সুখে সুখী, আমর

রাজ্যটাকেও মার কাছে আনিলাম। মা, আজ সব এক হইয়া গেল। ধন্য নববিধান, তুমি সকল ধর্ম্ম এক করিলে।

"যেমন নববিধানের লোক রাজভক্ত এমন কি আর কেহ হইতে পারে? বল দেখি রাণী, এমন রাজভক্তি আর কার হতে পারে? ভারতকে তুমি কুশলে রেখেছ তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা লও, ভক্তি লও, আর রাজার রাজা তুমি হে হরি, তোমার এই ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্য, নববিধানের রাজ্য আমরা কুশলে রাখিব।

"রাজাধিরাজ তুমি, তোমারি চরণে ইংলণ্ড ভারতবর্ষ এক হউক। মা, তুমি আজ সকল বিবাদ বিসম্বাদ দূর কর আমরা সকলে এক হই। মা, আমরা তোমার নববিধান পূর্ব্ব পশ্চিম সকল স্থানে যেন প্রচার করিতে পারি। আমরা যেন রাজভক্তি দেখাইয়া কুশলের রাজ্য স্থাপন করিতে পারি।"

বাস্তবিক ভারতের রাজ্য শাসনে বিধাতার বিধান দেখিয়াই ব্রহ্মানন্দ এত রাজভক্তির উচ্ছ্বাস দেখাইয়াছেন। তিনি বিলাতে ও এ দেশে যখনই কোন সুযোগ পাইয়াছেন তখনই রাজভক্তি সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাজভক্তি আনুগত্য বিনা পিতৃ মাতৃভক্তি এমন কি হরি-ভক্তিও হয় না। ইংরাজ রাজ স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক নিয়োজিত হইয়াই এ দেশের উদ্ধারের জন্য আসিয়াছেন ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। ইতিহাসে ঈশ্বরের হস্ত তিনি স্পষ্ট দেখিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত। যদিও মুসল-মান জাতিও ঈশ্বরেরই কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া এ দেশের পৌত্তলিকতা নিবারণ করিতে আসেন এবং তাঁহাদের প্রভাবেই এ দেশে শ্রীগৌরা-[illegible] বিধান ও [illegible] নানকের শিখ বিধান বা কবীর তুলসীদাস

দুর্নীতি বশতঃ তাঁহাদের শাসন চলিয়া যায় এবং তাঁহাদের অনাচার হইতে বাঁচাইবার জন্যই ভগবান ইংরাজ রাজকে প্রেরণ করেন।

ইংরাজ রাজের ন্যায় সুশাসনপ্রণালী জগতের আর কোন রাজ্যেই এখন নাই। এই প্রণালীতে রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্রের সংমিশ্রণে এক নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহাতে রাজাও স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন না, প্রজাও রাজাকে অতিক্রম করিতে পারেন না, সুতরাং ইহার ন্যায় সুন্দর শাসনপ্রণালী আর কি হইতে পারে? ভারতকে এমন সুপ্রণালী সমন্বিত রাজের শাসনাধীন করিয়া ভগবান যথার্থই যে তাঁর অতুল কৃপার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শাসন কর্ত্তাদিগের ব্যক্তিগত মানব-স্বভাবসুলভ দোষ দুর্ব্বলতা থাকিলেও ইংরাজরাজশাসনপ্রণালী যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং অতুলনীয় ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রণালী দ্বারায় সুশাসিত হইয়া শিক্ষা, বিজ্ঞান, খ্রীষ্টনীতি এবং পাশ্চাত্য কর্ম্মশীলতা লাভে ভারত পুনরায় সমুন্নত হইবে ও ইহার পূর্ব্বগৌরব লাভ করিবে এই জন্যই ভগবান ইংরাজরাজকে প্রেরণ করিয়াছেন। কুশিক্ষা, কুসংস্কার, জাতিভেদ, জড়তা, নীতিহীনতা এবং অধীনতার পেষণে ভারতের প্রাচীন মহত্ব প্রায় সকলই লোপ পাইয়া যাইতেছিল, পাশ্চাত্য জাতির প্রভাবে এবং দৃষ্টান্তে সে সমুদয় তিরোহিত হইবে এবং জগতের জাতি সমূহের মধ্যে ভারত আপনার স্থান লাভ করিতে পারিবে এই জন্যই ভারতে ইংরাজের আগমন।

আবার অন্য দিকে হিন্দুর ন্যায় প্রাচীন আধ্যাত্মিক জাতি জগতে আ নাই, পাশ্চাত্য জাতি সমূহ ভারতে আসিয়া হিন্দুর নিকট সেই যোগ ভ আধ্যাত্মিকতা লাভ করিয়া আপনাদের সংসারাসক্তি এবং শারিরীক প্রবৃ সমূহের অধীনতা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে ইহাও ঈশ্বরের অন্যতর অভিপ্র

এবং পূর্ব্বপশ্চিমের মহামিলনে জগতে সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত এক অখণ্ড প্রেম পরিবার সৃজন হইবে এই জন্যই ভগবানের এই অপূর্ব্ব লীলা। সুতরাং ইংরাজরাজ যে কেবল গাজুরি করিয়া পার্থিব ভাবে এ দেশে আসিয়াছেন ব্রহ্মানন্দ তাহা মনে করেন নাই। হইতে পারে যাঁহারা এ দেশ জয় করেন তাঁহারা পার্থিব ভাব প্রণোদিত হইয়া তাহা করিয়াছেন, এবং আপনাদের অজ্ঞতা বশতঃ বিধাতার অভিপ্রায় নাও বুঝিতে পারেন, কিন্তু ভগবান তাঁহাদের দ্বারায় আপন ইচ্ছাপূর্ণ করিয়া লইতেছেন। ব্রহ্মানন্দ অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে ঈশ্বরের এই গূঢ় অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিয়াই বলিলেন যে ইংরাজের মন্ত্রীসভা, ইংরাজের কামান বন্দুকও ভারতরাজ্য শাসন করে না, কিন্তু স্বয়ং ঈশাই ভারতের যথার্থ রাজা, তাঁরই আত্মা ইহাকে শাসন পালন করিতেছেন।

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার দেবজীবনের প্রতিও ব্রহ্মানন্দের এক আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। উভয়ের দেখা শুনা আলাপের পর অবধি ব্রহ্মানন্দও মহারাণীকে আপন মাতৃবৎ ভক্তি করিতেন এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়াও ব্রহ্মানন্দকে একজন পরম বন্ধু বলিয়া আদর করিতেন। তাঁর শাসন সময়ে নববিধানের অভ্যুদয় হয় বলিয়াও তাঁর ও ইংরাজ রাজত্বের প্রতি ব্রহ্মানন্দের ঐকান্তিক রাজভক্তি আরও অধিক জন্মায়।

তাই বলিয়া তিনি ইংরাজ রাজত্বের দোষের প্রতিও যে একেবারে অন্ধ ছিলেন তাহা নহে। ইংরাজের সুরা এবং অন্যান্য মাদক ব্যবসায় কিংবা রাজপুরুষদিগের অত্যাচার অনাচারের প্রতি তিনি তীব্ররূপে আক্রমণ করিতেন এবং ইংলণ্ডে গিয়াও সেখানকার উক্ত

এ দেশের ট্রাষ্টরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা যদি সে কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে না পারেন ঈশ্বর এ দেশকে তাঁদের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইবেন। আবার প্রজাদিগকেও বলিয়াছিলেন, "তোমরা অকৃত্রিমভাবে ইংরাজ রাজকে রাজভক্তি অর্পণ করিবে। ইংরাজরাজ মানুবীয় ভুল ভ্রান্তিবশতঃ যদি কোনও কার্য্যে অবহেলা করেন তথাপি তোমরা রাজভক্তি দিতে অবহেলা করিবে না। কারণ ভগবান উহাঁদিগকে ভারতকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য এই দেশে প্রেরণ করিয়াছেন।" বাস্তবিক ভারতবাসীর তুল্য প্রাচীন সভ্য ও ধর্ম্মপ্রাণ জাতি জগতে আর নাই। কিন্তু পূর্ব্বে এত বড় হইলেও এক্ষণে এই জাতি হীন হইয়া পড়িয়া আছে তাই ভগবান এক বিজ্ঞানবিদ্ সুসভ্য এবং উচ্চ রাজপ্রনালী সমন্বিত জাতির হাতে ইহার ভার দিয়াছেন যে তাহারা ক্রমে ক্রমে ইহাকে এক গৌরবান্বিত ধর্ম্মপ্রাণ বলীয়ান জাতি করিয়া গড়িয়া তুলিবে এবং পূর্ব্ব পশ্চিম সমজীবন পাইয়া জগতে এক সার্ব্বভৌমিক প্রেমপরিপার হইবে। মানবীয় দুর্ব্বলতা বশতঃ ইংরাজ কখনও কখনও কোন কোন বিষয়ে ভুল ভ্রান্তি করিতে পারেন বটে, কিন্তু বিধাতার বিধানে যখন দুই জাতি একত্রিত হইয়া একছত্রাধীন হইয়াছে তখন তাঁর যা বিধান তা যথা সময়ে পূর্ণ হইবেই হইবে। ব্রহ্মানন্দের দূরদর্শিতায় তাই রাজভক্তি বিধি নববিধানে সংযোগ করিয়া তাঁহার অনুচরদিগকে যে কি বাঁচাইয়া দিয়াছেন তাহা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় বেশ বুঝা গিয়াছে। রাজা প্রজা উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব এবং শান্তি সংস্থাপনের জন্য ব্রহ্মানন্দ সততই চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দ এক দিকে যেমন মহারাজভক্ত তেমনি আর এক দিকে মহা স্বদেশ অনুরক্ত। ব্রহ্মানন্দের স্বদেশ হিতৈষণা বা স্বদেশপ্রিয়তা — — কেন না ইংরাজরাজের দ্বারায়

ভারতের প্রকৃত কল্যাণ হইবে এই বিশ্বাসেই তিনি ইংরাজরাজের এত পক্ষপাতী। তাঁহার স্বদেশের প্রতিও কিরূপ অনুরাগ ছিল নিম্নলিখিত উপদেশাংশ পাঠেই বুঝা যাইবে :—

"আমরা মাতৃভূমির চরণে নমস্কার করি। স্বধাম, প্রিয়ধাম, মাতৃভূমি, গৃহভূমি সহজে হৃদয়ের অতি প্রিয় ধন। ভারতের কত গৌরব।

"আমাদিগের ভারত অতিশয় ভাল। আমাদের হিমালয়, আমাদের সিন্ধু, আমাদিগের মা গঙ্গা, যমুনা গোদাবরী, কাবেরী নর্ম্মদা এমন নদী পর্ব্বত পাহাড় আর কোথায় আছে? তিন দিকে সমুদ্র এক দিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী হিন্দুস্থানের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

"চীনের দেশে চীনের ব্যবহার, ইংরাজের দেশে ইংরাজের ব্যবহার। হিন্দুস্থানে কত জাতি, কত লোক, কত ভাষা, কত ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার কত প্রভেদ, কত অগণ্য বিচিত্রতা। অন্য দেশে হয় শীত না হয় গ্রীষ্ম এখানে পাহাড়ে উঠিলে ঠাণ্ডা নীচে গরম; এক দিকে সমুদ্রের বাতাস, আর এক দিকে মরুভূমির প্রচণ্ড বায়ু।

"এ দেশের প্রাচীন ব্যবহার, প্রাচীন শাস্ত্র অনেক। আমরা প্রাচীন গ্রন্থ, প্রাচীন শাস্ত্র গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগকে প্রণাম করি। হে পূর্ব্বপুরুষগণ, তোমরা ধন্য! তোমরা আর্য্যকুলের শ্রেষ্ঠ ধন, তোমরা প্রাচীন কালের গৌরব।

"সে কালে উচ্চ সাধন ছিল, সভ্যতা ছিল, গভীর ধর্ম্ম ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, গৃহধর্ম্ম, পরিবারের নিয়ম ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীন কালে এ দেশে সকলই ছিল, বর্ত্তমানে কেবল রোদন; পূর্ব্ব পশ্চিমের সম্মিলনে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এমন সমুদয় বিষয় আসিয়াছে যাহাতে

"যত সাহিত্য, যত বিদ্যা, যত মহাজন, সমুদয় আমাদিগের দেশের গৌরব। এই দেশ হইতে কত জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য অপর শত শত দেশে বিস্তারিত হইয়াছে। যদি আমরা পূর্ব্বগৌরব রক্ষা করিতে পারি, তবে আমরা কেমন গৌরবান্বিত হই।

"এই হিন্দুস্থানে কত বড় বড় সাধু উদিত হইয়াছিলেন, যাঁহাদিগের কোথাও তুলনা নাই। আমরা ছোট জাতি নই, আমাদিগের জাতি ভাবিলে, দেশ ভাবিলে শরীর মন মহৎ হয়, জীবন সমৃদ্ধ হয়। এমন দেশে, এমন জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কেমন করিয়া দুঃখ করিব, কি করিয়া কাঁদিব জানি না।

"ভারতের ইতিহাস বড় বড় বীরশ্রেণীকে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছে। 'ওরে ক্ষুদ্র নীচাশয় উঠ, উঠিয়া পূর্ব্বপুরুষের গৌরব বৃদ্ধি কর। আর কত কাল কাল-নিদ্রায় থাকিবি। রে ক্ষুদ্র বাঙ্গালী হিন্দুস্থানবাসি দাঁড়া' এই শব্দ চার হাজার বৎসরের অধিক হইতে আসিতেছে। এই শব্দে আমরা সেই প্রাচীন আর্য্যমহর্ষিগণের সন্তান আর নিদ্রায় থাকিব না, দাঁড়াইয়া উঠিব, উঠিয়া যোগপর্ব্বতে আরোহণ করিব।

"ভারত অসার মৃতদেহ নহে, ভারতের কত কীর্ত্তি এখনও রহিয়া গিয়াছে। যে ভারতের গৌরব বুঝিতে আরও আঠার শত বৎসর যাইবে সেই ভারতের সন্তান আমরা। যে ভারতে শ্রীচৈতন্য, যে ভারতে শাক্য মুনি, যে ভারতে আর্য্যমহর্ষিগণ, সেই ভারতে আমাদের জন্ম।

"এবার বড় হইব, দেশের খুব আদর করিব। এই সোণার মাটী ভূষণ করিয়া গলায় হাতে পরিব। আমাদের ভারতের ধূলা সমুদয় স্বর্ণরেণু। আমরা আমাদিগের মাতৃভূমিকে পিতা পিতামহের ভূমিকে স্পর্শ করিয়া গৌরবের সহিত নাচিব। ঋষি, যোগী, বুদ্ধ সমুদয় মহাত্মাদিগের

বক্ষে ধারণ করিয়া সংসারকে গভীর নির্মল ও শান্তির আলয় করিব। আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণের মহত্ত্ব বুঝিয়া মহত্ত্বের মুকুট পরিধান করিব।

"হে দয়াময় আমাদিগের সমুদয় মাতৃভূমিকে তোমার বিশেষ করুণার সিন্ধুরে আকর্ষণ কর, যেন আমরা ইহাঁকে যথোচিত সেবা করিতে পারি, ইহাঁর প্রতি আমাদের যে বিশেষ কর্তব্য তাহা সাধন করিতে পারি, আমরা ইহাঁর নিকটে যে অচ্ছেদ্য ঋণে আবদ্ধ তাহার কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিতে পারি। যে ধর্মধনে ইনি আমাদিগকে ধনী করিয়াছেন ইহাঁকে আমরা সেই ধনে ধনী করিব, সেই সুখে সুখী করিব।

"হে ভারত, তোমার গ্রন্থ, তোমার জীবন, তোমার ধর্মভাব, তোমার হিন্দুজাতি কাহারও প্রতি অকৃতজ্ঞ হইতে পারি না। আমরা তোমার উপযুক্ত হইতে পারি তোমার মুখ উজ্জ্বল করিতে পারি এই আমাদিগের কামনা। হে মাতা মা, আমাদিগকে তোমার ভারতের উপযুক্ত কর।"

ব্রহ্মানন্দের দেশানুরাগ কি গভীর কি প্রকৃত এবং আন্তরিক। আধুনিক কোন কোন দেশহিতৈষীদিগের ন্যায় ইহা মৌখিক বা ইংরাজবিদ্বেষপরতন্ত্র কি কেবল নামকিওয়াস্তে নহে। বাস্তবিক যাহাতে আমাদের প্রকৃত জাতীয় জীবন গঠন হয় এবং স্বজাতীয় পূর্ব্বগৌরব পুনঃ দিপ্ত হয় ব্রহ্মানন্দ তাহারই চেষ্টা করিয়াছেন। কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন করিয়া অপরিণত মস্তিষ্ক বালকদিগকে খ্যাপাইয়া কখনই ভারতের উদ্ধার বা জাতীয় জীবনের উন্নতি হইবে না। কেবল গায়ের জোরেও আমাদের এ দেশ বড় হইতে পারিবে না। "ধিক্ বলং ক্ষত্রিয় বলং" বহুকাল হইতে এ দেশ বুঝিয়াই "ব্রাহ্মণ্য বলং বলং" ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সেই ধর্ম্ম বলে, ব্রাহ্মণ্য

এক ধর্ম, এক জাতি না হইলেও জাতীয় একতা বা জাতীয় জীবন হইতেই পারে না, ব্রহ্মানন্দ তাহাই করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তা ছাড়া সমগ্র মানবজাতি যাহাতে এক জাতি হইয়া জগৎব্যাপী স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় ইহাই ব্রহ্মানন্দের মহান উদ্দেশ্য, নববিধান প্রবর্ত্তনা দ্বারায় তিনি তাহারই সূত্রপাত করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ যদিও ব্রহ্মানন্দের সমাজসংস্কার বা জাতিভেদ নিবারণ চেষ্টা সমর্থন করিতেন না, তথাপি একদিন আমাদের সম্মুখে ভাবাবেশে উৎসাহিত হইয়া স্বীকার করেন, "ব্রাহ্মধর্ম্ম যথার্থই এক নূতন বিধান, এ বিধানের দ্বারায় যে কেবল ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে তাহা নহে, ইহা দ্বারায় Political regeneration ও (রাজনৈতিক নবজীবনও লাভ) হইবে। কেন না ইহা দ্বারায় International, Interacial (অন্তর্জাতিক, অন্তর্দেশীক) বিবাহ যতই হইবে ততই পর স্পরের সংমিশ্রণে নবজাতির অভ্যুদয় হইবে এবং তাহার দ্বারাই ভারতের সমীচিন উদ্ধার হইবে।" তিনি দৃষ্টান্ত স্বরূপে ইহাও বলিলেন যে "এই যে বাঙ্গালী জাতি, ইহা ভারতের সকল জাতি অপেক্ষা কি জন্য এত বুদ্ধিমান জান ? সেই যে পাঁচজন কান্যকুব্জ থেকে ব্রাহ্মণ এসে এখানকার ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিবাহিত হইয়াছেন, তাহা থেকেই এমন বুদ্ধিজীবি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।"

বাস্তবিক ব্রহ্মানন্দের রাজনীতি বা সমাজনীতি অদূরদৃষ্টি সমন্বিত নহে। পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলনে এক মহান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্মে এবং কর্ম্মে, উচ্চ আধ্যাত্মিকতার এবং তীক্ষ্ণ বৈজ্ঞানিক কর্ম্মশীলতার সংমিশ্রিত এক নব্যভারত জাতি যাহাতে অভ্যুত্থিত হয় তাহাই তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা, কারণ তাহা না হইলে ভারতের প্রকৃত উন্নতি সংসাধিত হইবে না ; এবং [illegible] কোন রাজারই সাহায্যে তাহা হইতে পারে না,

এই জন্যই ব্রহ্মানন্দ এই রাজার এত ভক্ত। তা ছাড়া যখন ইহাই বিধাতার বিধান তখন ইহার উপর কলম চালাইতে গেলে চলিবে কেন।

বর্ত্তমান কালে যে সকল রাজদ্রোহিতার ভাব দেশে এখন প্রকাশ পাইতেছে ব্রহ্মানন্দ আশ্চর্য্যরূপে তাহা ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে জানিয়া বহুদিন পূর্ব্বে সে সকলের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। অল্পমতি যুবকদিগকে রাজনীতি আন্দোলনে লিপ্ত করার তিনি অতিশয় বিরোধী এবং ইহা দ্বারায় তাঁহার সকল্পিত দেশ হিতকর অনুষ্ঠানের উন্নতি যে অর্দ্ধ শতাব্দি পশ্চাৎগামী হইবে ইহা স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ তাই বলিয়াছেন "নববিধান মণ্ডলী চিরদিন রাজপক্ষই সমর্থন করিবেন।" এক্ষণে আমাদের প্রকৃত স্বদেশ-প্রিয়গণ তাঁর ভাব বুঝিয়া ব্রহ্মানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেই দেশের যথার্থ কল্যাণ করিতে সমর্থ হইবেন। কারণ তাঁহাকেই বিধাতা নব্যভারতের নব্যজাতি-নির্ম্মাতা নেতারূপে প্রেরণ করিয়াছেন।

নববিধান বিস্তার।

শ্রীব্রহ্মানন্দ প্রশ্নকারীর উত্তরে "মিরার" পত্রে লিখিয়াছেন "ব্রাহ্মসমাজ এক আধ্যাত্মিক শক্তি। ইহার বিস্তার প্রত্যক্ষভাবে নয়, কিন্তু অপ্রত্যক্ষভাবে হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ বাহ্যতঃ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগকে সে ধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে তত পারেন না, কিন্তু ইহার আত্মিক ভাব সমগ্র হিন্দুসমাজে কার্য্যতঃ সঞ্চার করিতেছেন। শিক্ষিত ভারত অজ্ঞাত ভাবে ইহার সংস্কারিণী শক্তি আশ্রয় করিতেছেন।"

য়াছি নববিধান কেবল মত নয়, নববিধান নবজীবন। যদি ইহা কেবল মত হইত নববিধানের মূল সত্য কয়টী কেবল মতে মানিলে চলিত, কিংবা পুরাতন ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রথানুসারে কেবল মত স্বীকার পূর্ব্বক দীক্ষা লইলে বা জলসংস্কার লইলেই সব হইত তাহা হইলে এখন এ মণ্ডলীর যে অবস্থা, তাহার অনেক প্রসারণ হইতে পারিত, ইহাতে লোকসংখ্যাও অনেক বাড়িত। কিন্তু যথার্থ পরিবর্ত্তিত জীবন না হইলে নববিধানের লোক কেহই হইতে পারেন না বলিয়া এখনও নববিধানের সংখ্যাগত বিস্তার বড় হইতেছে না; বরং যাঁহারা এই মণ্ডলীতে এক সময়ে উৎসাহে পড়িয়া নাম লেখাইয়া ছিলেন তাঁহারাও ইহার উচ্চ আধ্যাত্মিকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া পিছাইয়া পড়িতেছেন, এবং ইহাও হইতে পারে ক্রমে ক্রমে পূর্ণ নববিধানীর ছেলে মেয়েরাও এ ধর্ম্মের অভ্যন্তরিন্ ভাবে প্রবেশ করিতে না পারিয়া কিংবা দুর্নীতি পরতন্ত্র হইয়া এ ধর্ম্ম ভ্রষ্টও হইয়া যাইবে। আবার অনেকে হয় তো নববিধানবাদী হইলেও যথার্থ নববিধানজীবী অতি অল্পই থাকিবে।

কেন না ব্রাহ্মসমাজের আদি অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া নববিধানের বিকাশে যে মহান্ নবধর্ম্ম বা নব-ধর্ম্মসামঞ্জস্য-বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা কখনই বর্ত্তমান মানবসমাজ একেবারে ধারণ করিতে সক্ষম নহে। ব্রহ্মানন্দও তাই বলিয়াছেন যে বিশ হাজার বৎসর পরে মানবসমাজ তাঁর ধর্ম্ম যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। কোন দ্রব্য আহার করিলে তাহা যেমন হজম হইয়া রক্তেতে এবং মাংসেতে পরিণত হইতে ও তদ্দ্বারা শরীরকে পরিপুষ্ট করিতে যথেষ্টই সময় লাগে, প্রাতঃকালীন সূর্য্য যেমন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর জ্যোতিতে

ক্রমে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে নববিধানানুরূপ আদর্শের পূর্ণতায় পরিণত করিতে অনেক সময় লাগিবে।

তাছাড়া ভিতরে ময়লা কি বিষ থাকিতে রোগের অবস্থায় যেমন কোন ব্যক্তির অমোঘ ঔষধও ফলদায়ক হয় না, রোগীর পক্ষে এমন যে প্রাণ রক্ষার উপযোগী অন্ন বা জল ইহাও অরুচিকর কি তিক্ত বোধ হয়, সেইরূপ মানবসমাজের বর্ত্তমান জড়রোগ বা মোহরোগগ্রস্থ অবস্থায় নববিধানের স্বর্গীয় শক্তি এখনও তত অধিক কার্য্যকারী হইতেছে না এবং তাহা হইবারও নহে, কেন না ক্রমে ক্রমে মানবসমাজের আভ্যন্তরিন ময়লা বা বিষ অপনোদিত না হইলে নববিধানের মহাভাবের প্রভাব বাস্তবঃ পরিপুষ্ট হইতেই পারে না। তাই এখনও সর্ব্বত্রই প্রায় নববিধান দুর্ব্বোধ্য হইয়া রহিয়াছে। এমন কি সাধারণ হিন্দুসমাজ হইতে সাধারণতঃ ব্রাহ্মসমাজ অনেকটা মতে বা শিক্ষাতে উন্নত হইলেও নববিধানের উচ্চ তত্ত্ব সম্যক-রূপে এখনও ধারণ করিতে পারিতেছেন না। যদিও ঐকান্তিক ধর্ম্মানুরাগ বা যথার্থ শীক্ষার্থীর ভাবের অভাব, সরল-বিশ্বাস বিহীনতা এবং পাণ্ডিত্যাভিমান ও এখনকার বিচার বুদ্ধির প্রাধান্যই ইহার অনেকটা কারণ, এবং রোগগ্রস্ত-ব্যক্তির অভ্যন্তরস্থ বিষের ন্যায় এ সমুদয় অপসারিত না হইলে কেহ নববিধানের উচ্চ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না, তথাপি নববিধানের অলৌকিকত্বও সাধারণ বুদ্ধিতে ইহা বুঝিবার পক্ষে সামান্য অন্তরায় নহে। তাই ব্রহ্মানন্দ বলিলেন "তুমি অলৌকিক ধর্ম্ম দিলে, কিন্তু সকলই যে লৌকিক ইহাতে হইবে কেন।" আরও "নববিধান যে অনেকের কাছে দুর্ব্বোধ্য রহিল" এই বলিয়া সেবকের নিবেদনে বলিলেন :—

"এক ঈশা এক মূষা এক বুদ্ধ এক গৌরাঙ্গকে চিনিতে কত দেরী

একজন করিতে চাহিতেছেন, চারি জনের মিলন করিতেছেন, ইহা পৃথিবী কিরূপে বুঝিবে? বৈরাগ্য কি তাহা লোকে বুঝিতে পারে, সংসার কি, তাহাও বোঝা যায়, কিন্তু নববিধান যদি বলেন, সংসারও যা, বৈরাগ্যও তা, অমনি আর লোকে বুঝিতে পারে না। আপনার স্ত্রী পুত্র লইয়া গৃহ কর্ম্ম করার যে পথ, সন্ন্যাসী হইবারও সেই পথ;—আর লোকে বুঝিল না। যোগ কি, বড় বড় যোগী যখন বুঝাইতে পারিলেন না, ভক্তি কি, সহস্র সহস্র ভক্ত যখন ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম হইলেন, তখন নববিধানের পরী আকাশে উঠিয়া বলিতেছেন, যোগের পথে গেলে ভক্তিকে পাওয়া যায়, ভক্তির পথে গেলেও যোগকে পাওয়া যায়, কি অসম্বদ্ধ কথা!! মনে মনে আলোচনা করিয়া কতরূপে বুঝাইতে গেলাম ততই লোকে বুঝিল না। ভ্রম দূর করিবার জন্য কত যত্ন করিলাম বিফল-প্রযত্ন হইলাম।"

সেইরূপ নিরাকারের উপাসনা কি অনেক লোক হয় তো বুঝিতে পারেন, প্রতিমার আরতি কি তাহাও বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মকে দেখা শুনাও তাঁর দীপালোক দ্বারায় আরতি, ইহার মর্ম্ম কেহই বুঝিতে পারেন না। ঈশ্বর স্বয়ং অবতার হইয়া মনুষ্য আকার ধরেন ইহা লোকে কল্পনা করিতে পারে, আবার মানুষ যিনি তিনি যেমন তুমি, আমি তেমনি সাধারণ মানুষ, ইহাও তো বুঝা যায়, কিন্তু ভক্ত স্বয়ং ঈশ্বরাবতারও নন, সাধারণ মানুষও নন, কিন্তু ঈশ্বরাবতার মানুষ, এ হেঁয়ালী কে বুঝিবে? একজনই একাধারে গোঁড়া হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান, ইহা কি সহজে বুঝা যায়? বাস্তবিকই সাধারণ বুদ্ধির অবোধ্য এ নববিধান এবং সেই জন্যও ইহা নূতন বিধান। যথার্থই সাধারণ বিচার বুদ্ধির দ্বারায় ইহা বুঝবারও নহে, কেন না [illegible] আলোক বিনা ইহার তত্ত্ব

কিছুই কি বুঝিবার যো আছে? এবং সর্বসাধারণ জনগণ আপনাদের বিচার বুদ্ধি ছাড়িয়া প্রত্যেক কার্য্যে পবিত্রাত্মার আদেশ লইয়া চলিবে ইহাও কি সহজে এখনই হইবে? তবে ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন "নববিধান প্রত্যাদেশের ঝড়।" ঝড়ে যেমন বৃক্ষ সকল সমূলে উৎপাটিত হয়, ঘর বাড়ী চূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হইয়া যায়, সেইরূপ ব্রহ্মবাণীর ঝড়ে মানবের আমিত্ব অহং-এর মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইলে, সাংসারিকতার গৃহ একেবারে চূর্ণ হইলে তবে নববিধানের নূতন গৃহ নির্ম্মাণ হইবে, প্রত্যাদেশের নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ইহার কারণ এই যে যখনই কোন বিধান বিধাতা প্রেরণ করেন জোয়ারের প্রারম্ভিক বাণের ন্যায় সময়ের বহু পূর্ব্বে তাহা আসিয়া থাকে। নদীতে বাণ ডাকিয়া দেখাইয়া দেয় নদীর জোয়ার কত দূর ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে, তার পর ক্রমে ক্রমে জোয়ারের জল বাড়িয়া নদীকে ভোরপুর করিয়া তোলে। সেইরূপ মানবমণ্ডলী নববিধানের জোরে নববিধানের জোয়ারে কত দূর উঠিবে তাহা একবার দেখাইয়া দিয়া ক্রমে বিধানের শক্তি মানবসমাজকে উদ্বেলিত করিতেছে। তাই প্রত্যক্ষভাবে ইহার বিস্তার বহুল পরিমাণে না হইলেও, ইহার প্রভাব যে জগতে সঞ্চালিত হইতেছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীব্রহ্মানন্দ বলিলেন "দুইজন সাধু মহাত্মা আপন আপন হৃদিস্থিত ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানুরাগ বলে হিন্দুসমাজকে উন্নত ও বিশুদ্ধ করিয়া এত দূর উচ্চ স্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন যে বহুদিন হিন্দু-সমাজ আর কেবল হিন্দুসমাজ থাকিতে পারিল না। সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্ম-সমাজের সাম্প্রদায়িকতার বন্ধনও খসিয়া পড়িল হিন্দুধর্ম্মের নিশানের পরি-

ব্রহ্ম সমস্ত জগতের ব্রহ্ম হইলেন। জগতে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল।" বাস্তবিক এই যে চারিদিকে কিছু একটা নূতন ধর্ম্মলাভের পিপাসা, হিন্দুগণ আর পুরাতন হিন্দু দেব দেবীতে তুষ্ট হইতেছেন না, তাহার একটা নূতন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা না দিলে যেন মন তৃপ্ত হয় না; কিম্বা এই যে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন নূতন দল উঠিতেছেন, যাঁহারা পুরাতন মতে তুষ্ট নন অথচ দুর্ব্বলতা বশতঃ একেবারে তাহা ত্যাগ করিতেও পারেন না, তাই একটা নূতন কোন রকম কিছু মত করিয়া মনকে প্রবোধ মানাইতে চেষ্টা পাইতেছেন। এই যে জগতের স্থানে স্থানে শান্তি সংস্থাপক সভা হইয়া শাস্ত্রে শাস্ত্রে ধর্ম্মে ধর্ম্মে প্রণালীতে প্রণালীতে সম্মিলন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, যাহার বিষয়ে শ্রীব্রহ্মানন্দ বহুপূর্ব্বে টাউন হলের বক্তৃতায় ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন, এ সমুদয়ই নববিধানের নবজীবন উদ্দীপনী শক্তির প্রত্যক্ষ কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাদের দেশেও বর্ত্তমানে যে নানাপ্রকার স্বদেশীয় আন্দোলন হইতেছে ইহার মধ্যেও নববিধানেরই প্রভাব গূঢ়রূপে লুক্কায়িত দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি তাঁর বিরোধীদের সম্বন্ধেও ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন "তাহারা আপন বিরুদ্ধতা স্বত্তেও আমারই কাজ করিতেছে, আমি তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া বুঝিতেছি তাহারা আমারই পুনঃ প্রকাশ।" তিনি অন্য এক সময় বলিয়াছেন "নববিধান জগতকে কামড়াইয়া ধরিয়াছে, কার সাধ্য ইহার প্রভাব অতিক্রম করে?" আরো বলিয়াছিলেন যে জগতের সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই নূতন নূতন উন্নত দল ক্রমে উঠিবে এবং তার পর সকল উন্নতদল ক্রমে ক্রমে মিলিয়া বিশুদ্ধতা লাভ করিয়া নববিধানে একাকারে মিশিয়া যাইবে, এবং পরে পূর্ণ নববিধান জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহারই লক্ষণ চারিদিকে দেখা যাইতেছে।

তবে গঙ্গাজল যেমন জোয়ারে বাড়িয়া খাল বিলে প্রবেশ করিয়া তাহা-দিগকে বাড়াইয়া তুলিলেও তাহাদের যা আবর্জ্জনা ময়লা থাকে তাহা থেকে থাকিবেই এবং সেই খাল বিলও আর গঙ্গা হইয়া যায় না, সেইরূপ উপ-রোক্ত যে সমুদয় নব নব সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম চালান তাহা আর নববিধান নহে এবং তাহারা যে আবর্জ্জনা ময়লা বিবর্জ্জিত তাহাও বলিতে পারা যায় না।

যাহা হউক নববিধান শক্তি বা ব্রহ্মতেজধারী ভক্তশক্তি যেন মানব-মণ্ডলীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়া নানা স্থানে নানা বিভাগে নানা প্রকারে আপন কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। পৌরাণিক আখ্যায়িকায় যেমন আছে সতী যখন দেহ ত্যাগ করিলেন তখন তাঁর সৎপতি মহাদেব সেই সতী দেহ লইয়া জগতে ছড়াইয়া দিলেন এবং তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেখানে পড়িল সেই স্থানেই এক এক তীর্থ হইল। আমরাও দেখিতেছি ভক্ত সতী ব্রহ্মানন্দকে ব্রহ্মাণ্ডপতি চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছেন এবং যে দিকেই তাকাই সেই দিকেই তাঁরই প্রভাব বিস্তার হইতেছে ইহাও দেখিতে পাই।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি ব্রহ্মানন্দ দেহ ত্যাগের কিছু দিন পূর্ব্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন তাঁহাকে বলেন যে "তোমাকে সেই যে আচার্য্য এবং প্রচারক করিয়া আমি পরিব্রাজক হইয়াছি সেই পরিব্রাজকই আছি তুমিই আচার্য্য এবং প্রচারক, তোমার গুণেই দেশ দেশান্তরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইতেছে। তুমি আরও এই ধর্ম্ম প্রচার কর," ইহার উত্তরে ব্রহ্মানন্দ বলেন "হাঁ। এখনও তো আমার অনেক বলিবার ও করিবার আছে।" বাস্তবিক এ দেহেই থাকিয়া অনেক বলিবেন ও করিবেন বলিয়া যে এ কথা বলিয়াছিলেন তাহা নহে।

তাঁহারই কথা তিনি বলিয়াছেন এবং এই যে সমুদয় আন্দোলন জগতের নানা স্থানে হইতেছে তাহা তাঁহারই আত্মার কার্য্য ভিন্ন আর কি?

এক্ষণে এই নববিধান কি করিয়া আপনার শক্তি প্রকাশ করিল এবং ইহা কিরূপেই বা জগতে জয়যুক্ত হইতেছে ও হইবে এ সম্বন্ধে ব্রহ্মানন্দ কয়েকটী প্রার্থনায় যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন এইখানেই তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"হে প্রেমসিন্ধু, প্রথমে লোকে তত বুঝিতে পারে না, ক্রমে লোকে বুঝিতে পারিতেছে, নববিধান কি। এইরূপে ক্রমে ক্রমে একজন লোক হইতে আর একজনের চক্ষে নববিধানের আলো প্রকাশ হইতেছে। নববিধান এখন ক্ষুদ্র শিশু, ক্রমে উন্নত হইবে। আমরা আগে মনে করি নাই যে ইহা এত বড় প্রকাণ্ড ধর্ম্ম হইয়া উঠিবে। পৃথিবী ইহার রাজধানী হবে, স্বর্গরাজ এর রাজা হবে। সকলে মানিতেছে ইহা একটী বৃহৎ ব্যাপার।

'আমরা পুতুলখেলা করিতেছিলাম, একটা প্রকাণ্ড ধর্ম্ম হইল। দেশ বিদেশের পণ্ডিতেরা এ ধর্ম্মের আলোচনা করিতেছেন। এত বড় প্রকাণ্ড ধর্ম্ম হবে ভাবিয়া আমরা আরম্ভ করি নাই।

"প্রথমে আমরা ব্রাহ্ম হইলাম। তার পর ঈশা মুষার প্রতি একটু ভক্তি হলো, তার পর হরিনামের সুধা আরো গড়াইল। কতকগুলি সামান্য সামান্য লোক কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া ছেলেখেলার প্রচার করিতে করিতে হইল প্রচারক, তার পর হইল প্রেরিত। একটু বৈরাগ্য করিতে করিতে হইল গৃহস্থ বৈরাগী। আমরা পুকুরে স্নান করিতেছিলাম করিতে করিতে — দুটী চারিটী ফুল লইয়া তোড়া বাঁধিতেছিলাম,

তার পর দেখি স্বর্গের পুষ্পোদ্যানে বসিয়া আছি। তুমি আমাদিগকে খেলাঘর করিতে ডাকিয়া আনিয়া শেষে কোথায় ফেলেছ। এখন দেখি শাস্ত্র, মন্ত্র, তীর্থ, হোম, অনসংস্কার প্রকাণ্ড একটী ধর্ম্ম বিধি। এর ভিতর আপনার ইচ্ছায় কিছু করিতে পারি না, লোকে বলুক না বলুক, বুঝিতেছে যে একটী প্রকাণ্ড ধর্ম্ম। দয়াময় এখন আর ছেলেখেলা নয়, সত্য ধর্ম্ম আসিয়াছে। যেন আমরা উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারায় তোমার বিধান পূর্ণ করি।—দৈঃ প্রার্থনা, 'বিধানের পূর্ণতা সাধন।'

"সত্য যাহা তাহা সত্য। বিধান যাহা তাহা বিধান। আদেশ যাহা তাহা আদেশ। এক লক্ষ লোক যদি সভা করিয়া আক্রমণ করে, প্রতিবাদ করে, তবু এক তিল অন্যথা হয় না। এব বিশ্বাস করিয়া ধরিয়া আছি। সমুদ্রে ভয়ানক ঝড় তুফান হইতেছে, তবু সমুদ্র পার পাইব বিশ্বাস করিতেছি। সমুদ্রে যে জাহাজ ছাড়িয়া দিয়াছি তাহা সমুদয় ঝড় তুফান অতিক্রম করিয়া শান্তিউপকূলে পৌঁছিবে। প্রেমময়, তোমার ভারতকে বাঁধিয়াছি নববিধানের সঙ্গে। যা লক্ষ বৎসরে হয় নাই নববিধান তাহা করিলেন।

"হে নববিধানের বিধাতা, দেখ যে দেশকে মনোনীত করিয়াছিলে তোমার নববিধানের জন্য, তাহাতে তোমার ইচ্ছা সফল হইল কি না। পাঁচটা কাকের ঝগড়াতে তাহার কি হইবে? জ্ঞান, যোগ, প্রেম, ভক্তি বিবেকের মিলন হয়েছে। দুর্গার সঙ্গে বুদ্ধের সাক্ষাৎ হয়েছে। ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গের বাড়ীতে গিয়াছেন। তোমার উদার ধর্ম্ম সকলকে নাঁ দিতেছে দেবতারা মহাসুরে গান ধরেছেন, ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ বাজাইতেছেন, আর

"তোমার আসল সত্য যা, তা কেউ অস্বীকার করিতে পারিবে না। তা যে প্রমাণ হয়েছে। ভারত যে টলমল করিতেছে। নববিধান যে হয়েছে। ঐ যে গৃহস্থের উঠানে নববিধানের চারা অঙ্কুর হয়েছে। ঐ যে সাকার দুর্গাকে আস্তে আস্তে সরাইয়া চিন্ময়ী দুর্গার পূজা আরম্ভ করা হয়েছে। মা দয়াময়ি, বাগানের সকল ফুলের এক তোড়া হয়েছে। ভারি সুখের কাজ হইল। যারা শত্রু ছিল তাদের মিলন হইল। হিন্দু কি না মুসলমানের বাড়ী যাচ্চেন! ভিতরে ভিতরে ঈশার শিষ্যেরা কি না নগরকীর্তন কচ্চেন! মা, আমাদের সকলে খুব গালাগালি দিক্, কিন্তু যেন বিধান গ্রহণ করে। হায় রে ভারত!! এবার তোমার উদ্ধারের সময় এসেছে।

"আমরা যেন আনন্দময়ের মন্দির স্থাপন করিয়া, জীবনের কাজ সিদ্ধ হইল, তোমার নববিধান পূর্ণ হইল তোমার নামে চারিদিক টলমল করিল ইহা স্বচক্ষে দেখিয়া স্বকর্ণে শুনিয়া পরমানন্দে আনন্দিত হইয়া আনন্দময়ী তোমার চরণে চির দিন আশ্রিত থাকি।—দৈঃ প্রার্থনা, 'বিধানের জয় দর্শনে।'

"তোমার নববিধানের জন্যই আমরা পৃথিবী ভাবিলাম; নতুবা কেবল কলিকাতা বা বঙ্গদেশ ভাবিতাম। বিধান আসিয়া আমাদের চক্ষুকে প্রশস্ত ক্ষেত্র দেখাইয়া দিয়াছে, হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়াছে। আমরা চাই যে যত দেশে যত পাপী আছে পরিত্রাণ পায়, যত দেশে যত মূর্খ আছে জ্ঞান পায়, যত দেশে যত উপধর্মী আছে এই নববিধানের আশ্রয় লয়, যত অবিশ্বাসী নাস্তিক আছে তোমার চরণে মস্তক অবনত করে। সকলের ঘরে ঘরে নববিধানের ছবি থাকিবে। সাহিত্য বিজ্ঞানবিদ্ সকলে এই বিধানের তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিবে। এই সেই ধর্ম্ম হরি, ভাবিলে

কি হয়! যে দুটী পাঁচটী লোক গালাগালি দিবে তারা কোথায় পড়ে থাকবে। তাঁদের নাম থাকবে না। সার যা তাই থাকবে। আমরা সার কথা কচ্চি। তোমার পদসেবা কচ্চি।

"আমরা বেঁচে গেলাম, বড় হলাম। যে বাড়ীতে ভবিষ্যতে মানবকুল বাস করবে সে বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে পাইতেছি। এই পুরস্কার চাই যে আমরা যেন পৃথিবীর ভাল করে যেতে পারি। মা, আমরা যেন লোকের কথা না শুনি।—দৈঃ প্রার্থনা, 'বিধানের মহত্ব।'

"নববিধান যে অতি প্রশস্ত ব্যাপার। এ যে বিস্তীর্ণ ধর্ম্ম, প্রকাণ্ড ধর্ম্ম, এসিয়া আমেরিকাকে গ্রাস করিল। আমি কথা কহিলাম ছোট ছোট স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে, এখন কথা কচ্চি প্রকাণ্ড পৃথিবীর সঙ্গে।

"আমরা ছোট গ্রামের জন্য প্রেরিত নই, আমরা মহাসমুদ্র প্রকাণ্ড পৃথিবীর জন্য প্রেরিত। ভারতে করেছি প্রচার সম্মিলনের মন্ত্র, এখন পৃথিবীতে প্রচার করিব তোমার সম্মিলনের মন্ত্র। রাজা হব মেদনীপুরে, রাজ্য করিব আনন্দের রাজ্যে। এবার ভারি মিলন হবে, প্রত্যাদেশের ঝড়ে হৃদয়ের সব দরজা খুলে দাও। সময় আসিতেছে, ভগবান্ যখন বড় বড় ভূখণ্ড আসিবে আর আমি গৃহে স্থান দিব। আমি দুই ভূখণ্ডকে দুই দিকে রাখিব।

"ধর্ম্মসম্প্রদায়ে ধর্ম্মসম্প্রদায়ে কতকাল আর ঝগড়া থাকিবে? দুঃখের নিশি কবে অবসান হবে? মা পৃথিবীর ক্রন্দন শুন। নববিধান এয়েছেন, সব ধর্ম্ম মিলিয়ে দাও। হাতে হাতে মুখে মুখে বুকে বুকে মিল করে দাও। যত ভাই যত ভগিনী তোমায় মা মা বলে ডাকবে। সকল জাতি তোমাকে ডাকবে। একটী বিস্তীর্ণ নববৃন্দাবন করে দাও,

মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত হই, এবং সমস্ত জাতি সমস্ত পৃথিবী তোমার হইয়াছে দেখিয়া কৃতার্থ হই।—দৈঃ প্রার্থনা, 'মহত্ত্ব লাভ।'

"মা, তোমার আদেশে নববিধান আমরা দেশবিদেশে প্রচার করিতেছি, কেন না তোমার এই শান্তিদায়ক ধর্ম্মের প্রসাদে পূর্ব্ব পশ্চিম এক হবে, ইয়োরোপ আসিয়া এক হবে। মা, তোমার ধর্ম্ম ভিন্ন অশান্তি যাইবার উপায় নাই।—দৈঃ প্রার্থনা 'প্রেমরাজ্য।'

"তোমার নববিধান যে প্রেমের ধর্ম্ম, যাহাতে শত্রুতা অক্ষমা, বিবাদ বিসম্বাদ দূর হইবে, এবং সকল মনুষ্য প্রেমে বদ্ধ হইয়া আনন্দে তব গান করিবে। আমরা পৃথিবীর বিবাদ বিসম্বাদ দূর করিয়া ধর্ম্মার্থীদিগের মধ্যে প্রেমের বন্ধন স্থাপন করিয়া দিব। সকল বিধর্ম্মী মিলিয়া এক প্রেমে বদ্ধ হইবে; সাধু অসাধু, ধনী নির্ধনী মিলিত হইবে। হে ঈশ্বর, সহস্র শত্রুতা সত্ত্বেও যদি মানুষ পরস্পরের পদধূলি চুম্বন করিতে পারে তবেই নববিধান প্রতিষ্ঠা হইল।—দৈঃ প্রার্থনা, 'প্রেমরাজ্য স্থাপন।'

"হে গুণনিধি, তোমার প্রিয় সন্তান তোমার প্রতিনিধিরূপে পৃথিবীকে বলিয়া গিয়াছেন যে বিশ্বাসীরা এই পৃথিবীকে লাভ করিবে। বাস্তবিক হরি, আমাদিগের লোভ ঐ দিকে। এই পৃথিবীকে তুমি রেখে দিয়াছ যে পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে উপযুক্ত হলে ইহার অধিকারী হবে। হে শ্রীহরি, মনে জানা চাই যে পৃথিবী আমার হস্তে, দান পত্রটী সই হয়েছে। ভিতরে ভিতরে পৃথিবীর এক সীমা থেকে অন্য সীমা পর্য্যন্ত আমাদের হয়ে যাবে। সত্যে মিলন, প্রেমে মিলন, শত্রুরা তো কিছুতে পুত্রের অধিকার হইতে পুত্রকে বঞ্চিত ক'রতে পারবে না। হোক্ না মস্ত লুণের ঢিপি একবার জল যখন ঢুকেছে ওর ভিতরে, সমস্ত ধসে যাবে। যে সুধা পাঠাইয়াছ, যে অমিয় মাখাইয়া প্রেম পাঠাইয়াছ, তাহা পৃথিবী অবিশ্বাস করিলেও পান করিতে

হবে। দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে যেখানে বড় বাধা, হরিনাম আস্তে আস্তে চোরের মত সেখানে প্রবেশ করেছে। লোকে বল্‌বে লড়াই হল না, আপনাদের লোক ভাল হল না। ওদিকে আস্তে আস্তে মা আপনার রাজ্য বিস্তার করিতেছেন। বুঝেছি পিতা পৃথিবী আমার আমাদের। আমরা পৃথিবীকে দখল কর্‌ব আর বল্‌ব সমস্ত জগৎ সংসার নববিধানের হয়ে গিয়েছে। একটা তো গ্রামের কথা হচ্চে না, পৃথিবীকে, মা, তুমি দিয়াছ। পাশে পাড়ার লোক গোল করে অধর্ম্ম কর্‌বে তাতে কি? তুমি পৃথিবীকে দিয়েছ।

"দেখি, হৃদয় মধ্যে সমস্ত আয়োজন করে যাও। দখলের দিন আস্‌বে যখন তখন সত্যের জয় দেখে যাব। পৃথিবীকে দেখাতে হবে দখলের হুকুম। পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে তোমার নিকট দাঁড়াব। পৃথিবীর লোক নিয়ে নববিধানে ঢুকিব।—হিঃ প্রার্থনা, 'রাজ্য অধিকার।'

শ্রীব্রহ্মানন্দ-জননী বা "কেশবের মা।"

ব্রহ্মানন্দ কে ও তাঁর নববিধান কি নিবেদন করিয়াছি। এক্ষণে ব্রহ্মানন্দ-জননী কে অর্থাৎ তাঁর কৃত ব্রহ্মনিরূপণ কি তাহার কিছু আলোচনা আবশ্যক। কেন না ব্রহ্মানন্দের মা কে না জানিলে ব্রহ্মানন্দকেও ঠিক চেনা যাইবে না, নববিধান কি তাহাও উপলব্ধ হইবে না। তাই ব্রহ্মানন্দ নিজ মুখে বলিলেন "আমার মা বড্ড ভাল রে বড্ড ভাল, তোরা আমার মাকে চিন্‌লি না?" সঙ্গীতাকারও

জননী” বা “নববিধানের হরি” একই। কিন্তু মা, হরি বা ব্রহ্ম তো সেই একই তবে ব্রহ্মানন্দ-জননী বা নববিধানের হরি এরূপ বিশেষণের তাৎপর্য্য কি? ব্রহ্মানন্দ স্বয়ং একবার প্রার্থনায় বলিয়াছেন “ঈশ্বর আছেন তিনি তো চিরকাল সমান, কিন্তু প্রাপ্ত ঈশ্বর তিনি কি সমান?” অর্থাৎ সর্ব্ব-বাধ্য পরব্রহ্ম যিনি, তিনি তো একই, তবে ব্রহ্মানন্দ যে ব্রহ্ম নিরূপণ বা দর্শন করিয়াছেন তাহা এবং বেদের উপলব্ধ ব্রহ্ম একই নহে। তাই তাঁহাকে ব্রহ্মানন্দ জননী বা নববিধানের হরি বলিয়া আমরা অভিহিত করিয়াছি। বাস্তবিক ব্রহ্মানন্দের ধর্ম্ম বিধান যেমন নূতন, ব্রহ্মানন্দের লব্ধ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মানন্দের জননীও তেমনি মহা নূতন, নিত্য নূতন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে যে যে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের বর্ণনা আছে, ইনি সেই, অথচ ঠিক সেই নন, ইনি সেই যোগী ঋষিদিগেরই পরব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ং বটেন, কিন্তু তাঁরা যেমন ব্রহ্মকে নির্গুণ নিষ্ক্রীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ব্রহ্মানন্দের মা সেই তিনি হইলেও যেন সে ব্রহ্মই নন। ব্রহ্ম অবশ্যই এক বই দুই হইতে পারেন না। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানের ব্রহ্ম নিরূপণ অপেক্ষা ব্রহ্মানন্দ-জননী আরো যেন ব্যক্তিভাবে উজ্জ্বল, আরো নিকট, আরো আপনার, আরো ঘরের লোক হইয়া আসিয়াছেন। সেই বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যং জ্ঞানং অনন্তং, সেই সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-প্রেমময়-অদ্বৈত, পুণ্য ও আনন্দময়ী যিনি তাঁকেই ব্রহ্মানন্দ মা বলিয়া ডাকিয়াছেন। অথবা তিনিই মাতৃরূপে ব্রহ্মানন্দের নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধান-ভক্তগণের মধ্যে মুষা ব্রহ্মের সত্যস্বরূপ দেখিয়া তাঁর নাম “আমি আছি” বলিয়া প্রকাশ করেন; সক্রেটিশ ও ঋষিগণ তাঁহার জ্ঞানস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে আত্মজ্ঞান-প্রদায়িনী বিজ্ঞান-বিধায়িনী সরস্বতী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বুদ্ধদেব তাঁর অনন্ত-

সত্তার অনুগামী হইয়া "মহানির্ব্বাণ" বলিয়া তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গাদি ভক্তগণ তাঁর প্রেমস্বরূপের পূজা করিয়া প্রেমে আত্মহারা হইলেন ও তাঁকে প্রেমস্বরূপ বলিলেন। মহোম্মদ এবং ঋষিগণ তাঁর অদ্বৈতস্বরূপের পূজা করিয়া তাঁহাকে একমেবাদ্বিতীয়ং বলিয়া বিখ্যাত করিলেন। মহর্ষি ঈশা তাঁর পুণ্যস্বরূপ দেখিয়া আপন ইচ্ছা ও আমিত্ব ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে "স্বর্গস্থ পিতা" অথবা শুদ্ধমপাপবিদ্ধং বলিয়া প্রচার করিলেন এবং ঋষিগণের সেই আনন্দরূপম মৃতংকে সকল স্বরূপের মিলনে দর্শন করিয়া আনন্দময়ী মা বলিয়া উপলব্ধি করতঃ ব্রহ্মানন্দ তাহাতেই আত্মসমর্পণ করিলেন।

বাস্তবিক ব্রহ্মেতে যাঁর আনন্দ তিনিই ব্রহ্মানন্দ অথবা ব্রহ্ম যাঁহাকে পাইয়া আনন্দিত হন "তুমি আমার প্রিয় সন্তান তোমাতে আমি আনন্দিত হই," এই বলিয়া আদর করেন, তিনিই যথার্থ ব্রহ্মানন্দ। যেমন পুত্রের মুখ দেখিলে মার সকল মনোকষ্ট দূর হইয়া যায়, সব যন্ত্রণা নিবারণ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মানন্দও যেমন মা বলিয়া ব্রহ্মেতে যে আনন্দ সেই আনন্দে আনন্দিত হইলেন, তেমনি ব্রহ্মানন্দ শিশুকে কোলে পাইয়াও জগন্মাতাও আনন্দিত।

এইখানেই বলি ব্রহ্মানন্দ সর্ব্বদাই বলিতেন ফাঁকি দিয়া ধর্ম্ম হয় না। সংসারে যত প্রকার প্রলোভন পরীক্ষা, স্ত্রীর তিরস্কার লাঞ্ছনা, ভাই বন্ধুদের গালাগালি, রোগ, শোক, দুঃখ দারিদ্র, এমন কি বিছানায় ছেলে মেয়ের মল মূত্রের গন্ধ সহ্য করিয়াও মনে যে ধৈর্য্য শান্তি রাখিতে পারে তারই ধর্ম্ম হয়। ধর্ম্ম অমনি হয় না। পরন্তু এ সকলই সাধনের সহায়রূপে বিধাতার বিধান জানিয়া [illegible]

সংসারের রোগ, শোক, বিপদ, পরীক্ষা, এমন কি জরা মৃত্যুতেও ব্রহ্মানন্দের মুখ কখনও মলীন কেহ দেখে নাই, ঘোর মৃত্যু যন্ত্রণা মধ্যেও তাঁহার মুখ চিরপ্রফুল্ল, মৃত্যুর পরও সে মুখের হাস্য তিরোহিত হয় নাই, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; সংসারের যাবতীয় দুঃখ যন্ত্রণা মধ্যে জগজ্জনে ব্রহ্ম-আনন্দ দিবার জন্যই কি না তাঁর জীবন, সেই জন্যই তাঁকে পাইয়া মা আনন্দিত এবং তাঁরও আনন্দ মাতে চির অক্ষুন্ন। সাধারণ লোকে বলে সংসার দুঃখের আগার কিন্তু তিনি বলিলেন "সংসারে আসা আনন্দের জন্য।"

এক্ষণে, যদিও চলিত কথায় ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মানন্দের "ব্রহ্ম-নিরূপণ" এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু ঠিক বলিতে হইলে এ নিরূপণে তাঁর হাত নাই। ব্রহ্ম স্বয়ং এইরূপে তাঁর নিকট প্রকাশিত হইয়াছেন, ইহাই বলা সমুচিত। কারণ ব্রহ্ম নিরূপণও পুরুষাকারমূলক, তাহাতে মানুষের কল্পনাও মিশ্রিত থাকিতে পারে।

যাহাহউক ব্রহ্মানন্দের নিকট ব্রহ্ম স্বয়ং আনন্দময়ী মাতৃরূপে প্রকাশিত [illegible]য়াছেন এবং তিনি এক আনন্দময়ী মা পাইয়া তাঁহাকেই জগজ্জনকে [illegible]য়াছেন। আমাদের দেশে যেমন সংস্কার আছে মৃন্ময়ী গড়া দেবদেবীর চেয়ে [illegible] [illegible]বতা স্বয়ম্ভূ হইয়া উঠে, তাঁর মাহাত্ম্য অধিক, তিনি জাগ্রত এবং যে [illegible] সেই দেবদেবী পান তিনি ধন্য হন; সেইরূপ বর্ত্তমান যুগে নববিধানে [illegible]তৃরূপে আনন্দময়ী স্বয়ম্ভূ হইয়া জীবন্ত জাগ্রত ভাবে আবির্ভূত হইয়া-[illegible] [illegible]ং ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে পাইয়া বিখ্যাত করিয়াছেন। লোকে যেমন [illegible] [illegible] মা যেমন, ছেলে তেমন হয়; সেইরূপ ব্রহ্মানন্দ এই আনন্দময়ী [illegible]াইয়া ও পূজা করিয়াই স্বয়ং ব্রহ্মানন্দে আনন্দিত হওয়া কি তাহা [illegible]ছেন এবং আরো যদি সংসারে ব্রহ্মানন্দ সঞ্চার করিতে হয় তাহা [illegible] মার পূজা দ্বারাই হইতে পারে ইহাই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

বাস্তবিক যে মানবের যেমন ইষ্ট দেবতা তাঁহার জীবনও তেমনি হইয়া থাকে, সেই জন্যই এমন এক আনন্দময়ী মাকে ব্রহ্মানন্দ দেখাইয়াছেন যে তাঁকে পূজিলেই সবার জীবন আনন্দে পূর্ণ হইবে। কেন না ব্রহ্মানন্দের এই আনন্দময়ী মা যিনি তিনি সদানন্দরূপিনী। সৎ চিৎ আনন্দ যাঁহাতে মিলিত, তিনিই নববিধানের উপাস্য দেবতা, তিনিই ব্রহ্মানন্দের মা যাঁহাতে সপ্তস্বরূপ ঘনীভূত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সচ্চিদানন্দ পুরুষকেই ঈশা পিতৃভাবে বিখ্যাত করেন। কিন্তু তিনি তাঁকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করাতে তাঁর কোমল মাতৃভাব তেমন প্রকাশ পায় নাই। পিতা যেন তবু একটু কঠোর, তবু একটু শক্ত, তবু একটু কঠিন, তবু একটু দূর ; মার মত কোমল, মার মত নিকট, মার মত সহজে উপলব্ধ, মার মত ঘরের লোক, মার মত ছেলের জন্য ব্যস্ত এবং ছেলের জন্য আত্মত্যাগিনী এবং সহিষ্ণু আর কে? পিতা হয় তো অজ্ঞাত অপরিচিত বা ঠিক পরিচিতও না হইতে পারেন, কিন্তু মার মত ঠিক সত্যও আর কেহ নাই, কেননা আমার মা যে আমারই মা সে বিষয়ে আর ভুল হইতেই পারে না।

তাই নিরাকার ব্রহ্ম যেন বলিলেন, সকলেই আমাকে প্রভু বলেছে, পিতা বলেছে, রাজা বলেছে, স্বামী বলেছে, গুরু বলেছে, বন্ধুও বলেছে, কিন্তু কেহই আমাকে 'মা' বলিয়া ডাকে নাই। তাই ব্রহ্মানন্দ তাঁকে "আমার মা" বলিয়া ধরিলেন। বাস্তবিক সাকার দেব দেবীকে হয় তো অনেকে মা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন কিন্তু নিরাকারকে মা বলিয়া প্রত্যক্ষ দেখাশুনা ও পূজা ইহা সম্পূর্ণই নূতন!

কোনও নারীর সন্তান জন্মায় ততদিন তাঁহাকে তাঁর নিজ নামেই ডাকা হয়, কিন্তু সন্তান জন্মাইলে আর তাঁকে সে নামে বড় কেহ ডাকে না, সেই সন্তানের মা বলিয়াই সকলে ডাকে। ঠিক সেইরূপ ব্রহ্ম এতদিন তাঁর বিভিন্ন নামে অভিহিত হইতেছিলেন। কিন্তু যখন সকল মানব একাধারে নিবদ্ধ হইয়া এক-সন্তানরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন এবং মাও সেই অখণ্ড-মানব-সন্তানকে কোলে পাইলেন অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে সকল মাবনকে তাঁর সন্তানরূপে লাভ করিলেন, তখন সেই সন্তানের নামেই মা আত্ম পরিচয় দিলেন। এই জন্যই আমরা তাঁহাকে ব্রহ্মানন্দজননী বলিয়া ডাকিয়া ধন্য হইতেছি। এবং আমার সকল ভাইভগ্নীকে এই নামেই তাঁকে ডাকিতে আহ্বান করিতেছি। ব্রহ্মানন্দও বলিয়াছেন, যদি তোমরা তাঁহাকে তোমাদের মা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ কর বা সঙ্কুচিত হও তবে তাঁকে সকলে "কেশবের মা" বলিয়া ডাক। তিনি বলিলেন :—

"আমি সত্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি মার স্বরূপ সম্পর্কে আমি যে সকল বর্ণনা করিয়াছি সে সমস্ত সত্য, অত্যন্ত সত্য।" "আমি যে মার কথা বলিয়াছি তিনি তোমাদেরও মা আমারও মা। যদি তোমরা তাঁহাকে তোমাদের মা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ কর বা সঙ্কুচিত হও তবে তিনি দেশ বিদেশে "কেশবের মা" বলিয়া পরিচিত হউন। যদি সে বিষয়ে লজ্জা ভয় না থাকে তাহা হইলে আমার মাকে তোমাদেরও মা বলিয়া স্বীকার কর এবং তাঁহার যতগুলি মনোহর রূপ বর্ণনা করিয়াছি সমুদয় মানিয়া লও।"—'সেবকের নিবেদন।'

নববিধানের গূঢ় তাৎপর্য্য সম্বন্ধে ব্রহ্মানন্দ প্রশ্নকারীর উত্তরে বলিলেন :—"ঈশ্বর বলেন, সদনুষ্ঠান আমার লোকেরা করুক, তাহা

আরো অনেক লোক সে কাজ করিবার জন্ত আছে। এজন্ত আমি আমার মণ্ডলী রচনা করি নাই। নিরাকার পরমাত্মার জীবন্ত এবং প্রীতিপূর্ণ পূজা করাই আমার লোকদিগের বিশেষ লক্ষণ। যে আমাকে দেখে ও আমার পূজায় আনন্দিত হয় এবং আমায় ভালবাসিয়া সর্ব্বদা চক্ষের সম্মুখে রাখে সেই আমার লোক।" সুতরাং এই ব্রহ্মকে দর্শন ও ব্রহ্মের বাণী শ্রবণই নববিধানের বিশেষত্ব এবং ইহাই ব্রহ্মানন্দের জীবনের বিশেষ লক্ষণ।

একণে ব্রহ্মকে দর্শন ও শ্রবণ করিতে হইলে প্রথমতঃ ঠিক তাঁহাকে ধরিতে, চিনিতে বা নিরূপণ করিতে হয়; ঠিক ব্রহ্মনিরূপণও সর্ব্বসাধারণ জনগণের পক্ষে সহজ নহে এবং সকলেরই একই ব্রহ্মনিরূপণ হওয়াও দুরূহ। ব্রহ্মানন্দ তাই বলিলেন "ব্রহ্মনিরূপণ হইলেই রাতারাতি উদ্ধার হইবে," এবং এক ব্রহ্মনিরূপিত ও পূজিত না হইলেও যথার্থ একতা বা পূর্ণ ভ্রাতৃত্বের মিলন যাহা নববিধান চান তাহা হইতেই পারে না। এই যে এত ধর্ম্মে ধর্ম্মে, মানবে মানবে, পরস্পরে বিবাদ, ব্রহ্মানন্দ বলিলেন ইহা "হরিতে হরিতে বিবাদ।" তাই তিনি প্রার্থনায় বলিলেন :—

"মিথ্যা হরি, কল্পনার হরি, নাস্তিকের হরি, পৌত্তলিকের হরি, ব্রহ্মজ্ঞানীর হরি, সকলকে কাট। কি মন এক এক হরি গড়েছে। এই যে হরিতে হরিতে বিবাদ আমার প্রাণের হরি তা তুমি বিনাশ কর। বিনাশ করে তুমি আপনার সিংহাসন স্থাপন কর। নববিধানের হরি, তোমার সঙ্গে কোন দেবতার মেলে না। আর সমুদয় অপবিত্র ভ্রান্ত হরি ঝুটো হরি।" "এক হরির পূজা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।"

[illegible] বিবাদ মিটিয়া এক হরির পূজা হইলেই

ব্রহ্মই সত্য ব্রহ্ম নিরূপণ। এই জন্যই ব্রহ্মানন্দ সাহসপূর্বক বলিলেন :—

"আমি ঠিক বলি আমার মা সত্য।" "কাণ দিয়া শুন, চক্ষু দিয়া দেখ হরি আমার, আমি হরির।" "যে আমার মাকে দেখেছে আর পাগল হয়নি, সে তো প্রেমময়ী তোমাকে দেখেনি। আমি একবার ঐ ঘোম্‌টা তুলে দেখ্‌তে গিয়ে আমার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে।"

"এসেছি মা তোমার কাছে। তোমাকে ধরেছি। তুমি আমাকে কাঁদে ধর্‌লে আর আমিও তোমাকে ধরে ফেলেছি। তুমি এত কাছে যে দেখ্‌বার জন্য আর চেষ্টা কত্তে হয় না।

"আমার মা বড় সৌখীন মা। এই মা আমার সর্বস্ব, মা আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, মা আমার ভক্তি দয়া, মা আমার পুণ্য শান্তি, মা আমার শ্রী সৌন্দর্য্য, মা আমার ইহলোক পরলোক। মা আমার সম্পদ সুস্থতা। বিষম রোগ যন্ত্রণার মধ্যে মা আমার আনন্দ দেখ। এই আনন্দময়ী মাকে নিয়ে ভাইগণ সুখী হও। এই মাকে ছাড়িয়া অন্য সুখ অন্বেষণ করিও না।"

"তোমরা কি আমার মাকে দেখিয়াছ? আমার মাকে দেখিয়া পরীক্ষা করিয়া লও। যদি তোমরা আমার যথার্থ জীবন্ত মাকে পরীক্ষা করিয়া চিনিয়া না লও তবে ভবিষ্যবংশের জন্য তোমরা কল্পনা রাখিয়া যাইবে। যদি আপনারা বাঁচিতে চাও এবং জগতের কল্যাণসাধন করিতে চাও তবে মাকে কতকগুলি কল্পনার সমষ্টি বলিয়া সিদ্ধান্ত হইতে দিও না।"

"আমার মা যথার্থ মা তোদের মা 'আমি'র মা।" "আমরা যেন অসার দেবতা ফেলে ফেলে এই লোকটার যে দেবতা তাহাই পূজা করিয়া তুষ্ট

"পুরাতন মাকে যে এনেছেন ফেলে দিয়ে আমার লাবণ্যময়ী মাকে নিয়ে যান। এই যে আসল মা যাঁকে আমি মা বলেছি। ভারত তুমি তাঁকে লও।"

"আমি আমার ঈশ্বরকে দেখিয়াছি ও তাঁহার বাণী শুনিয়াছি এবং তাঁহাতেই আমি পরম আনন্দিত।"

তিনি আরও নিজ সম্বন্ধেও বলিলেন, "ঈশ্বরকে দেখ নাই? আর প্রমাণ দিতে হইবে না, আমাকে দেখিলেই হইবে। এক পদার্থে দুটী পদার্থ মিলিয়াছে। একটী অস্বীকার করিয়া আর একটী স্বীকার করা যায় না।" আরও "চিন্ময় বস্তু আমি। এই যে নরপ্রকৃতি বিশিষ্ট নব-কুমার যাহার নাম শ্রীঅদ্ভুত, যিনি ইঁহার পিতা মাতা কর্তৃক প্রশংসিত, স্বর্গ কর্তৃক আদৃত, এই আত্মাই আমি।"

যাহাহউক ব্রহ্মানন্দের এই যে ব্রহ্মদর্শন ইহা যে কেবল জ্ঞানযোগে বা চিন্তাযোগে নিরূপণ তাহা নহে। এ নিরূপণ প্রেমযোগে, প্রাণযোগে ব্যক্তিগত ভাবে, তাই তিনি ইঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, কখনও বা তাঁহাকে "অনন্ত মিছরীর পানা", কখনও "গোলাপের সরবৎ," কখনও "ভক্তের ঝড়" ইত্যাদি কতই প্রাণগত অভিধানে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রার্থনা উপাসনাদির ভিতর প্রবেশ করিলে দেখা যায়, তিনি এমনই নিগূঢ় আধ্যাত্মিকযোগে যুক্ত যে মানুষ যেমন মানুষের সহিত কথোপকথন করেন, গল্প করেন আমোদ আহ্লাদ হাসি তামাসা করেন তেমনি করিয়াছেন। কত সময় তিনি একাকী নির্জ্জনে কখনও একতারা লইয়া কখনও বা চুপ করিয়া বসিয়া পাগল যেমন একা একা বকে, অথচ যেন কাহাকেও কিছু বলিতেছে, ঠিক তেমনি করিয়াছেন। এ সমুদয় কথোপকথন কেহ লিখিয়া রাখেন নাই এবং যাহাও উপাসনাদি সম্বন্ধে

লেখা আছে তাহাও বাহুল্যভয়ে অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিতেছি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর কৃত আরাধনার সার অংশ একটীমাত্র এখানে দিতেছি :—

"একেবারে চক্ষের সম্মুখে? একেবারে গম্ভীর স্বরে "আমি আছি" বলিলে? কাহার সাধ্য এখনও তোমাকে অস্বীকার করে? আমি তোমাতেই বাঁচিয়া আছি, তুমি জগতের প্রাণ, তুমি সকলের জীবনের জীবন।

"আমার সাক্ষী তুমি। তোমার ঐ চক্ষের আগুনে আমার প্রাণ মনটা ঝলসিয়া গেল; বাই বে পরমেশ্বর, আর কতক্ষণ ঐ দৃষ্টি তাকাইয়া থাকিবে তুমি বলিতেছ—"হইয়াছে কি? আর পাপ করিবি?' তুমি সর্ব্ব সাক্ষী, তুমি সর্ব্বান্তর্যামী, হে ঈশ্বর।

"অনন্ত ঈশ্বর, ডাকিয়া আনিলে না আমাকে বাড়ী থেকে তোমার পূজা করিতে? তবে আমাকে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গেলে? আর অন্ত পাইলাম না। তুমি ভূমা, মহান্, অগম্য, অপার।

"আমি পাপী, আমি তোমার অপমান কি কম করি? কিন্তু পাপীর বাড়ীতে লুকাইয়া এত উপকার করিয়া যাও কেন? কোথা থেকে আনিয়া ভাত জল রাখিয়া গেলে? আমি আর বলিতে পারি না। তুমি দয়ার আধার, প্রেমময় ঠাকুর।

"অদ্বিতীয় ঈশ্বর, আর কে তোমার মত আছে? সব রাজ্যটা তোমার। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডটা তোমার মুটোর ভিতরে পড়িয়া আছে, এক ধমকে তুমি ইহা শাসন করিতেছ। দীন দরিদ্রদিগের অদ্বিতীয় আশা ও ভরসা তুমি।

"পবিত্র ঈশ্বর তুমি। আমি যে পাপী। পুণ্যের ভিতরে ডুবাইয়া

"আনন্দ, অমৃত, শান্তি তুমি। হে ঈশ্বর, তুমিই না সেই পূর্ণ আনন্দ, [illegible]হার ভিতর ডুবিলে থৈ পাওয়া যায় না, উড়িলে উচ্চতা পাওয়া যায় [illegible]া? একেবারে অপরিমিত, অসীম আনন্দ। তোমার কাছে থাকিলে নিরানন্দ হয় না।

"তুমিই আমাদের স্তবনীয়। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় তুমি। গতি-বিহীনের গতি তুমি। ঐ যে শ্মশানে পড়িয়া কাঁদিতেছে, তাহার নব-জীবন তুমি। যে তোমাকে না দেখিতে পাইয়া কাঁদিতেছে তাহার শান্তিদাতা তুমি। পাপময় পৃথিবীর উদ্ধার কর্ত্তা তুমি, তোমাকে নমস্কার করি।"

এই যে ব্রহ্মারাধনায় "তুমি" বলিয়া সম্বোধন ইহা ব্রহ্মানন্দই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন, আমরা এ কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বাস্তবিক ব্রহ্মকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষরূপে সম্মুখে না দেখিলে কি কেহ "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করিতে পারেন? ব্রহ্মানন্দ যে বলিলেন, "আমি সাক্ষাৎ দেবতা জাগ্রত ঈশ্বর তাঁকে বলি যে দেবতা কাজ করেন বলেন ঠিক মানুষের মত অথচ মানুষ নয়।" এই মানুষের মত দেখিয়াই তিনি [illegible]কে "তুমি" বলিতে সাহসী হইয়াছেন।

যাহাহউক তাঁর ব্রহ্মদর্শন যে অতীব জীবন্ত প্রত্যক্ষ পূর্ণ সত্য সে [illegible] অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি টাউন হলের বক্তৃতায় বলিয়া[illegible] "এই আমি সম্মুখের স্তম্ভ যেমন দেখিতেছি, এমনি ব্রহ্মকে [illegible]ছি।" "এই তাঁহাকে হস্ত দ্বারায় অনুভব করিতেছি।" বাস্তবিক [illegible] প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া উপাসনাদি না করিয়া অনুপস্থিত ঈশ্বরের [illegible] বা বক্তৃতা করা হয় বলিয়াই উপাসনা ফলোপধায়ক হয় না,

[illegible] চাক্ষুষ

প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যতক্ষণ না দর্শন ঠিক হয় এবং আত্মা লীনভাবে তাঁর স্মরণাপন্ন হয় ততক্ষণ ব্রহ্মবাণী শ্রবণই হয় না। নিজ নিজ মনের কল্পনার দ্বারায় ঈশ্বর-পূজাতেই ব্রহ্মবাণী শুনা যায় না। সুতরাং যাহা ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়া তাঁহার সত্য উপাসনা প্রার্থনা ও তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস সহকারে ব্রহ্মানন্দের ভাবে মা বলিয়া ডাকিয়া সেইরূপ দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইলে আমরাও তাঁকে দেখিতে ও শুনিতে পারি এবং তদ্দ্বারা পরস্পরের সহিতও এক হইতে পারি। ব্রহ্মানন্দ এই জন্যই বলিলেন "এখন জগতে আমরা কয়টী ভিন্ন আর তো কেহই বলে না ঈশ্বরকে দেখা যায়, ঈশ্বরের বাণী শুনা যায়।" বাস্তবিক সকল ধর্ম্মাবলম্বীই এখন মৃত কল্পিত বা আন্দাজে আন্দাজে ঈশ্বরের পূজা করিতেছেন কিম্বা ব্রহ্মানন্দ যেমন বলিলেন "রাজাকে যেমন দরখাস্ত পাঠায় তেমনি করিয়া প্রার্থনাদি করিতেছেন। মা বাপকে আদরে ছেলে যেমন করে জড়িয়ে ধরে তেমন তো কেহ করে না।" ব্রহ্মানন্দ তাই করিয়াছেন ও তাহাই করিতে সকলকে শিখাইয়াছেন।

এখন সত্যই সেই পরব্রহ্ম যাঁকে ব্রহ্মানন্দ মা বলিয়াছেন তিনিই আমাদের যথার্থ মা। এই মার ভিতর সকল ভাব একীভূত। তাঁহাতেই সত্য, জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যের মহা শক্তি এবং আনন্দের মহা কোমলতা একত্রিত এবং তিনিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দরূপিনী হইয়া সকল সন্তান ও বিধানকে এক অঙ্গে বাঁধিয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। কবির কল্পনায় বা ভক্তি আতিশয্যে যেমন দেখিতে পাওয়া যায় দুর্গা-
[illegible] আদ্যাশক্তি মধ্যবিন্দু হইয়া সকল সন্তানকে লইয়া এমন বি

য সত্যই নূতন বিধানে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রূপিনী হইয়া ভক্তকোলে বতীরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এক ভক্ত মানবসন্তানই এই দেবীপূজার রোহিত হইয়াছেন। এই মার পূজার উপকরণ ষোড়শোপচারে এই সার নৈবেদ্য। কোন দেবতার পূজা যেমন জবাদ্বারায় কাহারও বা লসী, কাহারও বিল্বপত্র কাহারও কোন উপকরণে কাহারও অন্য করণে হয় এবং যে কোন পুরোহিত পূজা করিলে চলে, কিন্তু এ মায়ের জা সকল মানবকে এক সঙ্গে লইয়া যিনি পাপীর সঙ্গে আপনাকে পাপী নিয়া ব্রাহ্মণ ব্রহ্মানন্দ হইয়াছেন, তিনিই এই পূজার অধিকারী পুরোহিত। বার সমগ্র সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম যত ধর্ম্ম যাহা কিছু আছে সমুদয় পকরন দিয়া এই মার পূজা করিতে হইবে। ব্রহ্মানন্দ আপন অঙ্গে কল মানবের সঙ্গে আমাকেও গাঁথিয়া লইয়াছেন এই উপলব্ধি করিয়া হ্মানন্দগত প্রাণে ব্রহ্মানন্দের মাকে মা বলিয়া তাঁর পূজা যাবতীয় সংসারের কর্ত্তব্য সাধনের দ্বারায় করিলেই যথার্থ পূজা করা হইবে। ফলে হ্মানন্দের মাই বর্ত্তমান বিধানে সত্য মা, এক তাঁকে মা বলিয়া পূজা করিলেই এ বিধানে যথার্থ পূজা হয়।

শ্রীব্রহ্মানন্দের সাক্ষী।

শ্রীব্রহ্মানন্দের আত্ম-কথায়, আত্ম-পরিচয়ে তিনি কে তাঁর নববিধান কি এবং তাঁর মা কেমন ভগবৎ আলোকে যেমন উপলব্ধ হইয়াছে তাহাই নিবেদিত হইল। তাঁর নিজ পরিচয়ে যাঁহারা বিশ্বাসী এ সম্বন্ধে তাঁদের নিকট আর অন্য প্রমাণের আবশ্যকতা নাই, তথাপি — বিশ্বাস জগতের সাক্ষ্যও অগ্রাহ্য নহে। তাঁর সমসাময়িক

সাধারণ মানবগণ তাঁহাকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও জানা উচিত। ইঁহাদের মধ্যে প্রধানতঃ পণ্ডিত মোক্ষমূলার বলেন (ব্রহ্মানন্দ) "ভারতে যত ব্যক্তি জন্মিয়াছেন তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।" কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার্ ডাঃ বেনওস্ বলেন "কেশবচন্দ্র শাক্য সিংহের ছাঁচে গঠিত। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে যুবাদিগকে শিক্ষিত করাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য।" আমেরিকার বিখ্যাত বক্তা যোসেফ্ কুক্ ব্রহ্মানন্দের তীরোধানে বলিলেন "ভ্রাতঃ, তোমার তীরোধানে জগৎ অন্ধ-কার।" ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ পত্রিকা বলেন "যখন কেশব বলেন, তখন জগৎ শুনে, এবং যথেষ্টই শুনিতে পারে।" এইরূপ কতই তাঁর বাহ্য মহত্ত্বের সাক্ষী পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রহ্মানন্দের আধ্যাত্ম মহত্ত্বের সাক্ষী দু পাঁচটী ভিন্ন অধিক পাই নাই। তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিদিগের মধ্যে যদিও অনেকে তাঁর মহত্ত্ব উপরোক্ত প্রকারে স্বীকার করিয়াছেন এবং নানা স্থানে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই কয়টী সাক্ষী যেমন তাঁকে ঠিক চিনিয়াছিলেন এমন আর কেহ নহে।

এই কয়েকজনের মধ্যে শ্রীমহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম সাক্ষী। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে তাঁকে চিনিয়াছিলেন তার প্রমাণ তাঁর "ব্রহ্মানন্দ" নামকরণ; কেশবচন্দ্রের "ব্রহ্মানন্দ" নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই প্রদান করেন ব্রাহ্মসমাজের নেতা এবং আচার্য্য নামও মহর্ষিই ব্রহ্মানন্দকে দান করেন। ইহাও তাঁর মহত্ত্বের সামান্য পরিচায়ক নহে। আদি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রধান আচার্য্য মহর্ষি বৃদ্ধ, ব্রহ্মানন্দ যুবা, ব্রহ্মানন্দ বয়সে মহর্ষির সন্তানের তুল্য, মহর্ষি ধনে মানে এবং যোগধর্ম্মেও প্রধান, ব্রাহ্মসমাজের শীর্ষ

[illegible] সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন।

লাগিলেন। ইতিমধ্যে মহর্ষি কি চক্ষেই যে ব্রহ্মানন্দকে দেখিলেন আর তাঁহাকে যেন চক্ষের আড়াল করিতে চান না। রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, মহর্ষি ঘড়ীর কাঁটা ফিরাইয়া রাখেন, পাছে বেশী রাত্র হইয়াছে বলিয়া কেশব চলিয়া যান। আর আর সকলে অন্য চৌকিতে বসিলেন, কেশব যাই চেয়ারে বসিতে গেলেন, তাঁকে ধরিয়া মহর্ষি আপনার কৌচের পার্শ্বে একাসনে বসাইলেন। আপনি জল খাইতেছেন, আর এক চামচ কেশবের মুখে দিয়া বলিলেন "এই তুমি খাও", আর এক চামচ লইয়া আপনি খাইয়া বলিলেন "এই আমি খাই।" এমনই দুই জন ভিন্ন অবস্থা ভিন্ন প্রকৃতি হইলেও কি আত্মীয়-প্রেম-সৌহার্দ্দে কি গভীর ধর্ম্মবন্ধুতা সূত্রে যে আবদ্ধ হন তাহা বলা যায় না। ব্রহ্মানন্দও মহর্ষির পত্রাবলী হইতেও বুঝা যায় যে তাঁহাদের পরে সামাজিক মতভেদ পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইলেও শেষ দিন পর্য্যন্ত উভয়ের আধ্যাত্মিক প্রেম এবং পরস্পরের প্রতি ভাল-বাসা ও শ্রদ্ধা কখনই চলিয়া যায় নাই। বাস্তবিক কেশবচন্দ্রের আনন্দ কেবল ব্রহ্মেতেই ইহা দেখিয়াছিলেন বলিয়াই মহর্ষি তাঁকে "ব্রহ্মানন্দ" নাম দেন। ব্রহ্মানন্দের বিশেষত্ব যে ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মারাধনা ইহাও মহর্ষি স্বীকার করিয়াছেন। যাহাহউক এক "ব্রহ্মানন্দ" নাম দিয়াই এক কথায় মহর্ষি তাঁর পরিচয় দিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দের দ্বিতীয় সাক্ষী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। পরমহংসদেব হিন্দু ভক্ত যোগী, কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, তীব্র বৈরাগী। তিনি ব্রহ্মানন্দের বিষয় অনেক কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁর দু একটী কথায় বেশ বুঝা যায় তিনি তাঁর প্রকৃত আত্মার পরিচয় পাইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ধর্ম্মবেশধারী ছিলেন না, সাধারণ বিলাসী বাবুর চেহারা যেমন হয়, তাঁর —— বেশ বিন্যাসাদি দেখিলে তাহা হইতে ভিন্ন কিছুতেই তাঁহাকে

মনে হইতে পারির না। ইহার কারণ সাধারণ সংসারীর যেমন অবস্থা তাহাতে থাকিয়া উক্ত যোগধর্ম্ম লাভ হওয়া সম্ভব ইহার আদর্শ দেখাইতেই ব্রহ্মানন্দের জীবন এবং সেই জন্য সংসারের কোন কিছু বাহ্যতঃ তিনি ত্যাগ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। বরং লোকে ভিতরে ধর্ম্ম না থাকিলেও বাহিরে তাহা দেখাইতে চায় বলিয়াই তিনি সম্পূর্ণরূপে ভিতরে ধর্ম্ম লইয়া বাহিরে সংসার বেশধারী ছিলেন, এজন্য সাধারণ চোখে দেখিলে বিলাসী বাবু ভিন্ন আর অন্য কিছু বুঝিবার যো ছিল না। এবং এই জন্যই তাঁর ধর্ম্ম ও তাঁর জীবনাদর্শ সাধারণ মানবের পক্ষে গ্রহণ করা এত কঠিন। কিন্তু পরমহংসদেব সেই বাহ্য সংসারী বেশধারীর আত্মা যে ব্রহ্মযোগে মগ্ন ইহা তাঁকে দেখিয়াই বুঝেন, তিনি প্রথম একদিন ব্রাহ্মসমাজের বেদীর উপর ব্রহ্মানন্দকে দেখিয়াই বলিলেন "ঐ যে সকলের মধ্যখানে বাবুটী এরই ফাতনা ডুবে গেছে, (অর্থাৎ তাঁর আত্মা ব্রহ্মেতে মগ্ন) আর সকলে চার খাঁড় নিয়ে বসে আছে।" তিনি তারপরই নিজেই আসিয়া বেলঘরের সাধনকাননে ব্রহ্মানন্দের সহিত আলাপ করেন এবং ক্রমেই উভয়ের মধ্যে নিবিড় আধ্যাত্ম-যোগ স্থাপিত হয়।

তিনি ব্রহ্মানন্দ জীবনের গভীর তত্ত্ব বুঝিয়া একবার বলিলেন "কেশব যেন জাহাজ আপনি চলেছে আবার কতকগুলি গাধাবোটকেও ঝক্ ঝক্ করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।" "আমি একটা তাল গাছ আপনি দাঁড়িয়ে আছি, আর তুমি বাবু অশ্বত্থ গাছ কত পশু পক্ষী তোমার ডালে ও তলায় আশ্রয় নিয়ে আছে।" ইহা অপেক্ষা সহজ কথায় কেশব জীবনের আদর্শের পরিচায়ক আর কি হইতে পারে? বাস্তবিক ব্রহ্মানন্দ [illegible] বলে যাইবার শক্তি নাই

[illegible] জন্য নির্দিষ্ট ইহাই কি এই সরল-প্রকৃতি ভক্ত যোগী [illegible] কথায় প্রকাশ হয় নাই ?

[illegible] অপেক্ষা আরও একটী গভীর কথায় কেশব জীবনের মহত্ত্বের এবং পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলেন "ওগো বাবু তোমার কাছে এলেই আমার মা গলে যায়," অর্থাৎ মৃন্ময়ী মা থাকেন না চিন্ময়ী হয়ে যান। কেশবের মহত্ত্বের এবং দেবশক্তির বা মানব সন্তানত্বের সাক্ষ্য ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বল এবং সুন্দররূপে আর কোন কথায় হইতে পারে? আমার মাটীর মা কেশবের কাছে এলেই গলে যায় এ কথা যিনি বলিয়াছেন তিনি যে আমার কেশবকে সত্যই চিনিয়াছিলেন সে বিষয়ে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। পরমহংসদেব কেবল একটা রূপক বলিবার লোক নহেন। তিনি ব্রহ্মগতপ্রাণ ভক্ত যোগী ছিলেন, অথচ মৃন্ময়ী দেবীর সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া অভ্যাস বশতঃ তাহা ছাড়িতে পারেন নাই। কেবল কেশবের কাছে এলেই যে তাঁর সে মা গলে যেতেন ইহা তিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাই এ কথা বলিয়াছিলেন।

বাস্তবিক কেশবের আত্মার নিকটস্থ হইলে যে সত্যই এরূপ হয় ইহাই তিনি বলিয়াছিলেন। পরমহংসদেবের এই কেশবের কাছে মানে কেশবের জড় দেহের কাছে হইতে পারে, কিন্তু পরমহংসদেব প্রকৃত প্রস্তাবে কেশবের আত্মার কাছেই আসিতেন এবং এই আত্মার কাছে আসিলেই বাস্তবিক মানবের জড় ভাব, যাহা দেবতার ন্যায় পূজিত হয়, এমন যাহা কিছু সব গলে যায়, ইহাই তিনি উপরোক্ত কথায় প্রকাশ করেন। আগুণের কাছে যা আসে তাই ভস্ম হইয়া যায়, ধোঁয়া হইয়া যায়, লোহাও গলিয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মানন্দের সমীপবর্ত্তী হইলে সংসাররূপ পুতুল জড় আশক্তি সব গলিয়া যায়। ব্রহ্মানন্দ-আত্মা যে সকল প্রকার জড় পৌত্তলিকতা নিবারণ করিতে

মনে হইতে পারি না। ইহার কারণ সাধারণ সংসারীর যেমন অবস্থা তাহাতে থাকিয়া উক্ত যোগধর্ম লাভ হওয়া সম্ভব ইহার আদর্শ দেখাইতেই ব্রহ্মানন্দের জীবন এবং সেই জন্য সংসারের কোন কিছু বাহ্যতঃ তিনি ত্যাগ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। বরং লোকে ভিতরে রং না থাকিলেও বাহিরে তাহা দেখাইতে চায় বলিয়াই তিনি সম্পূর্ণরূপে ভিতরে রং হইয়া বাহিরে সংসার-বেশধারী ছিলেন, এজন্য তাঁহার চেহারা দেখিয়া বিলাসী বাবু ভিন্ন আর অন্য কিছু বুঝিবার যো ছিল না। এবং এই জন্যই তাঁর ধর্ম্ম ও তাঁর জীবনাদর্শ সাধারণ মানবের পক্ষে গ্রহণ করা এত কঠিন। কিন্তু পরমহংসদেব সেই বাহ্য সংসারী বেশধারীর আত্মা যে যোগে মগ্ন ইহা তাঁকে দেখিয়াই বুঝেন, তিনি প্রথম একদিন বেলঘরিয়া জয়গোপাল সেনের বাগানে ব্রহ্মানন্দকে দেখিয়াই বলিলেন "ঐ যে সকলের মাঝখানে বাবুটী একই কাত্‌লা ডুবে গেছে, (অর্থাৎ যাঁর আত্মা যোগেতে মগ্ন) আর সকলে চাল পাঁড় নিয়ে বসে আছে।" তিনি তার পরই নিজেই আসিয়া কলুটোলায় সাধনকাননে ব্রহ্মানন্দের সহিত আলাপ করেন এবং ক্রমেই উভয়ের মধ্যে নিগূঢ় আধ্যাত্ম-যোগ স্থাপিত হয়।

তিনি ব্রহ্মানন্দ জীবনের গভীর তত্ত্ব বুঝিয়া একবার বলিলেন কেশব যে জাহাজ আপনি চলেছে আবার কতকগুলি গাধাবোট-কেও ঝক্ ঝক্ করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।" "আমি একটা তাল গাছ আপনি দাঁড়িয়ে আছি, আর তুমি বাবু অশ্বত্থ গাছ কত পশু পক্ষী তোমার ডালে ও তলায় আশ্রয় নিয়ে আছে।" ইহা অপেক্ষা সহজ কথায় কেশব জীবনের কার্য্যের পরিচায়ক আর কি হইতে পারে? বাস্তবিক ব্রহ্মানন্দ য পাপী মানব, ধাঁদের [illegible]

[illegible] নির্দিষ্ট ইহাই কি এই সরল-প্রকৃতি ভক্ত যোগী [illegible] কথায় প্রকাশ হয় নাই ?

[illegible] আরও একটী গভীর কথায় কেশব জীবনের মহত্ত্বের [illegible] তিনি বলেন "ওগো বাবু তোমার কাছে এলেই [illegible] অর্থাৎ মৃন্ময়ী মা থাকেন না চিন্ময়ী হয়ে যান। কেশ-[illegible] এবং দেবশক্তির বা মানব সন্তানত্বের সাক্ষ্য ইহা অপেক্ষা [illegible] এবং সুন্দররূপে আর কোন কথায় হইতে পারে? আমার মাটীর [illegible] কেশবের কাছে এলেই গলে যায় এ কথা যিনি বলিয়াছেন তিনি [illegible] কেশবকে সত্যই চিনিয়াছিলেন সে বিষয়ে আর কিছু মাত্র [illegible] নাই। পরমহংসদেব কেবল একটা রূপক বলিবার লোক নহেন। [illegible] ব্রহ্মগতপ্রাণ ভক্ত যোগী ছিলেন, অথচ মৃন্ময়ী দেবীর সাধনায় সিদ্ধ [illegible] বলিয়া অভ্যাস বশতঃ তাহা ছাড়িতে পারেন নাই। কেবল [illegible] কাছে এলেই যে তাঁর সে মা গলে যেতেন ইহা তিনি প্রত্যক্ষ [illegible] বলিয়া তাই এ কথা বলিয়াছিলেন।

বাস্তবিক কেশবের আত্মার নিকটস্থ হইলে যে সত্যই এরূপ হয় [illegible] তিনি বলিয়াছিলেন। পরমহংসদেবের এই কেশবের কাছে মানে [illegible] জড় দেহের কাছে হইতে পারে, কিন্তু পরমহংসদেব প্রকৃত প্রস্তাবে কেশবের আত্মার কাছেই আসিতেন এবং এই আত্মার কাছে আসিলেই বাস্তবিক মানবের জড় ভাব, যাহা দেবতার ন্যায় পূজিত হয়, এমন যাহা কিছু সব গলে যায়, ইহাই তিনি উপরোক্ত কথায় প্রকাশ করেন। আগুণের কাছে যা আসে তাই ভস্ম হইয়া যায়, ধোঁয়া হইয়া যায়, লোহাও গলিয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মানন্দ সমীপবর্ত্তী হইলে সংসাররূপ পুতুল জড় আশক্তি সব গলিয়া যায়। [illegible] প্রকার জড় পৌত্তলিকতা নিবারণ করিতে

সর্ব্বদা নিযুক্ত পরমহংসদেব সহজ কথায় তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। কেবল বাহিরের পৌত্তলিকতা ত্যাগ করাইতে ব্রহ্মানন্দ আসেন নাই, সংসারকে, স্ত্রী পুত্রকে, টাকা কড়ি মান মর্য্যাদাকে, জড় অহং জ্ঞান ইত্যাদি জড়বাদী মানব যা কিছু বস্তুকে পুতুল গড়িয়াছে এ সমুদয় নিবারণ করাই তাঁর কার্য্য এবং তাঁর আত্মার সমীপস্থ হইলে যে সে সমুদয় গলে যায়, তাহা পরমহংসদেবের কথায় প্রমাণ পাইয়া এ অধম জীবনেও সাব্যস্ত হইতে দেখিয়াছি। সত্যই কেশবের কাছে আসিলে আমাদের পুতুল যা কিছু সবই গলে যায়।

এক্ষণে বলা আবশ্যক ব্রহ্মানন্দ পরমহংসদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া যে তাঁর শিষ্যগণ বলেন ইহা সত্য নহে। যিনি আপনাকে চিরশিষ্য ব্রতধারী বলিয়া শুকরাদি পশুর নিকটও শিক্ষা করেন বলিতেন, যখন সামান্য বৈষ্ণব আসিলেও তার কাছে বসিয়া শিষ্যের ন্যায় শিখিতেন, তখন এমন যোগী ভক্ত পাইলে তাঁর কাছে বিনীতভাব অবলম্বন করিয়া শিখিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পরমহংসদেবও শিষ্যপ্রকৃতির লোক ছিলেন এবং যে কেহ তাঁর নিকট যাইতেন তাঁকে আগেই তিনি নমস্কার করিতেন।

পরমহংসদেব হইতেই ব্রহ্মানন্দ নববিধানের মত গ্রহণ করেন বলিয়া যে অনেকে ঘোষণা করেন ইহার ন্যায়ও মিথ্যা কল্পনা আর কিছুই হইতে পারে না। পরমহংসদেবের সহিত দেখা শুনা হইবার অনেক পূর্ব্বে ব্রহ্মানন্দ "ভারতে স্বর্গীয় জ্যাতি" বিষয়ে যে বক্তৃতা দেন তাহাতেও নববিধানের কথা তিনি উল্লেখ করেন [illegible] অবলম্বন করিলেও দেখা যায় কিরূপে

ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের সময় যে শ্লোক সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়, তাহাতেই নববিধানের ধর্ম্মসমন্বয়ের পূর্ব্বাভাস স্পষ্ট রহিয়াছে এবং তখন হইতেই ধর্ম্মসমন্বয়ের ভাব ব্রাহ্মসমাজে ক্রমশঃ প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। রাজা রামমোহন রায়ও এই ভাবের সূত্রপাত করিয়া যান বলা যাইতে পারে। তা ছাড়া নববিধানের ধর্ম্মসমন্বয় ও পরমহংসদেবের কৃত ধর্ম্মসমন্বয়ও এক নহে। পরমহংসদেব হিন্দুভক্ত, হিন্দু সাধক মাত্রেই যেমন স্বভাবতঃ সকল সাম্প্রদায়িক মতকেই উদারভাবে আদর করিয়া থাকেন, পরমহংসদেবের উদারতাও সেই জাতীয়। শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব এই সকল ভাব পরমহংসদেবের আদৃত ছিল, কিন্তু বিভিন্ন ধর্ম্ম মতের আদর ও সমন্বয় এক বলা যায় না। এতদ্ভিন্ন সকল ধর্ম্মের সঙ্গেও বেদ বেদান্ত কোরাণ পুরাণের সহিত পাশ্চাত্য ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের রাসায়নিক ঐক্য সমন্বয় করণ পরমহংসদেবের কল্পনাতেও আসে নাই। ইহা এক মাত্র ব্রহ্মানন্দের হৃদিস্থিত পবিত্রাত্মার পরিচালনার কার্য্য এই ধর্ম্ম সমন্বয়কে সেই জন্য ব্রহ্মানন্দ বিধাতার বিধান বলিয়া স্বীকার করিলেন। সমন্বয়বাদ দর্শন শাস্ত্র সঙ্গত একটা মত বলিয়া জানা ও সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় বিধাতা প্রেরিত মানবের পরিত্রাণের বিধান বলিয়া গ্রহণ করা এ দুই একই নহে।

ব্রহ্মানন্দের তৃতীয় সাক্ষী তাঁর মাতৃদেবী সারদাদেবী। মা সারদা এক সময় বহুধনের অধিকারিণী ছিলেন এবং কেশবের ন্যায় দেবপুত্রের মাতা ছিলেন, কিন্তু শেষ জীবনে অর্থ পুত্র কলত্র সকলই হারাইয়াছিলেন। অর্থবিত্ত এবং জগৎবিখ্যাত তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যা তাঁর শেষে কিছুই ছিলনা। এই শোক দুঃখ ভারাক্রান্ত বৃদ্ধা মাতা শেষে বলিলেন, 'জানকি, কেশব যে তাঁর মাকে দেখাইয়া দিয়াছেন সেই মাকে দেখিয়াই আমি এসব পতি পুত্রের শোক তাপ অনায়াসে বহন কচ্চি। কেশব আগার যান নাই তাঁর

মাকে নিয়ে আমার কাছেই আছেন।" আহা! কেশবের ন্যায় পুত্র হারাইয়াও এমন কথা যিনি বলেন তিনি যে কেশবেরই যথার্থ মা ইহা বলা বাহুল্য। কেশবের অমরাত্মার এমন সাক্ষী আর কে হইতে পারে?

কেশব যে নিজে বলিয়াছিলেন "আমার মাকে ডাক সব মধুময় হইবে।" এই ত মা সারদাদেবীর জীবন সেই কথারই প্রধান সাক্ষী। এমন গভীর শোক তাপ দুঃখ কষ্টও যে তাঁর মুখ দেখিয়া বহন করা যায়, এই ত মা সারদা নিজ জীবন দ্বারায় তাহা প্রমাণ করিলেন। মা সারদা যে সম্পূর্ণ ব্রহ্মানন্দের ধর্ম্মমতও গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি শেষ দিন পর্য্যন্ত পরম নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা যেমন থাকেন তেমনি ছিলেন। কিন্তু কেশবের ভালবাসা প্রভাবে "কেশবের মাকে" তিনি চিনিতে পারিয়াছিলেন। কেশবের স্বর্গারোহণ কালে যখন মা সারদা বলিলেন, "বাবা কেশব তুমি কি আমার পাপে এত কষ্ট পাচ্ছ?" মাতৃভক্তির পরিচয় দিয়া উচ্চস্বরে কেশব বলেন যান না "মা, আমার যা কিছু এ সব যে তোমারই গুণে," বাস্তবিক কেশব ও কেবল কথার কথা বলিবার লোক নন সত্যই মা সারদা কেশবেরই উপযুক্ত রত্নগর্ভা জননী।

ব্রহ্মানন্দের চতুর্থ সাক্ষী ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী। কৃষ্ণবিহারী বড় চাপা লোক ছিলেন, বাহিরে তাঁর ধর্ম্মের আড়ম্বর কিছুই ছিল না। অগাধ পণ্ডিত হইলেও সকলের কনিষ্ঠের মত তিনি থাকিতেন। তাঁর অতি সূক্ষ্ম দর্শন ও তীক্ষ্ণ ধারণাশক্তি ছিল। তিনি প্রকাশ্যে কখনও কাহারও নিকট ব্রহ্ম উপাসনা করিয়াছেন কিনা কেহ বলিতে পারে না। তাঁর সহিত যাহারা নিগূঢ়ভাবে

এই নববিধান মণ্ডলীর মধ্যে কেশবতীর্থ যাত্রের সাধনা প্রবর্তন করেন এবং সেই সাধনার ফলে এবং স্বাভাবিক আত্মজ্ঞানে তিনি দেখিয়াছিলেন, ব্রহ্মানন্দ "ভাই," তাই কেহ যখন কেশবকে জগতে "ভাই" বলিয়া সম্বোধন করেন নাই প্রকাশ্যপত্রে তিনিই প্রথম "ভাই কেশবচন্দ্র" বলিয়া লিখিয়াছিলেন। সহোদর হইয়াই কেশবের ভ্রাতৃত্ব তিনি স্বাভাবিক ভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। এবং লক্ষণ যেমন শ্রীরামচন্দ্রের অনুগামী বলিয়া পুরাণে কথিত আছে, ইনিও ঠিক সেইরূপ ছিলেন। আকৃতিতেও উভয়ের আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য ছিল। ব্রহ্মানন্দও স্বর্গারোহণ কালে তাঁর গলা জড়াইয়া ধরিয়া 'ভাইরে' ভাই বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া যান। সুতরাং ভাই কৃষ্ণবিহারীও ব্রহ্মানন্দের সামান্য সাক্ষী নহেন।

ব্রহ্মানন্দের পঞ্চম সাক্ষী তাঁর সহধর্ম্মিণী সতী জগন্মোহিনী দেবী। আমরা যতদূর অনুধাবন করিয়া দেখিলাম তাহাতে সতী জগন্মোহিনীর ন্যায় সাক্ষী প্রায় কেহ নাই। কেন না ব্রহ্মানন্দের অনুগমনে জীবন কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয় কেশব-সহ-ধর্ম্মিণীর জীবনই তাহার প্রমাণ। জগন্মোহিনী কেশবের বিবাহিতা পত্নী। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে প্রায় সকল সাধু মহাপুরুষই হয় বিপত্নিক নয় পত্নীত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসাধনা করিয়াছেন। এক মহম্মদ ছাড়া আর কেহই সপত্নীক ধর্ম্মসাধন করেন নাই। কিন্তু মহম্মদও ত্যাগ ধর্ম্ম সাধনের ভাব বড় একটা কিছু দেখান নাই। ব্রহ্মানন্দ ত্যাগ এবং গ্রহণ দুইএরই সামঞ্জস্য দেখাইতে আসেন, তাই তাঁর জীবনে এই উভয় প্রকারের লীলাই ভগবান যথেষ্ট দেখাইয়াছেন। সতী জগন্মোহিনীর সাক্ষ্য এই জন্য অতীব মূল্যবান। ব্রহ্মানন্দকে প্রথম জীবনে তাঁর পরিবারস্থ জ্যেষ্ঠ আত্মীয়দিগের দ্বারায় ধর্ম্ম সাধনের জন্য গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য

 প্রথম জগন্মোহিনী অতি অল্পবয়স্কা, কিন্তু তাহা হইলেও

তিনি শ্বশ্রুপত্নী বা অন্যান্য গুরুজনদিগের ভয়ে ভীত না হইয়া স্বামীর অনুগমন করিতে প্রস্তুত হন এবং তাঁহার সহিত গৃহত্যাগিনী হন। পূর্ব্বে এক রামায়ণে শুনিয়াছিলাম রামের সহিত সীতা বনগমন করিয়াছিলেন, আর বর্ত্তমানযুগে ধর্ম্মের জন্য স্বামীর অনুগমনের প্রথম দৃষ্টান্ত এই সতী জগন্মোহিনী প্রদর্শন করেন। এখন হয়ত স্বামীর সহিত বাটীর বাহিরে যাওয়া অনেকটা সহজ হইয়াছে, কিন্তু যখন স্বামীর সহিত সতী জগন্মোহিনী দেবী বাহির হন তখন ইহা ভয়ঙ্কর সমাজদ্রোহক ব্যাপার ছিল। কিন্তু সতী পতিকে চিনিয়াছিলেন তাই তাঁর ত্যাগেরও ভাগিনী হইয়া বর্ত্তমান যুগে এক নূতন দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন; এখন দেশে অবরোধ প্রথা অনেকটা ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া যাইতেছে, স্বামীর সহিত ধর্ম্ম-সাধন ও ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া একটা সহজ প্রথা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সতী জগন্মোহিনীই তার প্রথম পথ প্রদর্শন করেন এবং ইহাতে স্বামীরও মহাতেজস্বিনী আকর্ষণীশক্তির পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না।

সতী জগন্মোহিনী পরিবর্ত্তিতনবজীবনও তাঁর ব্রহ্মানন্দ অনুগমনের প্রধান সাক্ষ্য। জগন্মোহিনী অপর সাধারণ স্ত্রীর মতই প্রথমে সাংসারিক ভাবসম্পন্না ছিলেন। মহাত্যাগী বৈরাগী স্বামীর পাল্লায় পড়িয়া অনেক কষ্ট দুঃখই তাঁকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। এই সংসারের মহা কষ্টে পড়িয়া তাঁর যে আত্মবিস্মৃতিও মাঝে মাঝে কিছু কিছু যে উপস্থিত হয় নাই বলা যায় না, এবং সাধারণ স্ত্রীদিগের ন্যায় স্বামীর প্রতি অনুযোগ করিতেও হয়ত কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্রহ্মানন্দের মহা প্রভাব তাহাতে শেষ জীবনে সতী জগন্মোহিনী সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত জীবনলাভ করিয়া [illegible] যুগল মিলনে মিলিত হইলেন। জগন্মোহিনী

সতী জগন্মোহিনী উভয়েই প্রার্থনায় ব্যক্ত করিয়াছেন। সতী জগন্মোহিনীর দেবীর সাক্ষ্য এই :—

"আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার নববিধানের গৌরব বুঝিয়া তাহা পালন করি। ঢেউএর মত সময় চলে গেল। সেই একদিন ১লা বৈশাখ তোমার ভক্ত যখন আমার হাতধরে হিন্দু গণ্ডীর ভিতর হইতে বাহির করিয়া লয়ে গিয়াছিলেন। ঐ দেখা যাচ্ছে যথায় তোমার ব্রহ্মানন্দ সেখানে কেবল আনন্দ, ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ, হরিআনন্দ। এই দিনে তোমার ভক্ত আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইয়া ছিলেন, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া এই তিন দিনের জন্য ব্রত গ্রহণ করি।"

অন্য সময় "মা আর কতদিন ভুল ভ্রান্তিতে থাকিব? তোমার ভক্তকে বলেছিলাম মন ঠিক রাখব, কিন্তু সব ভুলে গেলাম? মোড়চে পড়ে গেছে, আবার ঘসলে চক চক করবেই। মন বিষয় কামনা ছাড়, এখন হইতে মন পরলোকের দিকে থাক।"

"তোমার ভক্ত নববিধানে প্রকাণ্ড ব্যাপার করে গেছেন। কৈ আমাদের জীবন ত ষোল আনা ছেড়ে এক আনাও দিচ্চি না? এই উৎসবের সময় ভক্ত কি করিতেন? যদি সুধু উপাসনা করি মূল ছেড়ে দিয়ে তবে কি হবে? যখন তিনি মা তোমার চরণে দিয়ে মা বলে হটালেন, তখন কি তোমার দাসী হইতে পারিলাম? যখন বৈরাগী হইলেন তখন কৈ বৈরাগিনী হলাম? হে দীনবন্ধু শুভ বুদ্ধি দাও। পাহাড়ে চড়াই উঠ্‌তে পাচ্চিনা। তবে যদি এখানে এনেছ? ভক্ত পরিবার ভিখারী ভিখারিণী করেছ, তবে মনে কেন অহং জ্ঞান আছে? যেন সর্ব্বত্যাগী বৈরাগিণী হইতে পারি। তিনি সন্ন্যাসীরূপ ধরলেন, আমি কেন সন্ন্যাসিনী হবনা? আজ সেই সকল কথাই মনে হচ্চে। যেখানে জ্বলন্ত আগুন

জ্বলেছে মরি কি বাঁচি সেইখানেই যাই।" যাঁহারা সহমৃতা হন তাঁহারাই এদেশে সতী নামে পরিচিতা হন। সতী জগন্মোহিনী যে ব্রহ্মানন্দের চির-সঙ্গিনী ইহার ভাব কি এই সকল প্রার্থনায় প্রকাশ পায় না? ব্রহ্মানন্দ-অনুগমন আকাঙ্ক্ষা তাঁহার সকল প্রার্থনাতেই অভিব্যক্ত।

ব্রহ্মানন্দও নিজে স্বীকার করিলেন:—"মা প্রার্থনায় কি না হতে পারে? প্রার্থনা কি সামান্য জিনিষ? এ স্ত্রীর কি আসিবার কথা ছিল? না। বড় প্রতিকূল, বড় শঙ্কা। এক দিকে আমি চলি, আর উনি অন্যদিকে চলেন। কিন্তু এখন কি সয়তান বাধা দিতে পারিল? সয়তান বলিয়াছিল দুই জনকে দুই পথে রাখিবে, পরস্পরের দেখা হবে না। সয়তান, তুই দূর হ। আমার বিশ বৎসরের প্রার্থনা কি জলে ভেসে যাবে? ঐ যে আশাপূর্ণ হচ্চে। আর বিষয়ীর মত চলিতে আর পশুভাব রাখিতে পারিব না। মা, এত দিনের কান্নাকাটীর পর কি করিয়াছ আমি জানি। এ কি কম কথা? একটা স্ত্রীলোক একটা পুরুষ এক হলো। আমরা দুজন একজন হলাম। তোমার হলাম। আমি সস্ত্রীক একতারা বাজাইতে বাজাইতে এই পথে অগ্রসর হই। আমি সচ্চিদানন্দের শিষ্য আমার পরিবার আমার ক্রোড়ে আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, আর যিনি আমার সঙ্গের সাথী তাঁকে আশীর্ব্বাদ কর।—দৈঃ প্রার্থনা, 'যুগল ব্রত গ্রহণ।'

ব্রহ্মানন্দের প্রার্থনার ফলেই যে সতী জগন্মোহিনীর জীবনের পরিবর্ত্তন উপরোক্ত কথায় তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে। জগন্মোহিনী দেবীর ও প্রার্থনায় প্রমাণ যখন সংসারাশক্ত জীবনও সন্ন্যাসিনী যোগিনী হইলেন, ইহার ন্যায় ব্রহ্মানন্দের মহত্ত্বের সাক্ষ্য আর অধিক কি হইতে পারে।

... ...কলিকে প্রচারক মহাশয়দিগের বর্ত্তমান

হয়। কেন না, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাঁরা প্রতিজনই এক একজন সত্যই মহা সাধু পুরুষ। ইহা অত্যুক্তি নয়। ব্রহ্মানন্দও নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছেন ইহাঁদের মধ্যে সামান্যতমও যিনি তিনিও পৃথিবীর কোন না কোন দলের শার্ষস্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত, ইহাঁদের প্রত্যেকের যে সে শক্তি আছে ইহাঁদেরই মধ্যে এ কজন বিজয় বাবু কতলোকের গুরু হইয়া তাহার পরিচয় দিয়াছেন। ইহাঁরা প্রতিজনেই এক একজন বিজয় কৃষ্ণের ন্যায় প্রতিভাশালী হইতে পারেন এবং এক একজন এক এক বিষয়ে যথার্থই অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন। ইহাঁরা প্রতিজন স্ব স্ব প্রধান স্বাধীন এবং কেহই কাহারো নিকট মাথা হেঁট করিবার নহেন। এখনও ইহাঁরা এক একজন মরা হাতী লক্ষ টাকা বলা যায়। এই যে এমন ইহাঁরা ইহাঁদের একত্র করিয়া এক পরিবার করিয়া বাঘ বলদকে একঘাটে জল খাওয়ান যাকে বলে তাই করিয়া ব্রহ্মানন্দ যে নববিধানের আদর্শ মিলন দেখাইয়া নববৃন্দাবন কার্য্যতঃ অভিনয় করিয়াছিলেন ইহা সামান্য তাঁর মহত্বের পরিচয় নহে। এখন সেই গাণ্ডীবও আছে সেই অর্জ্জুনও আছে, সেই সকলই আছে, এক কৃষ্ণের শক্তি হরণ হেতু যেমন পাণ্ডবদের দশা হইয়াছিল এখন ব্রহ্মানন্দের ব্যক্তিত্বের প্রভাব প্রত্যাহার হেতু ইহাঁদের যেন সেই অবস্থা আরত সে মিলন হইতেছে না। এবং এখনও যদি ইহাঁরা পরস্পরের দোষ দুর্ব্বলতা মনুষ্য স্বভাব সুলভ জানিয়া তাহা বহন করতঃ ব্রহ্মানন্দপ্রেমে আবদ্ধ হন এখনই স্বর্গ দেখাইতে পারেন। সুতরাং ইহাঁদের অসম্মিলনও ব্রহ্মানন্দের মিলনকারী মহা প্রেম শক্তির এক মহা সাক্ষ্য।

এই খানেই বলিয়া যাই স্বাধীন স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন মানবগণ কিরূপে মিলিয়া এক প্রাণ এক মন এক দেহ এক মণ্ডলী হইতে পারে তাই [illegible] লইয়া ব্রহ্মানন্দ অবতীর্ণ। সকল মানুষ স্বাধীন

কেহ কাহারও সহিত পূর্ণ মিলনে মিলিত হইতে পারে না ইহাই এতদিন মানবের প্রাচীন সংস্কার ছিল ব্রহ্মানন্দ নববিধানের নববিজ্ঞানে আবিষ্কার করিলেন যে তাহা হইতে পারে। তাঁহারই চেষ্টার সংঘর্ষণেই প্রেরিত মহাশয়-দিগের এই অসম্মিলন। এ অসম্মিলন সত্ত্বেও যে সব পরস্পরকে ছাড়িয়া কেহ দল বাঁধিতে পারিতেছেন না, ইহাতে ব্রহ্মানন্দের প্রেমই যে তাঁহাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছে ইহাই প্রমাণ। মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাব, অসম্পূর্ণ শিক্ষাদি জনিত বৈষয়িক বা সাংসারিক সামান্য সামান্য বিষয়ে কিছু কিছু মত ভেদ থাকিবেই, তাহা লইয়া যে বিবাদ তাহাও অস্থায়ী। অনন্ত জীবনের অধ্যাত্ম মুক্তি বিষয়ে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আকাঙ্ক্ষা এক হইলেই মিলন হইবেই হইবে। এই অধ্যাত্ম মিলনই নববিধানের মিলন।

"জীবনবেদ।"

এখন এই কয়েকটী সাক্ষ্য এবং ব্রহ্মানন্দের আত্ম-পরিচয়ে তিনি যে কি ছিলেন সর্ব্বসাধারণে বুঝিতে পারিবেন। "বিশ্বাস, প্রেম এবং পবিত্রতা" তাঁর জীবনের মূল নীতি। 'প্রকৃত বিশ্বাস' নামক পুস্তিকায় তাঁর জীবনের নক্সা তিনি নিজ হস্তে রচনা করেন এবং তদনু-সারেই জীবন চরিত্র চিত্রিত করেন কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন কিরূপে স্বয়ং ভগবান ক্রমবিকশিত করেন। তার পরিচয় তাঁর "জীবনবেদে" তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। এই পাপ মানবজীবনকে কিরূপে ক্রমোন্নত করা যাইতে পারে তাহার অতি সুন্দর আদর্শ তাহাতে দেখান হইয়াছে। ফলে

এবং তার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন লইয়া পারিবারিক ও সামাজিক এবং রাজপুরুষবর্গের সহিত পরিচয়ে রাজনৈতিক ইত্যাদি সংসারের যাবতীয় উচ্চ বা সামান্য সামান্য কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত এক ধর্ম্মোদ্দেশ্যে সাধন করিতে হয় সমুদয়ই ব্রহ্মানন্দজীবনে অতি সুন্দররূপে প্রকটিত রহিয়াছে; এমন কি যেমন বলে যা নাই ভাণ্ডে তা নাই ব্রহ্মাণ্ডে, তেমনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় মানবপ্রকৃতির উন্নতি সাধনের আদর্শ সকলই এই মহামানবজীবনে প্রাপ্তব্য। কেন না স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডপতি নিজ হস্তে এই জীবনবেদ সমগ্র মানব জাতির আদর্শ করিয়া রচনা করিয়াছেন। তাই এই জীবনবেদের সার সংগ্রহ করিয়া সংক্ষেপে আমরা এইখানেই উদ্ধৃত করিতেছি:—

১ম অধ্যায়, প্রার্থনা।—"আমার জীবনবেদের প্রথম কথা প্রার্থনা। যখন কেহ সহায়তা করে নাই, ধর্ম্মজীবনের সেই উষাকালে 'প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর' এই ভাব, এই শব্দ হৃদয়ের ভিতরে উত্থিত হইল। প্রথমে বেদ বেদান্ত, কোরাণ পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে প্রার্থনা, তাহাই অবলম্বন করিলাম। সকালে একটী আর রাত্রিতে একটী, লিখিয়া প্রার্থনা সাধন করিতে লাগিলাম। প্রার্থনা করিতে করিতে সিংহের বল, দুর্জ্জয় বল, অসীম বল লাভ করিতে লাগিলাম। দেখি আর সে শরীর নাই, সে ভাব নাই, কি কথার বল কি প্রতিজ্ঞার বল? বলিলেই হয়, প্রতিজ্ঞা করিলেই হয়। পাপকে ঘুসি দেখাইতাম আর প্রার্থনা করিতাম। সকল বিষয়েই সহায় প্রার্থনা। তখন একমাত্র প্রার্থনা ধনই ছিল; কেবল তাহার উপরে নির্ভর করিতাম। আমি জানিতাম প্রার্থনা করিলেই শোনা যায়। আদেশের মত এইরূপে প্রথম হইতে হৃদয়ে নিহিত আছে। পারত্রিক মঙ্গলেরই কামনা

২ য়, পাপবোধ। -"পাপ কি, কি করিলে পাপ হয়, এ সকল বিচার করিয়া আমার পাপবোধ হয় নাই, পাপ দর্শনে পাপবোধ হইল, সেই মত মানি না যে মতে পাপেই মানুষের অন্ত নির্দেশ করে। পাপের সম্ভাবনায় কিন্তু ইহা মানি। শারীরিক প্রবৃত্তি যখন আছে, তখন পাপের মূল সেইখানে।

"আমি পাপ করিতে পারি, কি করিতে পারি? মিথ্যা কথা বলিতে পারি; চুরি করিতে পারি? সে কিরূপ? যদি কাহারও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া লইতে ইচ্ছা হইল, কি 'আমার হয় তাহার না থাকে' এক মিনিটের জন্যও এরূপ ভাব আসিল, তবেই চুরি হইল। ভৃত্যকে এক দিন বেতন দিতে যদি বিলম্ব হয়, অমনি বিবেক বলে, ওরে পাপী! অন্যায় ব্যবহার? ঘড়ীর কাঁটা যেমন বার বার বাজে, আর বার বার কে বলে 'তোর কিছুই হয় নাই, তোর কিছুই হয় নাই কিছুমাত্র হয় নাই।' ঘোড়াকে যেমন চাবুক মারে, তেমনি এই ভিতরের কথা আমাকে চাবুক মারিতে থাকে। আশ্চর্য্য এই, আমি কাঁদি আবার হাসি।

"ঔষধ খাইলে যদি শরীর সুস্থ হয়, তবে সে ঔষধ কে না খায়? এই জন্যই আমি বন্ধুদিগকে কেবল বলি, ওগো তুমি পাপী, তুমি অধম, তুমি অপরাধী, কিন্তু আমি যেন নামতা পড়িতেছি, কেহই আমার কথা গ্রাহ্য করে না। পাপের বোধ হইলে দুঃখ হয়, কষ্ট হয়, জ্বালা হয়, তাহা হউক। আমাদিগের মা এমনই দয়াবতী যে, তিনি কষ্টের পর সুখ রাখিয়াছেন। যদি পাপ করিয়া থাক তোমার প্রাণ ছটফট করুক; যেমন ছটফট করিবে, অমনি শান্তিদেবী নিকটে আসিয়া তোমাকে শান্তিদান করিবেন।"

৩য়, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা।—"যদি জিজ্ঞাসা করি, হে আত্মন! নবজীবনের

হইয়াছিলে? আত্মা উত্তর দেয় অগ্নিমন্ত্রে। মধু-

করিতাম। কি মনের চারিদিকে, কি সামাজিক অবস্থার চারিদিকে, তুই উৎসাহের অগ্নি জ্বালিয়া রাখিতাম। যখনই মনে হইবে শীতল ব আসিতেছে, দুর্ম্মতি, কাম, ধূর্ত্ত ব্যবহার, কপটতা সব সঙ্গে সঙ্গে নিতেছে। হাত পা গরম থাকিলে শরীরে জীবনের লক্ষণ প্রকাশ য়, তেমনই কার্য্য, চিন্তা, আশা, বিশ্বাস, কথা, ব্রত, এ সমুদয়ে তাপ থাকিলে ধর্ম্মজীবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। উৎসাহদাতা, প্রাণ-তা যিনি, তাঁহাকেই ডাকি, উৎসাহের সহিত অগ্নিস্বরূপকে ডাকি। অগ্নি, অগ্নি, অগ্নি, রসনা ইহাই কেবল উচ্চারণ করুক, হৃদয় সর্ব্বদা এই মন্ত্র সাধন করুক।"

৪৫, অরণ্যবাস ও বৈরাগ্য।—"সংসারে প্রবেশ করিবার কাল আমার পক্ষে শ্মশানে প্রবেশ করিবার কাল। ঈশ্বর স্থির করিয়াছিলেন, সুখ উদ্যানের পথ আমার পক্ষে মৃত্যু, তাহাই ঘটিল। শোক, সন্তাপ, বৈরাগ্য আমার ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইল। অষ্টাদশ বৎসর বয়সে অল্প অল্প ধর্ম্মজীবনের সঞ্চার হয়, কিন্তু চতুর্দ্দশ বৎসরেই মৎস্য ভক্ষণ পরিত্যাগ করিলাম।

"সংসারের বিলাসেই অনেক লোক মরিয়াছে। ভিতর হইতে এই শব্দ হইল, 'ওরে তুই সংসারী হস্ না; সংসারের নিকট মাথা বিক্রয় করিস্ না। কলঙ্ক, পাপ এ সকল ভারি কথা, আপাততঃ আমোদ ছাড়, আমোদের পথ ধরিয়া অনেকে নরকে যায়।' সংসারের প্রতি ভয় জন্মিল; যাই সংসারের কথা মনে হইত, ভাবিতাম যেন নরকের দূত আসিল। যাহাতে কষ্ট হয়, গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি হয়, কুচিন্তার দিকে মন না যায়, এমন সকল বিষয়ে নিযুক্ত হইতাম। এই সকল হইল কখন? আমার উনিশ কুড়ি বৎসরে। যখন বিবাহ করিয়া সংসার করিব, দেখি

যেন আরও ব্রহ্মবাণীতে বিশ্বাস লাভ করি; তোমরাও যেন এই বিশ্বাসের পথ ধরিয়া আপনাপন কল্যাণ সাধন কর।"

৭ম, ভক্তিসঞ্চার।—"এই জীবনে প্রথমে ভক্তি ছিল না; প্রেমের ভাবও অধিক ছিল না; অল্প অনুরাগ ছিল। ছিল বিশ্বাস, ছিল বিবেক, ছিল বৈরাগ্য। তিন লইয়া এই সাধক ধর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল, আর যাহা যাহা প্রয়োজনীয় সবগুলিই দেখা দিল। হাত জোড় করিয়া ঈশ্বরকে ডাকিতেছিলাম, পরে দেখি তিনিই আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। মা বলিতে শিখিলাম। মা নামের মধ্যেও কত রূপ দেখিলাম। পাথরের উপর প্রেমফুল প্রস্ফুটিত হইল। সকলই হইতে পারে, প্রার্থনার বলে। যা কিছু অভাব সকলই মোচন হয়। এখন জল স্থল আমার উভয়ই আছে। বিশ্বাস হিমালয় আছে, ভক্তিসরোবর আছে। যেমন বৈরাগ্য তেমনি প্রেম।"

৮ম, লজ্জা ও ভয়।—"এ জীবনে দুইটী ভাবের বিরোধ দেখিলাম, শ্রবণ কর। সেই বিরোধের সামঞ্জস্য শান্তি যথা সময়ে জীবনে সম্ভোগ করিতেছি জানিবে। এই জীবনে লজ্জা ও ভয়ের দাস হইয়া অনেক দিন হইতে থাকিতে হইয়াছে। লজ্জা ভয়ের ক্ষেত্র আছে। হরি ধর্ম্মভূমি হইতে লজ্জা ও ভয়কে বিদায় করিয়া সংসারে রাখিয়াছেন। যে পরিমাণে বিশ্বাস বাড়িল, ধর্ম্ম সম্বন্ধে লজ্জা ভয় সেই পরিমাণে কমিল। ধনী, মানী ও বিদ্বান এই তিন প্রকার লোকের কাছে মন সহজে যাইতে পারে না, সহজে যাইতে চায় না। কর্ত্তব্য বলে, যাও, তাই যাই। যেখানকার বিষয়ে ধর্ম্মকথা নাই, ধর্ম্মসংশ্রব নাই, সেইখানেই লজ্জা, সেইখানেই ভয়। দশজনের কাছে বিরুদ্ধ সত্য মত প্রচার করিতে হইলে নির্লজ্জ হইব, ভয় ত্যাগ করিব। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাজা বড় লোক হইলেও সত্য

প্রচার করিব। কিন্তু অন্যত্র কেন ভয় হয়, জানি না। এক স্থানে সিংহ সে, অন্য স্থানে মেষশিশু সে।"

৯ম, যোগের সঞ্চার।—"ভক্তি যেমন আমার পক্ষে উপার্জ্জিত বস্তু যোগও তদ্রূপ। ধর্ম্মজীবনের আরম্ভকালে যোগী ছিলাম না; যোগের নাম শুনিতাম না, যোগ কথা জানিতাম না। ভক্তি যখন বাড়িতে লাগিল, তখন বুঝিলাম, ভক্তিকে স্থায়ী করিবার জন্য যোগ আবশ্যক। ক্ষণস্থায়ী প্রেমভক্তি জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু যোগ ব্যতীত তাহা চিরকাল থাকে না। ঈশ্বরে যদি বিশ্বাস থাকে তবে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হওয়া আবশ্যক। অনেকে কঠোর যোগের মধ্যে পড়িয়া ভয়ানক অদ্বৈতবাদ-সাগরে পড়িয়া গিয়াছেন; ভক্তির উচ্ছ্বাসে পড়িয়া অনেকে কুসংস্কারে পতিত হইয়াছেন। আমি দুই দিক বাঁধিলাম।

"যোগ কি? অন্তরাত্মার সঙ্গে এমনই সংযোগ যে প্রতি বস্তু দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তৎসঙ্গে ব্রহ্মের দর্শনলাভ। সর্ব্বত্র এক জ্ঞান ঝক্ ঝক্ করিতেছে, এই অনুভব হইবে। আশা দিতেছি, উৎসাহ দিতেছি, ব্রহ্মপাদপদ্ম ধরিয়া যোগী হও, ভক্ত হয়।"

১০ম, আশ্চর্য্য গণিত।—"আমাদের দেশের অঙ্কশাস্ত্র অতীব আশ্চর্য্য; কেন না তাহার মতে তিন হইতে পাঁচ লইলে সতর অবশিষ্ট থাকে। আমরা বলি বাড়ী চাই ঈশ্বর? হাঁ। বুঝিলাম তৎক্ষণাৎ আকাশের উপর চারতালা বাড়ী হইল। বাড়ী নির্ম্মাণ হইল, টাকাও আসিতে লাগিল, তখন পত্তন হইল। আগে ভাবিয়া করিবে না; আগে করিয়া পরেও ভাবিবে না; আগেও না, মধ্যেও না, পরেও না; ভাবনা কখনই করিবে না। ঈশ্বরাদেশে কার্য্য করিবে; যেখানে দেখা গেল সকল লোকই এই কার্য্যের সুখ্যাতি করে, এই কার্য্য যদি করা যায়, সকল

লোকেই সুখ্যাতি করিবে। সাধক অমনই বুঝিলেন এ কার্য্য মন্দ কার্য্য ইহাতে সর্ব্বনাশ হইবে। পৃথিবী যাহাতে বিমুখ, ঈশ্বর তাহাতে অনুকূল। লক্ষ লোক যে কাজে প্রয়োজন, সাধক ভক্ত দৃঢ়স্বরে বলেন, তিন জনের দ্বারা তাহা অনায়াসে সাধিত হইবে। এই জন্য যিনি আমাদের দেশ হইতে আসেন, তিনিই চান অল্প লোক থাকে। অসংখ্য লোক এক শত লোক হইল। এখনও এত লোক, আসল পথে এত লোক? আরও শক্ত সাধন প্রবর্ত্তিত হইল। কেহ ইহাতে বিরক্ত হইল, কেহ নিন্দা করিয়া পলায়ন করিল। যার টাকা আছে, তাহার দ্বারা যাহা হয় না, যার টাকা নাই, তাহারই দ্বারা তাহা হয়। এ আশ্চর্য্য ব্যাপার কে বুঝিবে? পৃথিবীর পাণ্ডিত্যকে ধিক্। উপাসনায় যাহা হয়, চিন্তায় পাণ্ডিত্যে তাহা হয় না। ধনাঢ্য ও পণ্ডিতে যাহা করিতে না পারে, আমাদের দেশের এক ভক্ত, ভক্তবৎসল আদেশ করিলে তাহা অনায়াসে করিতে পারে। যার কিছু নাই, তারই জয়। অগ্নিমধ্যে দক্ষিণ হস্ত, প্রজ্বলিত হুতাশনে বাম হস্ত রাখ; সাহসে পূর্ণ হও; মুখে জপ করিয়া দণ্ডায়মান সাধক স্বর্গরাজ্যে বাস কর।"

১০দশ, জয়লাভ।—"যখন ভগবানের আনন্দবাজারে প্রথম দোকান খোলা হয়, তখন এই নিয়ম করা হইয়াছিল যে ঋণ করিয়া কিছু করা হইবে না, এবং ধারে কিছুই বিক্রয় করা হইবে না। পরের কথায় বিশ্বাস করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলাম না, যাহা আপনার নয় তাহা আপনার বলিলাম না। বন্ধু দক্ষিণ হস্তের কাছে রহিয়াছেন তাঁহাকেও বলি, 'হরি আমাকে সাহায্য কর'। জীবনের সুপ্রভাতে বিধাতা বলিয়া দিলেন 'তিনি নগদ দেন ধারে দেন না, নগদ বহুমূল্য ঐশ্বর্য্য তিনি অর্পণ

লাভ করা সম্ভব, সমস্ত পাইব। ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ হইল, দুই বৎসর যাইতে না যাইতে দেখি প্রচুর ফল; লোকে লোকারণ্য। কি ছিল পঁচিশ বৎসর আগে, কি হইয়াছে পঁচিশ বৎসর পরে? ধর্ম্মে ধর্ম্মে কি বিবাদ ছিল; অধর্ম্মের প্রতি লোকের কি আসক্তি ছিল; [illegible] কি ক্ষীণ করিয়া রাখিয়াছিল। ভক্তি প্রেমের কি অভাব ছিল, দুর্ব্বল বাঙ্গালার পক্ষে উৎসাহের কিরূপ অভাবই ছিল। দশ কুড়ি বৎসরের অপ্রতিহত যত্নের পর সত্য বিস্তার ও রক্ষার সম্ভাবনা বর্দ্ধিত হইল। অনেক কীর্ত্তি মাটি হয় যে দেশে, সেই দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম নববিধানে পরিণত হইল। যে হিসাবের কাগজ খুলি, দেখি পাঁচ টাকায় আরও পাঁচ লক্ষ টাকা লাভ। অবিশ্বাস নাস্তিকতা আসিতেছিল। বন্যার মত অবিশ্বাসের ভাব প্রবল হইতেছিল, বঙ্গদেশের যুবকগণ নিমীলিত নয়নে কে জানিত এমন সময়ে, 'এই ব্রহ্ম পেয়েছি' 'এই ব্রহ্ম পেয়েছি' 'সর্ব্বেশ্বর মহেশ্বর হৃদয়েশ্বরকে এই ধরেছি,' বলিবে? এ ব্যাপার এখন চক্ষে দেখিয়াছি, অপরকে দেখাইয়াছি। এখন শাক্তে বৈষ্ণবে মিল হইতেছে। আমি যে হরিদাস, প্রভুর যাহা দাসেরও সে তাহা। ব্রহ্মাণ্ড ও আমার হস্তগত হইল। আমি কি জন্মিয়াছি কখন হারিবার জন্য? রসনা যদি হরিনাম উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা থাকে তবে এ রসনা কখনও হারিবে না। যদিও অন্য বিষয়ে হীন হয়, যদিও ধন নাই, মান নাই, আর সাধন ভজন নাই, কিন্তু হরিনামের বল আমার উপর, আমার দলের উপর আছে।

"মায়ের মতো বাড়ী প্রস্তুত হইল। বিরোধীদের প্রাণের মধ্যেও নববিধান প্রবিষ্ট হইয়াছে। খ্রীষ্টান হিন্দুতে পরস্পর আসক্ত হইয়াছে। [illegible] প্রাচ্যে মিলন হইতেছে। একজন পাপিষ্ঠের জীবন যদি এত কীর্ত্তি

স্থাপন করে, তোমরা সহস্র ভাই একত্র হইলে হরিনামের মহিমা কত বিস্তার করিতে পার। এক পাপী এত দেখালে তোমরা সহস্র সাধু আরও অনেক দেখাও।"

১২দশ, বিয়োগ ও সংযোগ।—"মন ধর্ম্মরাজ্যে বসিয়া বসিয়া সকল বিয়োগ ও সংযোগ ক্রিয়া সমাধা করিতেছে। কাহারও মনে এই বিয়োগভাব প্রবল, কাহারও মনে আবার সংযোগ স্পৃহা বলবতী। আমার স্বভাবের মধ্যে দুএর সামঞ্জস্য রাখিবার চেষ্টা হইতেছে। একটী একটী করিয়া সাধন করিয়াছিলাম। কখনও বৈরাগ্য, কখনও পুণ্য, কখনও প্রেম, এক একটী করিয়া সাধন করিয়াছি। ঈশ্বরের স্বরূপের মধ্যে প্রথমে ন্যায়ের ভাবই হৃদয়ে প্রবল হইয়া প্রকাশিত হইল। অনেক দিন পরে ন্যায়ের পরিবর্ত্তে দয়ার ভাব ও অনুতাপের পরিবর্ত্তে ভক্তি প্রেমের সঞ্চার হইল। যাবতীয় স্বরূপ একত্র ধরিবার জন্য আগ্রহ ছিল না; যখন যেটী প্রয়োজন তখন সেইটী করিবার জন্যই চেষ্টা ছিল।

"প্রথম ইচ্ছা জন্মে নাই, নববিধানে সমস্ত একত্র গাঁথিব, পরে দেখি প্রকৃতির মধ্যে কে তাহাই করিতেছেন। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন ঈশ্বরের মত পূর্ণ হও। বহুদিন হইতে স্বর্ণাক্ষরে এই উপদেশ মনে লেখা ছিল। মনে হইত, খণ্ড খণ্ড ভাব লইয়া থাকিব না। আমি একজনকে নিমন্ত্রণ করিব একটী লইব মনে করি, (হৃদয়) নারদ তাহা করিতে দেন না। একটীকে আনিতে গেলেই সকলগুলিকে আনিতে হয়, ঈশা মুষা যেন পরস্পর হাতে হাতে বাঁধিয়াছেন। এই দেখিয়াই নববিধান নামে আখ্যাত করিলাম নব ব্রাহ্মধর্ম্মকে। বাল্যকালে চলিয়াছি, যৌবনে ভ্রমণ

ও ঢের অভাব আছে। ভাই বন্ধু, ঈশ্বরের পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য া চলিতে হইবে। আর অংশ লইয়া ঈশ্বরের অপমান করিও না। দাসের বক্ষ বিদারণ করিও না।"

১৩দশ ত্রিবিধ ভাব।—"সাধকের জীবনধাতু এক জাতীয় নহে, ইহা অল্প চনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহা সংযুক্ত ধাতু, ত্রিবিধ ধাতুর । ইহাতে। তিন প্রকৃতি এই জীবনে বিরাজ. করিতেছে। একটী , একটী উন্মাদ, আর একটী মাতাল। নিগূঢ়রূপে প্রত্যেক সাধকের র অল্প অল্প এই তিন প্রকার মসলা মিশান হইয়াছে। প্রথম য় সাধকের জীবনে অল্প পরিমাণে বালকত্ব, উন্মাদ লক্ষণ ও মাতাল ত্ব লক্ষ্য হয়। যতই সাধনে পরিপক্ক হয় ততই এই সকল গুণ বাড়ে। বৎসরের যে বালক, সেই বালক আমি। কোটী বৎসর কার্য্য যে কার্য্যালয়ে, সেখানে আমি এখন সম্পূর্ণ বালক। মাকে খুব ত ডাকতে ছেলে মানুষের ভাব আসে। রাজাধিরাজের পূজাই কেবল কর, বৃদ্ধ হইয়া যাইতে পার। মার পূজা করিয়া কখন বৃদ্ধ না। বৃদ্ধ আর হইব না। পরলোকে গিয়া বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি ; সেখানে শিখিব, মাকে মা বলিয়া ডাকিতে হয় এই মন্ত্র, এই

।

এই বালকের মসলা ভিতরে ; তাঁর সঙ্গে উন্মাদের মসলা। উন্মাদের কাহারও মিলে না। ক্রমাগত এমন সকল কার্য্য করা চাই যাহাতে া বলিবে, এ সকল বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। বিপরীত রকমের কার্য্য দেখিয়া লোকে উন্মাদ ক্ষেপা বলিয়া উপহাস করিবে। তৃতীয় ... সুরা পানের মত্ততা পৃথিবীতে আছে, আমা-

বাড়াইতে হয় আমরাও তাই করি। পাঁচ মিনিট উপাসনা ছিল; এখন পাঁচ ঘণ্টা হইয়াছে। যতদিন বালকত্ব আছে, পাগলামি আছে, ততদিনই সুখ ও পবিত্রতা। যে দিন বৃদ্ধ হইব, পাগলামি ছাড়িব, উন্মত্ত অবস্থা তিরোহিত হইবে, নেশা ছুটিয়া যাইবে, সেই দিনই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। ভগবান্ করুন যেন এ তিনের সঙ্গে বিচ্ছেদ কখনও না হয়।"

১৬দশ জাতি নির্ণয়।—"যদি মানবমণ্ডলীকে ধনী এবং দরিদ্র জাতিতে বিভাগ করা যায় আমি আমাকে কোন্ শ্রেণীভুক্ত মনে করিব? অনেক অনুসন্ধানে এবং পঁচিশ বৎসরের সূক্ষ্ম আলোচনা দ্বারা ইহা স্থির হইতেছে মনের কামনা অভিরুচি তন্ন তন্ন করিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে যে, আমি দরিদ্র জাতি। যদিও উচ্চ কুলোদ্ভব যদিও নানা প্রকার ধনমান ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছে; কিন্তু মনের মধ্যে তাহার অনুরূপ ভাব কোথাও পাওয়া যায় না।

"ধন আছে, কিন্তু ধনের প্রয়াস নাই; উপাদেয় আহার্য্য আছে, কিন্তু আহারস্পৃহা নাই; মন সামান্য বস্তুতেই সন্তুষ্ট। মান মর্য্যাদা চারিদিকে আছে, কিন্তু মন সে সকলের খবর লয় না। দুই দলের লোক আসিলে ধনী ছাড়িয়া মন দরিদ্রের খোঁজে লয়; দরিদ্র সহবাসে মন পরিতৃপ্ত বোধ করে। বাষ্পীয় শকটে যদি কোনখানে যাইতে হয়, তৃতীয় ছাড়িয়া প্রথম শ্রেণীতে যাইতে ভয় হয়। আমি ধনীদের জন্য নই, দরিদ্রের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছি। যেখানে দরিদ্রেরা, সেইখানেই আমার আরাম। কথিত ছিল ধনীকে ঘৃণা করিয়া দীনকে মান্য দিবে। পরাক্রমশালীকে অগ্রাহ্য করিবে। পরিত্রাণের পথে ধনীরা যাইতে পারে

ও মান দিবে, এবং দুঃখীকেও মান দিবে। স্বর্গের পথে ধনী দুঃখী ই চলিতেছে। বাহিরে ধন থাকিলে ক্ষতি নাই মনে দুঃখী ই হইবে।

"যদিও আমি হীন স্বভাব ও দীন মন পাইয়া মাতৃগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ য়াছি, যদিও ভূমিষ্ঠ হইয়াই বুঝিলাম আমি দীন হীন, কিন্তু চারিদিকে য়া দেখিলাম, ধনীদের মধ্যে জন্ম, প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দাস, দাসী, র্যের মধ্যে অবস্থান। দীন জাতীয় হইয়া যদি দীনের ঘরে থাকিতাম ন ব্যবহার করিতাম, তাহা হইলে হয় তো দীনদিগেরই পক্ষপাতী হই- ম; ধনীর মস্তকে হয় তো কুঠারাঘাত করিতে চাহিতাম। এই দুই তীয় ভাবের মধ্যে থাকিয়া সহস্রবার ঈশ্বরকে নমস্কার করিলাম। নীর পক্ষপাতী হইলাম, দুঃখীরও পক্ষপাতী হইলাম। নিজে হইলাম ন, মান দিলাম ধনী দুঃখী উভয়কেই; প্রেমে উভয়কেই আলিঙ্গন রিলাম। নিজে দীন দরিদ্র জাতি থাকিলাম ইহাতেই সুখ, শান্তি; নতাস্বরই পরিত্রাণ।"

১২দশ শিষ্যপ্রকৃতি।—"এই পৃথিবী বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে যতদিন কিতে হইবে, ধর্ম্মোপার্জ্জন ও জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া ব্রহ্মকে লাভ করিব। ই জন্যই আপনাকে কখনও শিক্ষক মনে করিতে পারি নাই; শিক্ষক লিয়া কখনই আপনাকে বিশ্বাস করিব না। শিষ্য হইয়া আসিলাম, ষ্যের জীবন ধারণ করিতেছি, শিষ্যই থাকিব অনন্তকাল। কত গুরুর কট হইতেই সত্য শিখিতেছি। আকাশ গুরু, পাখী গুরু, মৎস্য রু; সকল গুরুর নিকটেই শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছি।

"ঘোরান্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রকাশ যেমন তেমনি আমাতে সত্য প্রকাশ য়। কোন বস্তু দেখিতেছি, কি কোন কাজ করিতেছি, গাছের পানে তাকা-

ইয়া আছি, কে যেন আমার নিকটে সত্য আনিয়া দেয়। মনের ভিতর একটী সত্য আসিল, অমনই হৃদয় বিদ্যুৎপ্রকাশের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল, সমস্ত জীবন আলোড়িত হইল। মনে ধাক্কা দিয়া এক একটী সত্য আসিয়া থাকে। শিক্ষা আমার শেষ হইয়াছে, এখন শিক্ষা দিতে হইবে, এ কথা কখনও মনে আসে নাই। যখন শিখিয়াছি, তখন আমি শিষ্য; যখন শিখাইয়াছি, তখনও আমি শিষ্য। কি ভক্তিসম্বন্ধে, কি ব্রহ্মদর্শন বিষয়ে শিক্ষার অন্ত হইল না। সমস্ত শাস্ত্রের সমন্বয় কিরূপে হয় এ সম্বন্ধে ব্রহ্মপ্রমুখাৎ কত আশ্চর্য্য কথা শুনিয়াছি তথাপি ফুরাইল না। 'গ্রহণমন্ত্র' আমি সাধন করিলাম, 'প্রদানমন্ত্র' আমি কখনও লই নাই। 'দান' আমার মূল মন্ত্র নয়। সত্য আসিলেই বাহির হইবে, এই স্বভাবের নিয়ম। মুখ খুলিয়া কি বলিব, কখনই চিন্তা করিলাম না। যখনই বলিতে হইল, সত্য আপনা আপনি সতেজে প্রকাশিত হয়। গুরুগিরি অসার; তাহা কখনও অবলম্বন করি নাই; পুরাতন কথা বলি নাই। গত বৎসর যাহা বলিয়াছি, এ বৎসরেও যে তাই বলিব, তাহা নহে। ভাল কথা পাঁচ জনকে শুনাইতেছি, ইহা মনে হইলেই জিহ্বা জড়াইয়া যায়, বাক্‌রোধ হয়, শরীর মন সঙ্কুচিত হয়। আমি শিখিলেই শিখান হইল; আমি পাইলেই দশ জনের পাওয়া হইল। সামান্য গায়ক দেখিলে তাহারও পায়ে পড়িয়া শিখিতে ভালবাসি। কোন বৈরাগী আসিলে লক্ষ টাকা ঘরে আসিল ভাবিয়া তাহার সঙ্গীত শুনিয়া কত শিক্ষা করি; যে কোন লোক হউক, নূতন কথা বলিতে আসে মনে করি, যে কোন প্রকারে তাহার নিকট হইতে কিছু আদায় করিতে পারিলে হয়। এ জীবনে কেহ কাছে আসিয়া না দিয়া চলিয়া যায় নাই। হৃদয়ের ভিতরে ভগবান

হতে পারি সাধু যখন নিকট হইতে চলিয়া যান, হৃদয়ের গুণ ঢালিয়া য়া গেলেন। আমি যেন তাঁর মত কতকটা হইয়া যাই। আমি জন্ম-মো; জন্ম হইতে শিখিতেছি, শিক্ষা আর ফুরাইল না। সকলেরই নকট হইতে চিরদিন শিক্ষালাভ করিব; শুকরাদি পশুর নিকট ইতেও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইব। শিখিতে শিখিতে পরলোকে যাইব।"

১৬দশ অনৃতখণ্ডন।—"আমার জীবনবেদ পাঠ না করিয়া, সমুদয় পরি-চ্ছেদ অধ্যয়ন না করিয়া কেহ কেহ অন্যায় কথা সকল বলিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা মিথ্যা কথা অপরাধে ঈশ্বর ও মনুষ্যের নিকট অপরাধী হইয়াছেন। মিথ্যা কথা দোষে কে কে দোষী? কে কে অপরাধী? পৃথিবীর শ্রদ্ধের ভক্তিভাজন ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষদের সঙ্গে, পুণ্যের প্রবর্ত্তক, মুক্তির সহায় ঈশা গৌরাঙ্গের সঙ্গে, এই নরকের কীটকে যাঁহারা এক শ্রেণী-ভুক্ত করিলেন, এই বেদী তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিতে কুণ্ঠিত নহেন।

"যদিও সাধু মহাপুরুষদের সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত হইবার উপযুক্ত নই, নির্ম্মলচরিত্র সাধুদের সঙ্গে, পবিত্রচরিত্র মহর্ষিদিগের কাছে বসিবার উপযুক্ত নই, তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে জ্ঞান এবং পুণ্য, শান্তি ও প্রেম ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিতেছে। যাঁহারা বলিলেন এ জীবন প্রত্যাদিষ্ট নয়, এ ব্যক্তি ঈশ্বর-দর্শন করে নাই তাঁহারাও মিথ্যা কথা বলিলেন। এ ব্যক্তি অযোগ্যতা সত্ত্বেও এক বার নয়, দুই বার নয়, শত সহস্র বার স্বর্গের সুধাভিষিক্ত বাণী শ্রবণ করিয়া জীবন পবিত্র ও সুখী করে, শত সহস্রবার দর্শন লাভ করিয়া জীবন পবিত্র ও দর্শন-প্রয়াসী হয়। আহার পরিধান প্রভৃতি ব্যাপার যেমন সহজ, এই ঈশ্বর-দর্শন ও শ্রবণ তেমনি সহজ। ইহাতে যদি কেহ বলেন এ ব্যক্তি অপর সকল লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেছে, তাঁহারাও মিথ্যাবাদী।

"যাঁহারা আমার দর্শন শ্রবণ অস্বীকার করিলেন, তাঁহারা যেমন মিথ্যাবাদী, আর এই দর্শন শ্রবণের জন্য যাঁহারা আমাকে সমাদর বলিলেন, তাঁহারাও তেমনি মিথ্যাবাদী। ঈশ্বর-দর্শন অসাধারণ পুরুষের পাণ্ডিত্য নয়, ঈশ্বরের কথা শ্রবণ অসামান্য নয়। যেমন বাহিরে জড় বস্তু সকল দেখা, ঈশ্বরকে দেখা তেমনি। তিনি যেমন ভাবান তেমনি ভাবি, যেমন বলান তেমনি বলি, যেমন প্রচার করিতে বলেন, তেমনি প্রচার করি, তাঁহার সঙ্গে অতি সহজ যোগ। আর যদি কোন গূঢ় দর্শন থাকে তাহা হয় নাই"।

'যাহারা জানেন, এ ব্যক্তি ঈশ্বর কর্তৃক কোন কোন পদে আদিষ্ট হইয়াছে, ঈশ্বর স্বয়ং ইহার মনকে সত্য প্রকাশ করিতেছেন, তিনি স্বয়ং ইহাকে চালাইতেছেন তাঁহারাই সত্য জানেন ও সত্য বলেন।

"তাঁহারা মিথ্যাবাদী, যাঁহারা এই বলিয়া অপবাদ করিলেন যে, এ ব্যক্তি বুদ্ধি সহকারে ধর্ম্ম সকলকে মিলিত করিতেছে, এ ব্যক্তি অনেক অধ্যবসায় সহকারে হিমালয়কে স্থানান্তরিত করিতে পারে।

"এ ব্যক্তি আপনাকে চালাইবার জন্য কোন চাকরী করিল না, কোন ব্যবসায় লইল না, বরাবর ঈশ্বর স্বয়ং চালাইতেছেন। ইহা যাঁহারা অলৌকিক পুরুষের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা মিথ্যাবাদী। যেমনি আমি আমার জীবনকে ঈশ্বরের হাতে দিয়াছি, তেমনি লক্ষ লক্ষ জন ঈশ্বরবিশ্বাসী ঈশ্বরের হাতে জীবন ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহা অলৌকিক নয়।

"যে ব্যক্তি আমাকে ধনী ও জ্ঞানী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। যাহারা গূঢ়তত্ত্ব জানেন, তাঁহারা অবগত আছেন, কল্য প্রাতঃকালে নিশ্চয় অন্ন আসিবে এমন উপায় নাই কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর

"যাহারা আমাকে দরিদ্রদিগের মধ্যে পরিগণিত করিতে চান, তাঁহারাও ন্যায় পরিত্তিত হন। ধন না থাকিলেও যদি কাহাকেও ধনী বলিয়া না করিতে পার, তবে সে ব্যক্তি আমি। এখনকার সামান্য একজন ান যাহা জানেন, আমি সত্য সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, তাহা জানি না। ন্ন জ্ঞানে আমার ঔদাসিন্য নাই। একজন জ্ঞানী আমার বাড়ীতে থাকেন, মার দৃষ্টি তাঁহারই উপর থাকে। সেই শাস্ত্রীর কথা শুনিয়া আমি বিদ্যা ক যত অভাব মোচন করি। লজ্জানিবারণ যদি আমার লজ্জা নিবারণ রন, তবেই হয়। যেগুলি থাকিলে উপদেশ দেওয়া যায়, হরি তাহার ক্ষা করেন। আমার যা কিছু মান হইয়াছে হরির জন্য, আমার মান রর মান। ব্রহ্ম আমার ধন, ব্রহ্মই আমার বিদ্যা ও জ্ঞান, ব্রহ্মই আমার ন ও প্রতিপত্তি। নিজের দ্বারা কিছু হয় নাই, হরির চরণ ব্যতীত আর নাই, হরির চরণ ব্যতীত আর কোথাও জ্ঞান ও শান্তি পাওয়া যায় ; হরিচরণই সর্ব্বস্ব। এই জীবনবেদের ইহাই মূল তাৎপর্য্য।"

ব্রহ্মানন্দ এই যে আপন আধ্যাত্ম জীবন আখ্যাকে "জীবনবেদ" বলিয়া ভিহিত করিলেন ইহাতেই প্রমাণ তিনি আপন জীবনকে কি চক্ষে নিজে খিলেন এবং আমাদেরও ইহাকে সেই চক্ষেই দেখা উচিত। তিনি র্থনায় এই জীবনবেদ সম্বন্ধে বলিলেন:—"মা আমার জীবনপুস্তক মিই লিখিয়াছ। এই বহুমূল্য পুস্তকখানি মানুষ যদি আপন বুদ্ধিতে ঝিতে চায়, অবশ্য ঘটে, তুমি লিখিয়াছ, তুমিই বুঝাইতে পার। হার ভাবগুলি হাজার হাজার লোক পাঠ করিবে, জ্ঞান পাইবে এবং সই জ্ঞানে শান্তি পাইবে।"

বাস্তবিক ইহা যে মানবজীবনের আদর্শ বেদ সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ ... যে অর্থে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়াছে আমরা সে

অর্থে না প্রয়োগ করিলেও সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারা যায় ব্রহ্মানন্দ নিঃসন্দেহ বর্ত্তমান যুগের অখণ্ড মানবাবতার।

তাঁহার এই জীবনবেদের প্রত্যেক অধ্যায় স্বয়ং ভগবানেরই স্বহস্ত রচিত। তিনি কোন পুস্তক বা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বা কোন গুরুর নিকট শিষ্যত্ব লইয়া তাঁর উপদেশ শুনিয়া অথবা এমন কি সাধন ভজন দ্বারাও যে ধর্ম্মজীবনে এত উন্নত বা সিদ্ধ হইয়াছেন তাহা নহে। তাঁর যাহা কিছু সকলই প্রত্যক্ষ ঈশ্বর প্রদত্ত। তিনি যখন যাহা সাধন করিয়াছেন তাহাও তাঁর জীবন্ত গুরু স্বয়ং ঈশ্বর যেন হাতে ধরিয়া করাইয়াছেন, তিনি কোন মানুষ গুরুর দ্বারাই উপদিষ্ট নন। তিনি সত্যই স্বয়ং-সিদ্ধ বা কৃপা-সিদ্ধ মহামানব। জগতে মানবদের আদর্শ দেখাইবার জন্যই তিনি স্বয়ং ঈশ্বর-প্রেরিত। যদিও আমরা মানবাত্মার জন্ম-জন্মান্তর-বাদে বিশ্বাস করি না, কিন্তু সেই একই মানব বা ব্রহ্মসন্তান যেন যুগে যুগে নব নববিধান লইয়া অবতীর্ণ হন। যাত্রার অধিকারী নিজে লুকাইয়া থাকিয়া যেমন একজনকেই একবার রাজা সাজাইয়া, অন্যবার অন্য কোন সাজ দিয়া অভিনয় করান, ভক্তাত্মা বা যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের প্রকাশও যেন ঠিক সেইরূপ। বাইবেলে যেমন বলে মুসা ও ইলাইজা পুনরাবতরণ করিয়া যেমন ঈশা হইয়া আসিয়াছিলেন, সেইরূপ মুসা, সক্রেটিস, বুদ্ধ, গৌর, মোহম্মদ, ব্রহ্মপুত্র যিশুখৃষ্ট সবে একাকারে মিলিয়া বিশেষতঃ পুণ্য ও প্রেমাবতার ঈশা গৌরাঙ্গ মিলিয়া যেন ব্রহ্মানন্দরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। নববিধানে ব্রহ্মানন্দ যে পূর্ণ মানব-অবতার 'জীবনবেদই" তাহার প্রমাণ।

আত্মনিবেদন, ব্রহ্মানন্দ-অনুগমন, উপসংহার।

আজ ৩০ বৎসরের অধিক কাল এ অধম ব্রহ্মানন্দের অনুগমনে প্রবৃত্ত। তাঁর তিরোধানের দিন তিনি যে এই পাপবক্ষে তাঁর চরণযুগল রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন সেই হইতে বিশেষভাবে সেই চরণ দুটীই বক্ষে ধরিয়া পড়িয়া আছি। কত ঝড় কত ঝঞ্ঝাবাত মণ্ডলী মধ্যে উঠিয়া অখণ্ড মণ্ডলীকে খণ্ড বিখণ্ড করিতেছে, কত বিপদ পরীক্ষা নির্য্যাতন পীড়নই এ অধমের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু ধন্য মার কৃপা, ধন্য ব্রহ্মানন্দের অনুগ্রহ, ধন্য পবিত্রাত্মার প্রভাব এ পর্য্যন্ত এ অধম সেবককে কোনও এক পক্ষের বিরোধী করিয়া আর এক পক্ষে টানিয়া লইয়া গিয়া ব্রহ্মানন্দের পদপ্রান্ত হইতে আমাকে সরাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। সকল মণ্ডলীস্থ ভাই ভগ্নীকে, বিশেষভাবে সকল প্রেরিত মহাত্মাদিগকে ব্রহ্মানন্দেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জানিয়া সকলেরই পদানত হইয়া পড়িয়া আছি। "ব্রহ্মানন্দাশ্রম প্রতিষ্ঠা অবধি ব্রহ্মানন্দ আরও আমার জীবনের অন্নপান হইয়া পড়িয়াছেন, এবং আমার যাহা কিছু ভাল সকলই যে তাঁহারই আমি স্পষ্টরূপেই উপলব্ধি করিতেছি। তাই ভক্ত "হাসেন হোসেনের" জন্য কাতর মুসলমানদিগের ন্যায় কেবল "হা কেশব হো কেশব" করিয়াই বেড়াইতেছি। তথাপি আমি নির্ভয়ে বলিতেছি কেশবাতঙ্কও আমাকে কিছুতেই আলোড়িত করিতে পারে নাই।

আমি যতই তাঁর অনুগমন করিতেছি, যত তাঁর ভাবের ভিতর ঢুকিতেছি, ততই দেখিতেছি তিনি অসাধারণ মানুষ। তিনি দেব মানব, অথণ্ড মানবাত্মা। তিনি অবশ্যই ঈশ্বর নন। যিনি তাঁহাকে যথার্থ চিনিবেন তিনি কখনই তাঁহাকে ঈশ্বর করিতে পারিবেন না। অবার তিনি যে সাধারণ মানুষ তাহাও

নন, মানবের আদর্শ মানুষ, তিনি মানব প্রকৃতের মূর্তিমান মানুষ। তাঁর আত্মাতে ব্রহ্ম, দেহে মানব, চরিত্রে নববিধান। পিতা-পুত্র-পবিত্রাত্মা সচ্চিদা-নন্দের সন্তান, তিন ভাবে পূর্ণ।

ব্রহ্মানন্দ যেমন ঈশ্বর সম্বন্ধে বলিলেন, "সাক্ষাৎ ঈশ্বর তাঁকে বলি যিনি মানুষের মত অথচ মানুষ নন," ব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধেও আমরা বলি তিনিও "ঈশ্বরের মত অথচ ঈশ্বর নন।" তিনি হরি নন, হরিকে মানব-জীবনে প্রদর্শন করিতেই তাঁর জীবন। সম্পূর্ণরূপে আপন আমিত্ব আমিত্ব উড়াইয়া দিয়া আস্তিক ব্রহ্মপ্রাণেই তাঁর বিহার। সুতরাং তাঁহাকে সেইভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে।

ব্রহ্মানন্দ মানবের ঈশ্বরত্ব প্রতিবাদ করিবার জন্যই অবতীর্ণ। সুতরাং তাঁহাকে ঈশ্বরের সিংহাসন যিনি দিবেন, তিনি ঘোর অপরাধে অপরাধী হইবেন। কিন্তু তাহা না হইলেও ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষদিগকে ঈশ্বর বোধে তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যগণ যে সম্মান দেন এবং যে ভাবে অনুসরণ করেন পরিবাররূপে মানব জানিয়াও সেই সম্মান তাঁকে দিতে এবং ঠিক সেই ভাবে তাঁর অনুসরণ করিতে হইবে। কেবল গুরুদিগকে ঈশ্বর বোধে দূরে রাখিয়া যেমন তাঁহাদের চরিত্রোক্ত আকাঙ্ক্ষা মানবের দুঃসাধ্য ইহা মনে করিয়া কেবল মুখেই তাঁহাদিগকে প্রভু প্রভু বলিলেই যথেষ্ট হইল লোকে মনে করে, তাহা করিলে চলিবে না।

তিনি মাতৃক্রোড়ে আর সকল মানব সন্তান লইয়া এক অখণ্ড সন্তানরূপে সদা বর্তমান। যখনই তাঁর মার পূজা করি তখনই তাঁর প্রভাব অনুভব করি। আবার যে ভাই ভগ্নীর দিকে তাকাই

আমিত্ব ডুবাইয়া দিয়াছেন। তিনি সকল মানবকে তাঁর অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাই তাঁকে ছাড়া আর কোনও মানবকে দেখিতে পাই না। আবার সকল মানবের সঙ্গে আমাকেও তাঁর অঙ্গীভূত করিয়াছেন, কাজেই সকলের হাওয়া আমাতে লাগে। আমার অপরাধে তাঁহাতে আঘাত লাগে দেখিয়া আমি মহা কষ্ট অনুভব করি। তিনিও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না।

এই ব্রহ্মানন্দের অনুগমনে আমার ও আমি বলা ক্রমে ঘুরিয়া যাইতেছে। যেমন আমার আমিত্বও কিছু কিছু ক্ষয় হইতেছে তেমনি ব্রহ্মানন্দ আর সর্ব্বজন সঙ্গে আমিও এই অখণ্ড মানবত্বে আত্মবিসর্জ্জিত হইয়া যাইতেছি, তাই আমি আর আপনাকে স্বতন্ত্র একজন মনে করিতে পারি না। আমি ও সর্ব্বমানব একাকারে "আমরা" হইয়া আছি ইহা অনুভব করিতেছি। আমি কখনই আপনাকে একা মনে করিতে পারি না।

ধন্য মার কৃপা। ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মানন্দ-জীবনের যে কয়জন সাক্ষীর প্রমাণ দিয়াছি, তাহার প্রত্যেক সাক্ষীরই সাক্ষ্য এ অধম জীবনে সায় পাইয়াছে। মহর্ষিদেব যে "ব্রহ্মানন্দ" নাম প্রদান করেন সেই নামই ব্রহ্মানন্দের আধ্যাত্ম নাম এবং তদ্দ্বারাই তিনি ভবিষ্যতে সমগ্র জগতে চির আখ্যাত হইবেন বিশ্বাস করি। যিশু যেমন খ্রীষ্ট বা পরিত্রাতা নামে, নিমাই যেমন শ্রীচৈতন্য নামে পরিচিত, কেশবচন্দ্রও তেমনি "ব্রহ্মানন্দ" নামে পরিচিত হইয়া জগতে ব্রহ্মানন্দ বিলাইবেন। পরমহংসদেব যে বলিলেন কেশবের কাছে আসিলেই তাঁর চৌদ্দ পোয়া মন গলে যান। বাস্তবিকই এ জীবনেরও জড়ভাব ব্রহ্মানন্দের সমীপ-গমনে গলে যায় দেখিতেছি। মা সারদা যে বলিলেন "কেশবের মার ন্যায় সকল দুঃখ শোক সহিতেছি।" এ জীবনের বিপদ পরীক্ষাতেও

তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। জানিয়াছি ব্রহ্মানন্দের মা, সত্যই বড় ভাল মা, তাঁকে ডাকিলে সব ভাল হয়, সকল দুঃখ শোক দূর হয়, সকল শত্রুর নির্যাতন পীড়ন তিরস্কার আদিতেও আত্মার কল্যাণই হয়, অনিষ্ট অংশ নষ্ট হয়, এমন কি মনের পাপ অপরাধেও দেখাইয়া দেয় আমার বন্ধু কর্তৃক জন্মাইয়াছে। তাই "ব্রহ্মানন্দ-জননী" নামেই তাঁকে ডাকিয়া কৃতার্থ হইতেছি। তাই কুঞ্জবিহারীর নিকটেই ব্রহ্মানন্দ যে আপনজন ভাই জানিয়া, ইহাই যে ব্রহ্মানন্দের যথার্থ জীবনের পরিচয় বিধানলোকে বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি এবং সতী অনাথিনী দেবীর ন্যায় ব্রহ্মানন্দানুগমনে যে জীবনের পরিবর্তন ঘটে তাহা বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি। প্রেরিত মহাশয়দিগের বিবাদ বিচ্ছেদও যে কেবল মানবীয় দোষ দুর্বলতা জনিত, ইহাতে ব্রহ্মানন্দের আসন গৌরব খর্ব্ব হইবার নহে ইহা অনুভব করিয়াছি। এবং যদিও তাঁহাদের যাঁহারা মুখাপেক্ষী হইবেন বা তাঁহাদের শিষ্য হইবেন তাঁহাদেরই কিছু আপাততঃ অনিষ্ট হইতে পারে সত্য, কিন্তু ইহা দ্বারায় নববিধানের কোন ক্ষতি হইবে না। কালের প্রবাহে যেমন বালি এই মণ্ডলীতে যাঁহারা বিচার বুদ্ধির বশে জড়বাদ বা জ্ঞানবাদ আনিতে চেষ্টা করিবেন তাঁহাদের কিছুতেই জয় হইবে না। পূর্ণ বিশ্বাসেরই পরিণামে জয় হইবে।

আমি এইখানেই স্বীকার করি, আমি ইতিপূর্ব্বে আত্মবিস্মৃতি বশতঃ হয় তো মনে করিতাম আমিও একজন, হয় তো কতকটা সাধু হইয়াছি ভাবিয়া অহংকারও করিতাম এবং [illegible]

নই ক্রমে বিলক্ষণ বুঝিতেছি। কোন বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেন "এত যে কেশব কেশব কচ্ছ, তা করে তোমার কি হচ্ছে?" তদুত্তরে মা আমায় বলেন "আমি কেশব কেশব করে সাধু ছিলাম পাপী হচ্ছি," অর্থাৎ ধর্ম্মাভিমান হইতে রক্ষা পাইয়া পাপ বোধ ক্রমে উজ্জ্বল হইতেছে, এবং পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য লজ্জা ও অনুতাপ অনুভব হইতেছে। বাস্তবিক এই পাপবোধই ধর্ম্ম প্রবেশের সোপান, এই পাপবোধ উজ্জ্বল হইলেই প্রাণে ছটফটানি আসে, পবিত্রাত্মার আকাঙ্ক্ষায় প্রাণ সরল প্রার্থনাশীল হয়। তাহার দ্বারায় অনুতাপের জলে চক্ষু পরিষ্কার হয় ও মাতৃরূপ দর্শনলাভের উপায় হয়।

মা নিজেই দেখা দিয়া বলিয়াছেন তিনিই আমায় এই ব্রহ্মানন্দ অঙ্গে বাঁধিয়াছেন, নববিধানের আশ্রয়ে আনিয়াছেন এবং আমার ও আমার পরিবার ও সমগ্র মানবমণ্ডলীর পরিত্রাণের মুক্তির সকল ভার তিনি নিজ হাতে লইয়াছেন। এখন কেবল ষোল আনা সরল বিশ্বাসের সহিত তাঁর উপর নির্ভরশীল হইলেই তিনি স্বয়ং ব্রহ্মানন্দ-জননীরূপে আত্মপ্রকাশ করিবেন ও তাঁর পবিত্রাত্মার দ্বারায় পরিচালিত করিয়া তাঁর ভক্ত আত্মা সনে মিলাইয়া তাঁর কোলে নিত্য রক্ষা করিবেন।

আমার মানবীয় পাপ অপরাধ সংসারের অশান্তি অকল্যাণ একেবারে তিরোহিত হইলে তবে যে ব্রহ্মদর্শন লাভ হইবে তাহাও নহে। রোগী যেমন কখনও সুস্থ হয়, কখনও অসুস্থ হয়, আবার চিকিৎসক আসিয়া ঔষধ দেন এবং ক্রমে ভাল করেন। সেইরূপে আমার পাপ রোগ নিবারণ করিয়া মা আমায় তাঁর করিতেছেন। রোগ যন্ত্রণাও যেমন শরীরেরই [illegible] তেমনি পাপ অপরাধ দোষ

দুষ্টভাবও মানবীয় অপূর্ণতার স্বাভাবিক লক্ষণ এবং ইহা দ্বারাই আমার মন ছটফট করিয়া ব্রহ্মানন্দ লাভাকাঙ্ক্ষী হইবে ইহাই বিধাতার বিধান। সুতরাং এই সকল স্বত্বেও তাঁরই কৃপার ভিখারী হইলে তাঁরই উপযুক্ত সময়ে তাঁর যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন এই বলিয়া পড়িয়া আছি।

মার জ্ঞায় ব্রহ্মানন্দের ও পবিত্রাত্মার ও ব্যক্তিত্ব প্রভাব আমি সর্ব্বদা অনুভব করি, এবং তাঁর মাকেই আমরা সকলে মা বলিয়া পরস্পর এক অঙ্গ হইব বিশ্বাস করি। তিনি যে মাকে মা বলিয়াছেন তাঁকে মা বলিলেই আমরা এক মার হইতে পারি এবং তাহা হইলেই এক ধর্ম্মলাভ করিতে পারি। এই একতা ভিন্ন কি জাতীয় উন্নতি কি সামাজিক উন্নতি কি ধর্ম্মোন্নতি কিছুই হইতে পারে না; সমগ্র মানবকে এক করিবার জন্যই মা স্বয়ং ব্রহ্মানন্দ-জননী এই নাম লইয়াছেন, এই জন্যই এক অখণ্ড মানবাবতার জগজ্জন ভাই ব্রহ্মানন্দ বর্ত্তমান যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং এই জন্যই এই মহাসম্মিলনের নববিধান ভগবান জীবের পরিত্রাণের জন্য জগতে প্রেরণ করিয়াছেন।

এক্ষণে এই মাকে গ্রহণ ও বিশ্বাস ভিন্ন এবং এই এক ব্রহ্মানন্দ ভাই-য়ের অঙ্গে অঙ্গীভূত হওয়া ভিন্ন ও এই নববিধানের আশ্রয় অবলম্বন ভিন্ন বর্ত্তমান যুগের মানবগণের পরিত্রাণের আর অন্য পথ নাই। যে বৎসর যে পঞ্জিকা চলে সেই বৎসর ফুরাইলে আর তাহাতে কাজ চলে না। সেইরূপ যে যুগে যে বিধান প্রকাশিত হইয়াছে সেই যুগে তাহাই অবলম্বনীয়। সুতরাং যখন নূতন বিধান আসিয়াছে। আর পুরাতন বিধান চলিতেই পারে না। যে যে ধর্ম্মই গ্রহণ করুন না, যে যে অবস্থাতেই থাকুন না ক্রমবিকাশ প্রণালীর দ্বারা সকলকেই যথা সময়ে বিধাতার এই

কেন না নববিধান বর্ত্তমান যুগের নব আবিষ্কৃত ধর্ম্মবিজ্ঞান। বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের মিলনরূপ এই নববিজ্ঞান অবলম্বন বিনা পূর্ণ ধর্ম্মজীবন হইতেই পারে না। এই বিজ্ঞানের মূল প্রত্যক্ষ ঈশ্বর দর্শন ও ঈশ্বরবাণী শ্রবণ। ব্রহ্ম যে মাতৃরূপে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতিজনের নিকট প্রকাশিত হইয়া এবং প্রত্যক্ষ গুরু হইয়া সর্ব্ব কর্ম্মে সকলকে পরামর্শ দেন ও পরিচালন করেন ইহা বিশ্বাস করিয়া কার্য্যতঃ তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁর বাণী শুনিয়া চলিতে হইবে। এই জন্যই ব্রহ্মানন্দ বলিলেন "সংকর্ম্মাদি করিবার লোক অনেক আছেন। কিন্তু ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মবাণী শ্রবণ যে প্রত্যক্ষ হয় তাহা জীবনে প্রমাণ করাই নববিধানের লোকদিগের বিশেষ কার্য্য।" এ দর্শন শ্রবণ ও কল্পনা নয়, কিন্তু বিজ্ঞান সঙ্গত।

এ বিধানে আবার কেবল একা ব্রহ্মকে লইলেও হইবে না। ব্রহ্মপুত্র বা মানব সন্তানও সামান্য নহে। নিরাকার ঈশ্বর তাঁর সাকার প্রতিকৃতি এই মানবকে নিজ আত্মজ করিয়া তাঁরই সাক্ষীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই মানব সমাজে তিনি ত মানবের ভিতর দিয়াই লীলা বিহার করেন। মানুষ তাঁর হাতের যন্ত্র, তাঁর বাণীর প্রণালী; তাড়িতবার্ত্তা বহনের তার যেমন, নিরাকার ব্রহ্মশক্তি সঞ্চালনের প্রণালী তেমনি মানুষ; মানুষকে ছাড়িয়া ব্রহ্ম যেন, অন্ততঃ এই মানব সমাজে, কোন কাজই করিতে পারেন না। সুতরাং তিনি যখন মানুষকে উপেক্ষা করেন না, তখন আমাদেরও মানুষকে উপেক্ষা করিলে চলিবে কেন? বিশেষতঃ ভক্ত মহাপুরুষগণত প্রত্যক্ষ ভাবে নিরাকারের সাকার প্রতিরূপবিশেষ। অতএব সেইভাবে ভক্তগণকে এমন কি মানব মাত্রকেই গ্রহণ করিতে হইবে। নববিধানে তাই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মপুত্র বা সর্ব্বমানব অভেদ্যরূপে

আবার কেবল ব্রহ্ম ও তাঁর মানবসন্তানকে লইলেও পূর্ণ হইল না, যদি ব্রহ্মের লীলা না মানি। এই ব্রহ্ম লীলাই তাঁর পবিত্রাত্মা বা ধর্ম্মবিধান। ব্রহ্মের সহিত মানবের মিলন বা যোগ সমাধান, এই ব্রহ্মের লীলা বা ধর্ম্ম বিধান দ্বারাই হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য ধর্ম্মবিজ্ঞান ইঁহাকেই পবিত্রাত্মা নামে অভিহিত করেন। হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রে ইনি ধর্ম্ম বা লীলা নামেই পরিচিত। ইহা ব্রহ্মের স্বরূপ বা গুণ এবং মানবের ধর্ম্ম বা উক্ত ধর্ম্ম চরিত্র বলিলেও সাধারণতঃ বুঝা যাইতে পারে। যাহাহউক এই পবিত্রাত্মাই নিত্য জীবস্বরূপে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মসন্তানে মিলন সম্পাদনের ব্যবস্থা করেন। যুগে যুগে নব নব ধর্ম্মভাব এই বিধানাকারে প্রকাশিত হইয়া মানবমণ্ডলীর পরিত্রাণের বিধি ব্যবস্থাদি করিতেছেন।

বর্ত্তমান যুগে এই মহামিলনরূপ প্রেমের বিধান নূতন বিধান সেই পবিত্রাত্মারই আত্মস্বরূপ। পূর্ণ "বিশ্বাস, প্রেম, পবিত্রতা" জীবন চরিত্রে অঙ্কিত করিয়া জগতে তাহাই বিলাইতে ইনি আসিয়াছেন। মহাপ্রেম ইঁহার মধ্যবিন্দু, তাহা দ্বারাই ইনি ব্রহ্ম ও ব্রহ্মসন্তানের, স্বর্গ এবং পৃথিবীর এবং মানব এবং মানবের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের এক পূর্ণ ধর্ম্ম নীতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ধর্ম্মই ইঁহার প্রাণ, তাই সকল ধর্ম্ম সকল নীতি, সকল জ্ঞান ও বিজ্ঞান, সর্ব্ব সাধন, যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানের পূর্ণভাব সমন্বয় সমাধান করিতে ইনি অবতীর্ণ এবং সংসার ও ধর্ম্মে যে চির বিবাদ ছিল তাহা নিবারণ করিয়া সংসারেই স্বর্গ বা ব্রহ্মানন্দময় সুখী পরিবার স্থাপন করিতে আসিয়াছেন। সর্ব্বময় ব্রহ্ম, মানবে ব্রহ্মসন্তান ব্রহ্মানন্দ, এবং সর্ব্ব ঘটনায় ব্রহ্মলীলা বা মার মঙ্গল বিধান দর্শন ইহাই এই নববিধানের

এক এক মানবজীবন অধিকার করিয়াই ভগবান তাঁর বিধান যুগে যুগে প্রতিফলিত করিয়া দিয়াছেন। মানব ছাড়া যেমন ব্রহ্ম থাকেন না আবার বিধানও মানব চরিত্রে প্রতিফলিত না হইলে তাহা কেবল কল্পনা বা ভাব মাত্র। তাই বর্তমান যুগে ব্রহ্মানন্দ-জীবনকেই এই নব বিধানের পূর্ণ প্রতিকৃতিরূপে ভগবান প্রেরণ করিয়াছেন।

এক্ষণে এই নববিধান গ্রহণ মানে কেবল নববিধানের মত গ্রহণ নহে। নববিধান মূর্তিমান যিনি তাঁহাকে গ্রহণই যথার্থ নববিধান গ্রহণ। এই ব্রহ্মানন্দকে গ্রহণ অর্থাৎ তাঁর পদচিহ্ন ধারণে সেই চরিত্র লাভের আকাঙ্ক্ষা, সেই অঙ্গে একাঙ্গ হইয়া সকলের সহিত একাঙ্গ হওয়া, ইহা ভিন্ন নববিধান গ্রহণ হয় না এবং ইহা ভিন্ন ব্রহ্মানন্দেরও সম্মাননা আর কিছুই নহে। কেবল মুখে কেশব কেশব বলিলেই হইবে না, যিনি তাঁহার অনুগমন না করিয়া এরূপ বলিবেন, তিনি অপরাধী হইবেন। যিনি কেশবকে তাঁর মার ভিতর দিয়াও না দেখিবেন, তিনি তাঁহাকে কখনই যথার্থ চিনিতে পারিবেন না বা চিনিতে না পারিয়া তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নবধর্মাপরাধে অপরাধী হইবেন। আবার যিনি কেশব কেশব না করিবেন তিনিও নিশ্চয় যুগধর্মলাভে বঞ্চিত হইবেন, বর্তমান বিধানের মূর্তিমানরূপকে উপেক্ষা করিয়া ঘোর অপরাধী হইবেন।

কোন সিংহকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতে গেলে কে না তাহার গ্রাসে পড়িয়া মারা যায়, কিন্তু গ্যাসের পিঞ্জর মধ্যে সিংহকে দেখিলে যেমন তাহাকে দেখাও যায়, তাহাকে বাহির হইতে যেন স্পর্শও করা যায়, অথচ সে কাহাকেও গ্রাস করিতে পারে না, সেইরূপ ভক্তগণকে ——— আর লইতে গিয়া লোকে আপনাদের দুর্বলতা বশতঃ

তাঁহাদেরই অনুবর্ত্তী হইয়া পড়ে, কিন্তু ব্রহ্মের ভিতর দিয়া যদি তাঁহাদিগকে দেখা যায় তাহা হইলে আর তাঁহাদের গ্রাসে পড়িয়া কাহাকে মরিতে হয় না। ব্রহ্মানন্দ তাই আপনাকে যার ভিতরই ডুবাইয়া রাখিয়াছেন এবং এমন কি মহাপুরুষদিগেরও মধ্যে একশ্রেণীভুক্ত বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিলেন না। ফুলের মালা গাঁথিতে হইলে সূত্র যেমন আপনি লুকাইয়া থাকিয়া ফুলগুলিকে বাহিরে প্রদর্শন করেন, ব্রহ্মানন্দ তেমনি ভক্তদিগের ভিতরে আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়া ভক্তরত্নহার গাঁথিয়া জগতকে প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে তিনি তাঁর নিজ আমিত্ব বা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব প্রদর্শন কুত্রাপি করিতে চান নাই, কিন্তু ব্রহ্মের ভিতর থাকিয়া ভক্তগণকে লইয়া সকল মানবের চরিত্রের ভিতর চরিত্র হইয়া থাকিতে পারিবেন এই তাঁর জীবনের বিশেষ কার্য্য এবং ইহাই নববিধানে ভক্তজীবন গ্রহণের নূতন বিধান। স্পিরিটে ডুবান কোন ফল যেমন চিরদিনই তাজা থাকে, তেমনি ব্রহ্মে মগ্ন থাকিয়াই ব্রহ্মানন্দ নববিধানের চির নবজীবনরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন।

যদিও ঈশ্বর যেমন পূর্ণ তেমনি পূর্ণ হইতে চেষ্টা করাই মানব জীবনের বিশেষত্ব, কিন্তু মানুষ কদাপি ঈশ্বর হইতে পারেন না। এই জন্যই ভক্তগণ ব্রহ্মপুত্র হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন ও মানব জীবনে দেবত্বের আদর্শ দেখাইলেন। তাহাও কিন্তু যেন পাপী মানবের আয়ত্তাতীত হইল, তাই ব্রহ্মানন্দ পাপী মানুষের মধ্যেই একজন হইয়া ব্রহ্ম ও ব্রহ্মপুত্রকে লইয়া মানব চরিত্রে প্রবেশ করিতে আসিয়াছেন। যেমন হাতী ধরিতে হইলে পোষা হাতীর দ্বারাই তাহাকে ধরিতে হয়, সেইরূপ পাপী মানবকে ধরিবার জন্য এই অদ্ভুত ব্রহ্মানন্দ জীবন, ব্রহ্মের এক

প্রভু বলিয়া আপনাকে স্বীকার করিলেন না, আবার সাধারণ মানুষও ন, কিন্তু সত্যই ব্রহ্ম ব্রহ্মপুত্র ও মানব এই সকলের মিলনে এক অদ্ভুত নব শক্তি। এই জন্যই তিনি আপনাকে "শ্রীঅদ্ভুত" নামকরণ করিলেন ও লিলেন, "যিনি ইঁহার পিতা মাতা কর্ত্তৃক প্রশংসিত, স্বর্গ কর্ত্তৃক আদৃত, সেই আত্মাই আমি।"

কালো কয়লাতে আগুনের আঁচ ধরাইতে হইলে যেমন কোন প্রকার শীঘ্রদহনশীল পদার্থে প্রথমে অগ্নি ধরাইয়া তাহারই সংযোগে সেই কয়লাকে অগ্নিময় করিতে হয়, সেইরূপ আমিত্ববিহীন ব্রহ্মানন্দজীবন শীঘ্রই ব্রহ্মাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া "আমি নাই" হইয়া গিয়াছেন বলিয়াই, সেই জীবনের সংস্পর্শে পাপ মানব জীবনকে অগ্নিময় করিতে ভগবান তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ যথার্থই বর্ত্তমান যুগে পাপ মলীন কয়লাময় মানবজীবনকে ব্রহ্মাগ্নিময় করিতেই প্রেরিত।

ব্রহ্মানন্দ একটী সহজ কথায় আত্মপরিচয় দিয়া বলিয়াছিলেন "আমি একটা কালো ছেলে সুন্দর হয়েছি। একটা কালো ছেলে মার কাছে দৌড়ে যাচ্ছি।" ব্রহ্মানন্দ একবার আমাকেই বলেন "আমি তোমারই মত কাহিল ছিলাম," তার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, "তবে তো আমারও আশা আছে," তিনি বলিলেন, "আশা আছে বই কি।" তখন আমার দেহের কাহিল অবস্থার কথাই মনে করিয়া এ কথা বলিয়াছিলাম, কিন্তু এখন বুঝিতেছি ব্রহ্মকৃপায় এবং ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে আমার আত্মারও কাহিলভাব দূর হইয়া দিব্য কান্তি লাভ হইবে তিনি আশা দিয়াছেন। আমি তাই আপনাকে মহাকালো মহাকাহিল জানিয়া অনন্ত মার পানে দৌড়িয়া যাইতে অক্ষম বুঝিয়াই এই ছেলেটীরই পেছু লইয়াছি, আরও কে কোথায় আমার মত কালো

আছে এস সকলে মিলে এ দৌড়ে যোগ দি: এস সরল প্রার্থনা, অনুতাপ, আত্ম-দৃষ্টি দ্বারায় আপনাদিগকে পাপী জানিয়া , যার কাছে পরিত্রাণার্থী বা অনন্ত উন্নতিশীল নবজীবন লাভের আকাঙ্ক্ষী হইয়া যার শরণাপন্ন হই, ব্রহ্মানন্দসঙ্গ গ্রহণ করি এবং এই যুগধর্ম্ম নূতন বিধান অনুসরণ করি, আমরা সকল কালো ছেলেই ভাল হইয়া যাইব।

চরিত্র বিনা কোন কালে কেবল কথা, বক্তৃতা বা উপদেশ দ্বারায় ধর্ম্ম হয় না। বিশেষতঃ নববিধানে এই ব্রহ্মানন্দ-চরিত্রের প্রভাব বিনা কিছুই হইতে পারিবে না। একমাত্র সেই চরিত্রের প্রভাবেই নববিধান মানবজীবনে সঞ্চারিত হইবে, এই বিশ্বাসে আমরা যদি নিজ নিজ আমিত্ব, অহঙ্কৃত ব্যক্তিত্ব, ধনাভিমান জ্ঞানাভিমান ও ধর্ম্মাভিমান পরিহার করিয়া ব্রহ্মানন্দজীবন গ্রহণ করি তবেই আমাদের দ্বারায় কিছু হইবে নতুবা কিছুতেই কিছু হইবে না, কেন না ইহাই বিধাতার বিধান। তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া, নিশ্চয় কিছুই হইতে পারে না, কেন না তাঁহাকে উপেক্ষা করা আর বিধাতার অভিপ্রায় উপেক্ষা করা একই।

ব্রহ্মানন্দ যে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন "আমি বুঝেছি একটা মাঝে খুঁটী চাই। কোথা থেকে আসবে আদেশ মা! তুমি যে এক জনকে দাঁড় করিয়াছ। ছেড়ে ত দিলাম রাগ করে ত বল্লাম এরা প্রত্যক্ষ ভাবে তোমার কাছে থাক, কিন্তু পাঁচ জনে যে পাঁচ দিকে গেল, নানা মত হইল, একটা লোক চাই যে শেষ কথা সকলকে মীমাংসা করে দেবে। আমি দেখলাম যুগে যুগে তাই একটা লোককে ধরে পাঁচ জনে চলে। সকল ধর্ম্মে দেখছি এক জনকে গুরু করে। গুরু যদিও গুরুগিরি না চায় তবু শিষ্যেরা তাঁকে গুরু করে। কিন্তু মা গুরু হব কি করে।

শিয়া বলিতে পারি না হে হরি। আমি পারি না দোহাই আমি রি না। ঈশ্বর তুমি যেন বলছ দেখ্‌লি শেষটা কি হইল। আমার তুই নয় কচ্ছিস্‌, তুই যাবার আগে সব কাজ গোছাল করে দিলি ভগবান তুমি আমায় কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্চ? আমি যদি ই কার্য্যে কর্ত্তা হই, হে চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী হও আমি নিজে কচ্ছি না। আমার বাবা আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। আমার এতদিনের কৌশল মিথ্যা হইল, আমি এত দিনে এই ঘরের দুটো লোককেও এক করতে পারলাম না।

"ভারতা, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এরা যদি তোমায় ডেকে ভালো হতো পৃথিবীতে প্রমাণ হয়ে যেতো আর গুরুর দরকার নাই। হে ঈশ্বর এ বিষয়ে আমি দোষী নই, কৃপা করিয়া সকলের কাছে প্রকাশ কর। গুরুকে গুরু বলা দূরে থাকুক, এরা যে ক্রমে আমাকে পায়ের নীচে ফেলিতেছেন। ঈশ্বর যা খুসী কচ্ছেন, আরো যদি কিছু দিন থাকি আরও কত স্বেচ্ছাচার দেখিতে হইবে। (তাই) আবার গুরু হতে চলাম, কি ভাবে গুরু হব? আমার কথা এখন যার খুসি যেটা ইচ্ছা নিচ্ছেন যেটা ইচ্ছা ফেলে দিচ্ছেন। আমি যেন গরীব, বানের জলে ভেসে এসেছি। কেবল যেন দুটো কথা এঁদের শেখাতে এয়েছি, তা করিলে ত হবে না, যদি মানিতে হয় ষোল আনা মানিতে হইবে। নববিধান সম্পূর্ণ লইতে হইবে। তা এতে একজন থাকুন দেড়জন থাকুন।

"জগদীশ, এই কটী লোককে স্বেচ্ছাচার থেকে বাঁচাও। আজ এঁদের জীবনের পরিবর্ত্তনের দিন। আজ সঙ্গতের নীতি, মুঙ্গেরের ভক্তি, নববিধানের ধর্ম্ম। অদ্য গুরুলাভ, অন্য ধর্ম্মের গুরুর মত নয়। বিধানের গুরু এক শরীরের সকলে অঙ্গ এই বিশ্বাস।

"আমি সকলের কাছে ধর্ম্ম সস্তা করতে গেলাম, মা আমায় ধমক দিলেন বল্লেন, 'তুই দেড় আনা, এক আনা, যে যা দিয়াছে সকলকে এর ভিতর আন্‌লি। আমি বলেছি ষোল আনা যে দেবে সেই আসবে।' মা আজ বলছেন "যে আমার ভক্তকে ষোল আনা বিশ্বাস দেবে সেই আসুক আর কেহ নয়।" এ আগেকার গুরু আচার্য্য নয়, এ ভাই বলে পরস্পরকে খুব ভালবাসা দেওয়া, কোলাকুলি করা, বিশ্বাস দেওয়া। আমরা যেন সকলে ষোল আনা বিধি পালন করিয়া ষোল আনা বিশ্বাস তোমাকে, তোমার বিধানকে, প্রত্যাদেশকে, তোমার ভক্তকে দিয়া স্বর্গের উপযুক্ত হইতে পারে।"

ব্রহ্মানন্দের এই মহান উক্তির দ্বারায় তিনি পরিষ্কার করিয়াই বলিয়াছেন কি ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে স্বাধীন ভাবে ব্যক্তিগত ধর্ম্ম সাধনের দৃষ্টান্ত জগত বরাবরই দেখিয়া আসিতেছে। আজও ব্রাহ্মসমাজে নববিধান মণ্ডলীতেও ইহার অন্যরূপ হইতেছে না। প্রত্যেক জন নিজ নিজ স্বাধীন ভাবে সাধন, ইহা কিছু নূতন নহে, কিন্তু ইহা ব্রাহ্মসমাজেরও উদ্দেশ্য নহে। "একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ"রে ব্রাহ্মসমাজ অনেক দিন থেকেই গাইয়া আসিতেছে, কিন্তু "পরিত্রাণ" যে কি তাহা দেখাইতে পারিতেছে না। ব্রহ্মানন্দ নববিধানে তাই "এক ব্যক্তিত্ব" ঐক্যমত্য এই পরিত্রাণের পথ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। এই এক ব্যক্তিত্বই যথার্থ মানব ভ্রাতৃত্ব। নতুবা পাঁচ জন পাঁচমত লইয়া ভাই ভাই বলা ইহা প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব নহে। অন্ততঃ নববিধানের প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব "পাঁচজনে এক জন হওয়া।" "এরা আমি একজন"। "আমি আমার ভাই এক," ইহাই যথার্থ ভ্রাতৃত্ব। এই ভ্রাতৃত্ব সাধন করিতে হইবে "এক

আমরা পাঁচ জন, অর্থাৎ বিভিন্নতা বিচিত্রতা স্বত্ত্বেও একতা, ইহা করিতে হইলে এক মানুষে প্রতিজনের ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিতে হইবে এবং তাহা হইলেই নববিধান মণ্ডলীর ভ্রাতৃত্ব সাধন হইবে। পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি ব্রহ্মানন্দ কিরূপ আমিত্ব-বিহীন অখণ্ড মানব, সুতরাং তাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিলে অর্থাৎ তাঁহাতে আমাদের আমিত্ব মিশাইয়া দিলেই আমাদের পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য চলিয়া যাইবে এবং আমরাও এক অখণ্ড ব্রহ্মানন্দ বা এক ব্রাহ্মমণ্ডলী হইতে পারিব। "ব্রাহ্মসমাজ" মানে কি ঠিক না জানিয়া অনেক ইংরাজ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন (Are you Brahmo Somaj?) "তুমি কি ব্রাহ্মসমাজ'? বাস্তবিক প্রতিজন এই "ব্রাহ্মসমাজ" হওয়াই যথার্থ ব্রাহ্মসমাজের বা নববিধানের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে একা একা ধর্ম্ম সাধন কিরূপে হয় তাহা পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান বিধানে মিলন সাধনই ধর্ম্ম সাধন। যেমন খই আলাদা আলাদা থাকে, কিন্তু আগুনে গুড় গরম করিয়া তাহাতে মাখালেই সব খইগুলি মিলিয়া একটী মোয়া বাধিয়া যায়, নববিধানের তাৎপর্য্যও সেইরূপ। আমরাও প্রেমগুড়ে মাখান হইয়া আমি আমার স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করিয়া এক মানবত্ব অবলম্বনে এক হইব ইহাই বর্ত্তমান বিধান সাধন। ইহা করিতে পারিলে সকলেই একজন হইয়া সাধন করিব এবং যখনই উপাসনা করিতেছি তখন সকল মানব সঙ্গে করিতেছি, আমি একা করিতেছি না, ইহা নিত্য উপলব্ধি করিব এবং যিনিই উপাসনা করুন তিনিই আমি করিতেছি, বা আচার্য্য ব্রহ্মানন্দই করিতেছেন, ইহা অনুভব করিব। ইহাতে পৌরহিত্যও আর থাকিবে না।

তাই নববিধানে এক মণ্ডলী কিরূপে হইতে হয় তাহারই নূতন পরিত্রাণের পথ ব্রহ্মানন্দ আবিষ্কার করিলেন এবং তিনিই তার উপায়ও দেখাইলেন। পরিত্রাণের পথ যিনি দেখান তিনিই ত যথার্থ গুরু, ব্রহ্মানন্দ সেই ভাবেও আমাদের গুরু হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাকে যে আদর্শ বলিয়া কেবল তাঁর আদর্শে আমাদের জীবন গঠন করিলেই যথেষ্ট হইল ইহাও নববিধানের পূর্ণ শিক্ষা নহে। নববিধানের নূতন শিক্ষা এই আমি তিনিই হইব।

বাস্তবিক তিনি আমি ত একই মানুষ। তিনি আমার বড় আমি, আর আমি তাঁর ছোট আমি। এখন কেবল ভ্রমাত্মক পার্থক্য বোধে আমি আমাকে স্বতন্ত্র মনে করিতেছি, কিন্তু পবিত্রাত্মার প্রভাবে চৈতন্য উদয় হইলেই দেখিতে পাইব,—তিনিও যেমন দেখিলেন—তিনি আমি একজন। এই তাঁহাতে আমাতে একত্ব জ্ঞান বা বড় আমিতে ছোট আমিতে মিলনই যথার্থ ব্রহ্মানন্দ গ্রহণ।

এইরূপ তিনি যে আমাকে এবং সকল ভাই ভগ্নীকে আপন অঙ্গে লইয়া একজন হইয়া রহিয়াছেন ইহা ষোল আনা বিশ্বাস করিলে আর কি আমরা কাহাকেও ভিন্ন মনে করিতে পারি? সর্ব্ব মানবেই ব্রহ্মানন্দরূপ দেখিব, এবং তাহা হইলে অন্যের দুঃখে বা পতনে আমি আর নির্লিপ্ত থাকতে পারিব না। এক দেহের অঙ্গ যেমন একটা রুগ্ন বা ক্লিষ্ট হইলে সর্ব্বাঙ্গ যাতনা অনুভব করে, ঠিক সেই ভাব হইবে; তখনই একাকী যাইলে যে পরিত্রাণ নাই ইহা বুঝিব, আমি একা ভাল হইলেই যে বাঁচিলাম তাহা নয় ইহা উপলব্ধি করিতে পারিব। তাই নববিধানের ইহাই বিধান, ব্রহ্মানন্দের এই নির্দ্দেশই সত্য এবং ইহাই মার অভিপ্রায় বলিয়া স্থির বিশ্বাস করিয়া এই ব্রহ্মানন্দ-গ্রহণ সাধন আমরা অবলম্বন করিয়াছি এবং ইহা **সকলকেই করিতে হইবে** বিশ্বাস করিতেছি।

কিন্তু ইহা সর্ব্বদাই যেন স্মরণ থাকে যে এই ব্রহ্মানন্দ গ্রহণ কথনই ব্রহ্মকে ছাড়িয়া নহে। তিনিও বলিয়াছেন "জল ছাড়া মাছ লইওনা।" ব্রহ্মানন্দ যে ব্রহ্মসন্তান বা ব্রহ্মখণ্ড, ব্রহ্মখণ্ড ব্রহ্ম ছাড়া কথনই নহেন। এই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মানন্দ উভয়ে ব্রহ্মশক্তি বা পবিত্রাত্মা যোগে নিত্য যুক্ত। সূর্য্য এবং সূর্য্যরশ্মি "ইথার" যোগে যেমন অভেদ, তেমনি ব্রহ্ম ব্রহ্মানন্দও পবিত্রাত্মা যোগে চির অভেদ।

আমাদের দেশে ঋষিগণ সব ব্রহ্মময় দেখিয়া অদ্বৈতবাদ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; আবার ভক্ত ভগবানের দ্বৈতভাব দর্শনে দ্বৈতবাদ স্বীকৃত হইয়াছে; এবং খ্রীষ্টধর্ম্মে ত্রীত্বভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মানন্দ নব-বিধানে ত্রীত্ব-একত্ব অতি সুন্দররূপে সমাধান করিয়াছেন। ইহাতে অদ্বৈতবাদের ভ্রম, দ্বৈতবাদের অপভ্রংশভাব এবং ত্রীত্ববাদের জটীলতা সমস্ত আলোচিত এবং সুমীমাংসিত হইয়াছে।

এক্ষণে, চিকিৎসা বিজ্ঞান বলেন যদি শরীরে কোন বিষ প্রবেশ করে, শরীরের শক্তি সে বিষকে নষ্ট করিতে স্বতঃপরত চেষ্টা করিয়া থাকে। জ্বরের উত্তাপ এবং নানা প্রকার উপদ্রব এই বিষ বিনাশেরই স্বাভাবিক প্রক্রীয়া। রোগ যন্ত্রণা আপাততঃ অসহ্য বা ভয়ঙ্কর বোধ হইলেও তাহা দ্বারায় রোগীর উপকারই সাধিত হয়। তদ্দ্বারা বিষ নাশেরই সহায়তা করে, অন্ততঃ ভিতরে যে সে বিষ কিরূপে নিজ বিক্রম বিস্তার করিয়া শরীরকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং শারীরিক প্রকৃতি তাহাকে বহিস্কৃত করিবার জন্য মহা সংগ্রাম করিতেছে বুঝা যায়। এই সংগ্রামই শরীরের রোগের নিদর্শন বা লক্ষণ।

সেইরূপ পাপও আমাদের মনের রোগ। পাপ বিষ ভিতরে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ আমাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি তাহার সহিত সংগ্রাম

করিবেই। অহংরোগাদির অপচার যেমন শরীরে সয় না তেমনি পাপ মনুষ্য প্রকৃতিতে কিছুতেই সয় না। তাই স্বভাবতঃই তাহাকে বাহির করিয়া দিতে প্রকৃতি চায়। যতক্ষণ পাপ-বিষ ভিতরে থাকে ততক্ষণ তার উপদ্রবও হইবেই। রোগী যেমন রোগের তাড়নায় বিরক্ত হইবেই, আব্দার করিবেই, ঔষধ খাইতে চাবেই না, অঙ্গ চালাইতে দেবেই না, বিছানাতেই বমন বা শৌচ প্রস্রাবাদি করিবেই, সেইরূপ পাপী মানব পাপ জনিত যে কামক্রোধ দ্বেষ হিংসাদি রিপুর প্রাবল্য বা এক আধটা অপকর্ম্ম বা সাংসারিকতা নীচতার পরিচয় দিবেই তাহার আর আশ্চর্য্য কি। অতএব পাপ মানবের রোগ এবং পাপী রোগী ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া আমাদের কি ব্যক্তিগত কি সামাজিক জীবন সাধন করা কর্ত্তব্য।

আমরাও আপনাদিগকে পাপ রোগে রোগী জানিয়া যাহাতে সে রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারি তজ্জন্য আত্মনিগ্রহ এবং অনুতাপ করিব ও সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হইব এবং সমাজেও মণ্ডলীস্থ ভাই ভগ্নীদিগকে রোগী জানিয়া রোগীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ তাহাদের দোষ দুর্ব্বলতা অপরাধ ক্ষমা করিব এবং যত্ন ও প্রেম সহকারে তাঁহাদের সেবা করিব এবং চিকিৎসকের ব্যবস্থা পালনে যত্নশীল হইব ইহাই আমাদের সাধন। আমরা অনেক সময় আপনাদিগকেও পাপী বলিয়া মনে রাখি না এবং ভাই ভগ্নীদিগের সহিত বিবাদের সময়ও সে কথা ভুলিয়া যাই। তাই আপনাদের পাপ জনিত দুর্ব্বলতার জন্য অনুতপ্ত ও ম্রিয়মান হই না এবং অপরে কেন দেবতার মত হইবেন না এই ভাবিয়া তাঁদের তীব্রভাবে বিচার করি। সকলেই

ইহা মনে করিয়া ক্ষমা করি না। অতএব কি ব্যক্তিগত কি সামাজিক উন্নতি সাধনকালে সর্ব্বদাই আমাদের এই মানবীয় পাপ রোগ প্রবণতার কথা মনে রাখিতে হইবে।

এইস্থানেই বলা আবশ্যক ব্যক্তিগত উন্নতি সাধন হিন্দুধর্ম্মভাব, সামাজিক উন্নতি সাধন খ্রীষ্টধর্ম্মভাব। ব্যক্তিগত ধর্ম্মোন্নতি হইলেই হিন্দুভাব চরিতার্থ হইল, ব্যক্তিগত উন্নতি তত হউক না হউক সামাজিক উন্নতি হইলেই খ্রীষ্টভাবের চরিতার্থতা হইল। ব্রহ্মানন্দ নববিধানে দুই ভাবেরই সমাবেশ করিয়াছেন। এই বিধানে ব্যক্তিগত উন্নতি ও সামাজিক উন্নতি সমভাবে সাধন করিতে হইবে, অথবা ব্যক্তিগত জীবন না হইলেও সমাজ গঠন হইবে না এবং সামাজিক উন্নতি না হইলেও ব্যক্তিগত জীবনের পূর্ণতা সমাধান হইবে না ইহাই নববিধানের শিক্ষা। এই বিধানের লোককে সামাজিকী ব্যক্তি বা গৃহস্থ যোগী হইতে হইবে।

কিন্তু নববিধানে এই ব্যক্তিগত জীবন বা সামাজিক উন্নতি কিছুই পুরুষকার দ্বারায় হইবে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে পুরুষকার বা সাধন বলে ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি কিরূপে হয় বা চেষ্টা করিয়া বুদ্ধিযুক্তি করিয়া কিরূপে সমাজ গঠন হয় তাহার পরিচয় হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান বিধানে উভয় ব্যক্তিগত উন্নতি ও সমাজ পরিচালন কিরূপে ব্রহ্ম-কৃপায় হইতে পারে তাহাই পরীক্ষিত হইবে। ইহা যে নূতন বিধান পবিত্রাত্মার বিধান। পবিত্রাত্মা স্বয়ং কিরূপে মানবের ব্যক্তিগত জীবন উন্নত করেন, এবং তিনিই কিরূপে সমাজকে পরিচালন করেন ইহাই এখন দেখিতে হইবে।

সাধনবলে জীবনের উন্নতি কিরূপে হয় পূর্ব্ববিধান বিলক্ষণ দেখাইয়াছেন। মানবীয় চেষ্টা বলে সমাজ পরিচালন খ্রীষ্ট সমাজ ও

ব্রাহ্মসমাজেও বেশ প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ মানে ব্রাহ্মদিগের সমাজ ব্রাহ্মদিগের দ্বারায় কিরূপে পরিচালিত হইতে পারে তাহাও বেশ পরীক্ষিত হইয়াছে বা হইতেছে, কিন্তু নববিধানে মানুষের হাতে কিছুই নাই। যেমন এদেশে বলে চণ্ডাল ছুইলে হাড়ি নষ্ট হয় তেমনি মানুষ হাত দিলে সব নষ্ট হয়, ইহা দেখিয়া এবার পবিত্রাত্মা স্বয়ং সব নিজ হাতে লইয়াছেন।* তিনিই আমাদের ব্যক্তিগত জীবন উন্নত করিবেন। তিনিই আমাদের সমাজ গঠন করিবেন। সকলই মার হাতে গঠিত হইবে। সুতরাং আমরা পাপী দুর্ব্বল অধম কিছুই নই, এই বুঝিয়া মার হাতে আত্ম-সমর্পণ করিলে তবে তিনি সমুদয় গঠন করিবেন।

অতএব সর্ব্বপ্রথমে কি ব্যক্তিগত উন্নতি কি সামাজিক উন্নতি সাধন জন্য এই বিধানে জীবন্ত জাগ্রত প্রত্যক্ষ জননী বর্ত্তমান ইহা সর্ব্বান্তকরণে বিশ্বাস করিতে হইবে। ব্রহ্মানন্দ বলিলেন "প্রকৃত বিশ্বাসই প্রত্যক্ষ দর্শন" সুতরাং মাকে এই ভাবে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তাঁর চরণে সর্ব্ববিষয়ে আত্ম-সমর্পণ আবশ্যক। আরও তিনি জীবন্ত গুরুরূপে প্রত্যেক বিষয়ে সুপরামর্শ দিয়া পরিচালনা করেন ইহাও পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার আদেশ উপদেশ বা নির্দ্দেশ উপলব্ধি করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। স্বচ্ছ কাচে যেমন প্রতিবিম্ব পড়ে তেমন জড় পদার্থে পড়ে না, সেইরূপ আত্মা চৈতন্যশীল হইলেই ঈশ্বরের আদেশ সহজে উপলব্ধি করিতে পারে, কিন্তু তাহা না হইলেও মানবের মুখে বা ঘটনার দ্বারা অথবা প্রাকৃতিক নিয়ম যোগেও তিনি আদেশ উপদেশ বা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সুতরাং আমাদের আত্মার অবস্থা অনুসারে যেরূপেই

বশেষ শিক্ষা। এক ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মবাণী শ্রবণ সাধন হইলেই আর যাহা কিছু প্রয়োজন সকলই হইবে।

সর্বধর্ম একই ব্রহ্মের বিকাশ, সর্বধর্মই একই ধর্মের বিভিন্ন প্রকাশ, সর্বশাস্ত্র একই অখণ্ড শাস্ত্রেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যান, সর্বমানব একই অখণ্ড মানবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, সর্বঘটনায় একই পবিত্রাত্মার বিচিত্র লীলা বিধান ইহাই নববিধানের নিগূঢ় তাৎপর্য্য জানিয়া, সম্পূর্ণরূপে আপনাকে পাপী কিছুই নই বুঝিয়া, মার কৃপার ভিখারী হইলে নববিধান পূর্ণ সাধন দ্বারায় ব্রহ্মানন্দ জীবন লাভাকাঙ্ক্ষী হইলে মা আমাদিগকে তাঁর পবিত্রাত্মার প্রভাবে ব্রহ্মানন্দ জীবন বা নববিধানের নবজীবন দানে কৃতার্থ করিবেন। এবং আমাদের দ্বারায় তাঁর পূর্ণ নববিধান মণ্ডলী গঠন করিয়া লইবেন।

এ দেশে যেমন সংস্কার মানুষ জন্মজন্মান্তর ফিরিয়া না আসিলে মুক্তি পায় না, এ কথা যদিও আমরা বিশ্বাস করি না, কিন্তু মানুষের যে পাপ প্রবৃত্তি অবস্থার পর অবস্থায় পড়িয়া, নানা প্রকার আঘাতের পর আঘাত পাইয়া সুশিক্ষিত এবং সুগঠিত না হইলে আত্মার চৈতন্য লাভ হয় না, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কোন গহনা গড়িতে যেমন স্বর্ণকার কতই সোণাকে আগুনে পোড়ায় জলে ডোবায় হাতুড়ির ঘা মারে তবে তাহা সুগঠিত হয়, সোণার মত ধাতুকেও এই প্রক্রীয়া সহ্য করিয়া গঠিত হইতে হয়. মানবের মধ্যে সাধু জীবনও এইরূপ দহন আঘাত বিনা গঠিত হয় না; সেইরূপ কি আমাদের ব্যক্তিগত জীবন কি আমাদের সমাজ স্বয়ং মা নানা প্রকার অবস্থার পেষণে ফেলিয়া পুড়াইয়া পিটিয়া খাদ বাহির করিয়া দিয়া নিজ হাতে গড়িতেছেন ইহা বিশ্বাস করিয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে। আমাদের কোন বিষয়ে নিজেদের হাত দিয়া আঁকু পাকু করিলে কিছুই হইবে না।

বিশেষতঃ নববিধানে প্রত্যেক ঘটনার ভিতর বিধাতার বিধান দেখিতে ও তাহা পাঠ করিতে হইবে। কি ব্যক্তিগত জীবনে কি সমাজে যে কিছু ঘটনা ঘটিয়াছে তার ভিতর ধর্ম্ম, নীতি, নির্ভর, বিশ্বাস, প্রার্থনা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সেবা ইত্যাদি সকল বিষয়ে যা কিছু শিক্ষা আছে তাহা শিখিয়া লইতে হইবে। কোন ঘটনাই আকস্মিক নয়। প্রত্যেকটিই বিধাতার স্বহস্ত প্রেরিত পরিত্রাণের বিধান এই বুঝিয়া তার ভিতর যাহা কিছু উপার্জ্জন করিবার তাহা করিয়া লইতে হইবে; কোন সুযোগই উপেক্ষা করিলে আমরা বিধান বিশ্বাসী হইতে পারিব না। তাই মণ্ডলীর বর্ত্তমান অবস্থাতে যদি আমরা নববিধান বিশ্বাসী হই, আমরা ভয় না পাইয়া কিংবা নিজ খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া কিছু না করিতে গিয়া যদি বিধাতার কি শিক্ষা কি উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করি এবং তাহা করিয়া তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক বলিয়া নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়া থাকি, নিশ্চয়ই আপনারাও ধন্য হইব এবং মণ্ডলীরও মঙ্গল সাধন করিতে পারিব।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মদিগের দ্বারায় কিরূপে পরিচালন হইতে পারে তাহা পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে। নববিধান মণ্ডলী মাতৃক্রোড়স্থ শিশুসন্তানদিগের মণ্ডলী। শিশুসন্তানগণ যেমন আহার পরিধানের জন্য আপনারা উপার্জ্জন করে না, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে মার উপরেই ভার আছে জানিয়া কেবল ক্ষুধা পাইলে মা মা বলিয়াই কাঁদে, আর তিনি আবশ্যকতা বুঝিয়া যখন যার যাহা প্রয়োজন তখন তাহাকে তাহাই বিধান করিয়া থাকেন, আমাদেরও সেই ভাবে মা মা বলিয়া কাঁদিতে হইবে এবং তিনি নিজে বুঝিয়া আমাদের যাহা প্রয়োজন তাহাই বিধান করিবেন।

শ্রীব্রহ্মানন্দের জীবন অধ্যয়নে এই শিক্ষাই পাওয়া যায় যে তিনি নব-বিধান করিবেন বা সমাজ গড়িবেন ইহা মতলব করিয়া জীবন আরম্ভ করেন নাই। তিনি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর ও প্রার্থনাশীল হইয়া জীবনের ভার মার হাতে ছাড়িয়া দেন এবং মাই নিজে তাঁর ও মানবের অভাব ও উন্নতি অনুসারে ক্রমে তাঁর জীবন বিকশিত করিয়া তাঁহার দ্বারায় এত বড় প্রকাণ্ড বিধান মণ্ডলী রচনা করিলেন। তাঁর অনুগমনে কি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের কি বিধান মণ্ডলীর ভার মার হাতে দিয়া যদি আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি নিশ্চয় আমাদের জীবনও ব্রহ্মানন্দময় হইবে, আমাদের মণ্ডলীও শান্তি উপকূলে পৌছিবে। ব্রহ্মানন্দ বলিলেন "এখন হাল দাঁড় ছাড়িয়া দিয়া স্রোতে ভাসিয়া যাইবার সময়"। বাস্তবিক এখন যে মার কৃপাপবন উঠি-য়াছে পবিত্রা মার স্রোত যে বহিতেছে, এখন কেবল বিশ্বাস করিয়া ব্যক্তিগত [illegible]গত জীবন একাকার করিয়া তরী ভাসাইয়া দিতে পারিলেই হইবে। [illegible]রূপে এই ভাবের ভাবাপন্ন যাঁরা যেখানে আছেন আসুন সবে মিলিয়া ব্রহ্মানন্দের অনুগমন সাধনায় প্রবৃত্ত হই। এবং সবে মিলে ব্রহ্মানন্দের [illegible] গ্রথিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ সঙ্ঘ গঠন করি ও পূর্ণ নববিধান জয়যুক্ত [illegible] হই।

ব্রহ্মানন্দ কি ভাবে গৃহীত হইতে চান এবং কি ভাবেইবা তাঁর অনুগমন [illegible] হইবে ইতিপূর্ব্বে তাঁর উক্তিতেই তাহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছি। [illegible] একটী পুনরায় এখানে দিতেছি :—

[illegible]স্বরূপ, আমরা কি প্রমাণ দেখিয়াছি যে একজন কেউ আমাদের [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গের মত হয়েছে? এমন কি একজন কেউ আমাদের [illegible]য়েছে যার বুকে হাত দিয়ে বলিতে পারিবে লোকে, ইহার [illegible] বেদ এক হয়েছে? গরীব বলিতে চায় যে ঈশা মুষার

নের সঙ্গে এ বিধান মিলিয়াছে, যদিও স্বতন্ত্রতা আছে। এ গরীব তে চায় কাল পাপী সাধুদের সহিত কিছুতেই তুলনা হয় না, কিন্তু সে মলীন ছিল ক্রমে জ্যোতির্ময় হইল, কঠিন ছিল কোমল হইল। র জীবনের পরিবর্ত্তন সকলের পক্ষে আশাপ্রদ। আমি নিশ্চয় বলছি নার জীবন দেখ বিপদ অন্ধকারে কেশবচন্দ্র চন্দ্র হইবে। নারকী দ্ধার হইতে পারে এ যদি দেখিতে চাও, তবে ভাই এই বন্ধুকে লও, সঙ্গে রাখ।" তবে এস তার কথা মতই তাঁহাকে গ্রহণ করি ও সঙ্গে রাখি।

তিনি আরো যে বলিয়াছেন "আত্ম-পরিচয় দিলাম অনেক দিন, কিন্তু এ আত্মা পরিচিত হইল না। একজনের কাছে এক রকম আমি, আর একজনের কাছে আর এক রকম। ইঁহারা বলিতে পারিলেন না কে আমি, কি আমি। বুঝিতে যে পারিবেন সে আশাও কমিতেছে। যদি ঠিক বুঝিতেন, এত বিবাদ বিসম্বাদ দুঃখ থাকিত না। যদি এ জীবনে নববিধানের কিছু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাক, তবে এই বার ইঁহারা একজনকে বুঝিয়া যান, একজনকে বন্ধু করিয়া বরণ করিয়া হৃদয়ে লইয়া যান। ইঁহারা একজন যা বলিবেন আমি তা নয়, ইঁহাদের স্বাতন্ত্র্যে আমি নই। একজন আমার ভক্তির ভাগ, একজন আমার যোগের ভাগ, একজন আমার কর্ম্মশীলতার ভাগ লইয়া গেলেন তাতে হবে না। এমন যেন দুর্ঘটনা না হয়। কাটা মানুষ যেন কেহ নিয়ে না যায়। জল মাছের আধার। সেই জলে আমাতে মাছ রেখে সবশুদ্ধ মাছটা নিয়ে যাও। জল থেকে মাছ আলাদা করিও না। বুদ্ধি খাঁড়া দিয়ে মাছ কেটো না। ভক্তমীন তোমাদের দাস হয়ে সরোবরে খেলা করিবে। মিছামিছি একটা কেশব খাড়া করিও

ান। আদতটী নিন। আমার নাক কান কেটে আমাকে যেন না যান। জীবন শুষ্ক যেন ভাইদের ভিতর মিশি। ভক্তদের হৃদয়-রে এ মীন খেলা করিবে, বুদ্ধির শুষ্ক ভূমিতে ভাই, আমাকে না। দীননাথ, সেইখানে থাকিতে চাই যেখানে তুমি আমাকে তে চাও। তোমার পদানত হয়ে তোমার পদপ্রান্তে ভক্তের হৃদয়-বরে থাকি। ভাইদের বুকের ভিতর প্রশস্ত সরোবরে এই মীন করিবে বাড়িবে। বৃহৎ ভারত-সাগরে, এসিয়া-সাগরে, সমস্ত দেশের, ভাইয়ের সমস্ত পৃথিবীর বুকের ভিতর এই মাছ বাড়িবে। সব এক হয়ে শেষে এক মাছ হয়ে ভক্তির সাগরে আনন্দের সাগরে র সাগরে ভাসিয়া বেড়াইব।" আমরা সর্বান্তকরণে এস প্রার্থনা তাই হউক।

পূর্ণ বিশ্বাস বিনা কিছুতে ইহা হইবে না। ব্রহ্মানন্দ বলিলেন "পাপ গ কিন্তু বিশ্বাস ঔষধ, ঔষধে রোগ যায় কিন্তু ঔষধ গেলে যে ড় গেল। পাপীর নরক ছোট, অবিশ্বাসীর নরক বড়।" তাই নি এ বিধানে বা এ বিধান প্রবর্তকে অবিশ্বাস করিবেন তাঁর রায় কিছুই হইবে না এবং এই অবিশ্বাসীদেরও সঙ্গ হইতে মাদের দূরে থাকিতে হইবে। অতএব ভক্ত, ভগবান ও বিধানে র্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিলে আমরা পাপী হইলেও ব্রহ্মানন্দ জীবন পাইব। অবিশ্বাস নিরাকরণ বিষয়ে ব্রহ্মানন্দ যে তীব্র উক্তি করিয়াছেন তাহা পূর্বেও উদ্ধৃত করিয়াছি পুনরায় এখানে দিতেছি ঃ—

'কি দোষ করিলে ধর্মের মূলে কুঠার মারা হয়? নরক কোন পাপে? আমরা যদি গোড়া মানি। যেখান থেকে ধর্মের কথা আসছে তাতে যদি বিশ্বাস না রাখি। বিধি নিতে যদি ত্রুটী হয়, বিধান বিশ্বাসে

যদি ত্রুটি হয়, বিধানবাদী যদি বিধান না মানিলেন, তার সঙ্গে যদি আর পাঁচটা মত মিশাইলেন। এইখানকার মত যদি পূর্ণভাবে সহিত না লইয়া তাহাতে নিজের বুদ্ধির মত মিশাইলাম তাহলে ভয়ানক নরকের পথ পরিষ্কার করা হইল। পরিত্রাণের বীজমন্ত্র কেহ বাদ দিয়া লইবে না, মিশাইয়া লইবে না, ছোট করে লইবে না, ষোল আনা গ্রহণ করিতে হইবে।

"এত বড় অহঙ্কারের কথা যে আমার কথা গ্রহণ না করিলে ভাইদের পরিত্রাণ হইবে না? কিন্তু এ অহঙ্কারের কথা সোণার অক্ষরে লেখা থাকে। এ যে পরিত্রাণ লইয়া বিষয়। হিন্দু বলিয়া মুসলমানের কোরাণের মতে চলিলে, শাক্ত বলিয়া বৈষ্ণবের মতে চলিলে ভয়ানক কপটতা অবিশ্বাস হইল। একবার যদি বিধান মানা হয় ষোল আনা লইতেই হইবে।

"তোমার স্বর্গের হুকুম জারি কটা লোক করিতে পারে? সে হুকুম না মানা আর ঈশ্বর নাই বলা এক। পূর্ণ বিধি যা প্রচার করা হইল, তা যদি কেহ না নিয়ে থাকেন, দলপতির কথা কেহ যদি অগ্রাহ্য করে থাকেন সেই বিধি সম্বন্ধে, তা হলে আমার একটু সন্দেহ নাই তাদের জন্য নরক আছে।

"আমাকে মূর্খ জেনে পাপী জেনেও আসল বিধির জায়গা যেখানে নববিধানের দরজা যেখানে আমি যদি সেখানে দাঁড়িয়ে প্রাণ দিতে বলি, প্রাণ দিতে পারেন যদি তবে বলি বিশ্বাস, বিশ্বাস করিলে নিশ্চয় স্বর্গ আসিবে।"

অতএব "যাও এবং ভাইয়ের সহিত পুনর্মিলিত হও এবং

brother and then come to worship God.) এই প্রাচীন উক্ত স্মরণ করিয়া এস আমরা সকলে এই জগজ্জন ভাইয়ের সহিত আত্মযোগে পুনর্মিলিত হইয়া মার স্মরণাপন্ন হই এবং নববিধান সাধন করি। আমরা বিশ্বাস করি কেবল ব্রহ্মানন্দের সহিত মিলনাভাবই ব্রাহ্মসমাজের, নববিধানমণ্ডলীর বা সমগ্র মানবমণ্ডলীরও বর্ত্তমান দুরাবস্থার একমাত্র কারণ। জগজ্জন ভাইয়ের সহিত মিলন ভিন্ন আমাদের ব্রহ্মসম্মুখে উপস্থিত হইবারই কোনও অধিকার নাই। বর্ত্তমান যুগে ভাইয়ের সহিত না গেলে যে মার কাছে যাওয়াই যাইবে না। আমরা চলিয়াছি সকলে একা একা; স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাবে স্বেচ্ছাচারী হইয়া গেলে আমরা ব্রহ্মকে পাইব কেন। ভাইকে না ভালবাসিলে মাকে ভালবাসা হইলই না, এ তো পুরাতন কথা, ভাই ভাই একাত্মা একাকাঙ্ক্ষা না হইলে তাঁহার কাছে যাওয়া হইবে না এই নূতন বিধান, কেন না ইহা যে ভ্রাতৃত্বের বিধান। ব্রহ্মানন্দের সহিত এক হইলেই আমরা পরস্পরের সহিত এক হইব, সমস্ত জাতি এক হইবে, সমস্ত দেশ এক হইবে এবং স্বর্গেও দেখিব "একমেবাদ্বিতীয়ং," মর্ত্তেও দেখিব "একমেবাদ্বিতীয়ং"।

বিশেষতঃ আমরা পূর্ব্বেই যেমন বলিয়াছি পূর্ণ পাপ বোধ উজ্জ্বল না হইলে আমরা কি মার স্মরণাপন্ন হইতে চাই এবং তাহা না হইলেই বা কি করিয়া ব্রহ্ম সম্মুখে উপস্থিত হইব? ব্রহ্মানন্দ সঙ্গ মানে আমাদের পাপ বোধ উদ্দীপনা। "আমি পাপী" "আমি পাপী" যিনি বলেন তাঁকে গ্রহণ করিলেই আমি আপনাকে পাপী বলিয়া যথার্থ বুঝিতে পারি এবং এই "আমি পাপী" বলিয়া বুঝিলেই ব্রহ্মকে স্নেহময়ী মাতৃরূপে দেখিতে পাই। রোগী সন্তানের নিকট মা যেমন সর্ব্বদাই থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা করেন, তেমনি মাও আমাদের প্রতি করিতে-

ছেন বুঝিতে পারি। এই আপনাকে পাপী রোগগ্রস্ত বলিয়া উপলব্ধি করাই যথার্থ ব্রহ্মানন্দ গ্রহণ বা ব্রহ্মানন্দ জীবন গ্রহণ। মা যেমন দিবানিশি কাছে বসিয়া রোগী সন্তানকে চিকিৎসকের দ্বারায় চিকিৎসা করাইয়া ক্রমে ক্রমে সুস্থ করেন, তেমনি আমরাও রোগী, মা আমাদের কাছে সর্ব্বদা থাকিয়া পবিত্রাত্মার দ্বারায় চিকিৎসা করাইয়া এবং নিজে সেবা শুশ্রূষা দ্বারায় নিত্য শুদ্ধ ও সুখী বা ব্রহ্মানন্দময় করিতেছেন এই উপলব্ধিই ব্রহ্মানন্দ গ্রহণে নববিধান সাধন হয়, ও সকল ভক্ত সন্তানের মার অঙ্কে মিলন হয়।

এক্ষণে যদিও, "আপন সাধন কথা না কহিবে যথা তথা," তথাপিও ব্রহ্মানন্দ অনুগমনার্থী ভক্তিমান ব্যক্তিগণের সাধনের যদি কিছু সহায়তা হয় এই আশায় আমরা এই ব্রহ্মানন্দ অনুগমন সাধন কি ভাবে করিতেছি তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে আমরা প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠিয়াই সর্ব্বপ্রথমে মাতৃস্মরণপূর্ব্বক, ব্রহ্মানন্দ সনে ব্রহ্মস্তোত্রম্ পাঠ করি। ইংরাজী ১৮৮৪ সালের ৮ই জানুয়ারী প্রত্যুষে তাঁর দেহত্যাগের প্রাক্কালে তাঁর সহিত পৃথিবীতে যে শেষ নাম পাঠ করিয়াছিলাম, সেই তাঁর দেহের সঙ্গে শেষ অধ্যাত্ম সাধন আমরা করি; তাহারই স্মৃতি চিরজাগ্রত রাখিবার জন্য এই সাধন করা হয়। ঈশা যেমন তাঁর স্মরণার্থ তাঁর রক্ত মাংস পান ভোজন করিতে বলিয়া গেলেন, সেইরূপ ব্রহ্মানন্দের আত্মার স্মরণার্থও আমরা ইহা করিয়া থাকি, ইহাতে ব্রহ্মানন্দের অধ্যাত্ম সঙ্গও বেশ অনুভূত হয়।

তাঁহাকে লইয়া এইরূপে দিন আরম্ভ করিয়া দিনযাপনে তাঁরই জীবন অনুগমন করিবার নিমিত্ত সমষ্টির সমস্বরূপ প্রার্থনা যোগে পবিত্রাত্মার

মণ্ডলীকে ব্রহ্মানন্দের অঙ্গ জানিয়া স্মরণ করিয়া অধ্যাত্ম যোগে সকল-কার সহিত এক হইবার জন্য প্রার্থনা করা হয় এবং সকলকার জন্যও প্রার্থনা ও সঙ্গীত করা হইয়া থাকে।

প্রাতঃকালীন উপাসনা সময়ে ব্রহ্মানন্দের দৈনন্দিন নির্দ্দিষ্ট প্রার্থনার ভাবে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া উদ্বোধন ও আরাধনা সাধন এবং তাঁর প্রার্থনায় আত্মার যোগ সমাধান ও জীবনে তাহা পালন করিবার জন্য প্রার্থনা করা হয়। তাঁহারই অনুগমনে ব্রত এবং অনুষ্ঠানও যে দিন যেমন পবিত্রাত্মার পরিচালনায় উপলব্ধ হয় সেই মত গ্রহণ করা হয়। উপাসনান্তে সর্ব্ব-প্রণাম সঙ্গীত করা হইয়া থাকে।

সমস্ত দিন ব্রহ্মানন্দ-জননীকে সম্মুখে রাখিয়া ব্রহ্মানন্দে আত্মস্থ হইয়া সেবা ব্রত, তত্ত্বালোচনা, কার্য্য সাধন ও অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি করিবার চেষ্টা করা হয়। নবসংহিতার নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে প্রতিদিন স্নান আহারাদি এবং সকল অনুষ্ঠান সাধন করা হইয়া থাকে।

সন্ধ্যাকালে আবার সংক্ষিপ্ত উপাসনা ও আত্মচিন্তা কখনও বা কীর্ত্তন ধ্যানাদি করা হয় এবং উপাসনা যোগে মাতৃ স্তোত্র পাঠ করা হয়। প্রতিবার উপাসনার সময়ই নিজ পরিবার, ভক্ত পরিবার, সমগ্র ভ্রাতৃ মণ্ডলী ও মানব মণ্ডলীকে প্রাণের ভিতর গ্রহণ করিয়া উপাসনা সাধন করা হয়।

প্রতি রবিবারে ও মঙ্গলবারে (ব্রহ্মানন্দের স্বর্গারোহণ বারে) বিশেষ ভাবে ব্রহ্মানন্দ তীর্থ অনুসরন করা হয়।

এই রূপ সাধনার দ্বারায় আমাদের এই বিশ্বাস যে ক্রমে ক্রমে মা তাঁর এই রূপ সাধনার দ্বারায় আমাদের এই বিশ্বাস যে ক্রমে ক্রমে মা তাঁর মানব মণ্ডলীকে ব্রহ্মানন্দ জীবনগত করিয়া তাঁর মানব পরিবারে নব-মানব মণ্ডলী গঠন করিবেন এবং পৃথিবীতে স্বর্গের বীজ বৃক্ষাকারে

পরিণত করিবেন। স্বয়ং পবিত্রাত্মা এই প্রণালী অবলম্বনে যাঁহাদের চক্ষু উন্মীলন করিবেন তাঁহারাই নববিধানে এক মণ্ডলী হইতে পারিবেন আমরা বিশ্বাস করি।

এই ব্রহ্মানন্দ-জীবন সকল ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তিতেই বিরাজিত। মানবের ভিতর ব্রহ্ম সন্তানত্ব যাহা, তাহাই ব্রহ্মানন্দ, সুতরাং যে কোন মহা প্রাণের সংস্পর্শে আত্মা ব্রহ্মোন্মুখ হয় সেই প্রাণেই ব্রহ্মানন্দ জীবন্ত জানিয়া যদি আমরা তাঁহাকেই ধর্ম্মবন্ধু বা ধর্ম্ম সাধন সহায় বলিয়া গ্রহণ করিয়া সাধন করি তাহা হইলেও আমরা এই সাধনায় অগ্রসর হইতে পারি। প্রতি পরিবারেরই পিতা মাতা কিম্বা প্রিয়জন, শিশু বা পরলোক-গত আত্মা এই ভাবে সাধন মধ্যবিন্দু বা সহায় হইতে পারেন। ঈশা গৌরাঙ্গ, রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, মার্টিনো, ইমার্সন জীবিত বা মৃত কোন ধর্ম্মাচার্য্য যে কেহ হউন না যিনিই যাঁর ধর্ম্মজীবন বা ধর্ম্মপ্রাণকে ব্রহ্মোন্মুখ করেন তাঁরই ভিতর সেই এক অখণ্ড মানবাবতার জগজ্জনভাই ব্রহ্মানন্দ ইহা দেখিলে আর কাহারই সহিত কাহারও ধর্ম্ম-বিবাদ থাকিবে না এবং পরস্পরকে একই দেহের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিতে সকলে পারিবেন। কিন্তু যিনি এই এক ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিবার জন্য মধ্যবিন্দুরূপে ভগবৎ প্রেরিত তাঁহাকে ছাড়িয়া বা তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া গুরুকরণ করিলে হইবে না, কেন না ব্রহ্মানন্দ স্পষ্টই বলিয়াছেন:—"একজন লোকে কয়জন লোক মিলিত হইয়া যাইবে এবং তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিবে এবং তাহারা সমুদয় মিলিয়া তোমাতে বিলীন হইবে ইহাই নববিধানের তাৎপর্য্য।"

* ... মিলিত হইতেছে। ভগবানের লীলা

...পূর্ব পূর্ব-ধর্ম-বিধানে গুরুকে যে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া দেখিতে বলেন সে ... আর থাকিবে না; গুরু ব্রহ্মপুত্র বা ব্রহ্মানন্দগণ। ...কোন ক্ষেত্রে এক গোলাকার মণ্ডল আঁকিতে হয়, এ কোন বিন্দুকে ... করিয়া তাহা আঁকিতে হয়, সে বিন্দু সেই ক্ষেত্রেই অবস্থিত, কিন্তু ...র দৈর্ঘ-প্রস্থ-পরিধি কিছুই নাই; সেইরূপ ভক্তও ভগবানেতেই অবস্থিত, ভগবানেরই তিনি বিন্দু যাঁহার চারিদিকে ধর্মমণ্ডলী রচিত হয়, ... তাঁর নিজের কিছুই নাই। তেমনি অনন্ত ব্রহ্ম বক্ষে মা যে নববিধানের ... মানব মণ্ডলী অঙ্কিত বা গঠন করিয়াছেন, ভক্ত- বিন্দু ব্রহ্মানন্দই তার মধ্য বিন্দু, তবে তাঁকে ছাড়িয়া মণ্ডলী কিরূপে হইবে?

আমরা দেখিতে পাই ভ্রান্তি বা নিজ নিজ আমিত্ব বশতঃ কতজনে কতজনকেই গুরু খাড়া করিবার চেষ্টা করিয়া মানবের স্বাভাবিক মানব-ভক্তিভাব চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, অথচ নববিধান-বিধায়িনী জননী সত্য সত্য যাঁহাকে "খাড় করিয়াছেন," তাঁকে গ্রহণ করিতে বড় কেহ রাজী হইতেছেন না। কিন্তু সময় নিশ্চয় আসিবে *যখন সকলকার সকল প্রকার ভ্রম প্রমাদ বা বিশেষ বিপক্ষতা ও আমিত্ব স্বামীত্ব ঘুচিয়া যাইবেই যাইবে এবং এই এক অখণ্ড* মানব, যে ভাবে তিনি গৃহীত হইতে চান ও মার পবিত্রাত্মা তাঁকে যে ভাবে গ্রহণ করাইতে চান, সেই ভাবে গৃহীত হইবেনই হইবেন। এবং তাহা হইলেই ব্রহ্মানন্দ যেমন বলিলেন "আমার সহিত এক মাকে ডাকিলে, এক মার মত দেখিলে সব মধুময় হইবে," সত্যই সব মধুময়, ব্রহ্মানন্দময় হইবে।

এক্ষণে ব্রহ্মানন্দ যে "এ দলে একটীও প্রেমিক নাই" বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন সেই প্রেমিক দল যাহাতে একটী হয়। তিনি যে প্রার্থনায়

"অন্ততঃ একটীও সুসন্তান ভিক্ষা" করিয়াছেন, "যাহা দ্বারায় নববিধানের কুল রক্ষা হয়"। তিনি যে দেহ ত্যাগ কালে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে তাঁর কেহই রহিল না, সব বিচার বুদ্ধি পরতন্ত্র দলভুক্ত হইল, তাহা যাহাতে না হয়, এবং "যতদিন আমার মনের মত, আবার পিতার মনের মত না হইবে আমার দুঃখ যাইবে না" যে বলিলেন, অন্ততঃ একটী ব্রহ্মানন্দ-দাসের দল যাহাতে স্থাপন হয় এই আমাদের একান্ত আকাঙ্ক্ষা।

সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণের তিরোধানের পরই এক এক দল স্ব স্ব সম্মিলিত হইয়া প্রবর্ত্তকের ধর্ম্মপ্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁর ধর্ম্ম বিধান রক্ষা ও প্রচার প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমান বিধানেও প্রেরিত শ্রীদরবার যদি ব্রহ্মানন্দ মতে গ্রথিত থাকিয়া তাহা করিতে পারিতেন, ব্রহ্মানন্দের আশা পূর্ণ হইত, কিন্তু প্রেরিত মহাত্মাদিগের মধ্যে যখন মিলনাভাব তখন এক ব্রহ্মানন্দগত প্রাণ ব্রহ্মানন্দ দল না হইলে ব্রহ্মানন্দের অদৃশ্য মণ্ডলী দৃশ্যমান হইবে না এবং পূর্ণ নববিধানও গৌরবান্বিত হইবে না।

এক্ষণে যেখানে যত ব্রহ্মানন্দ প্রিয়জন আছেন সকলকে মা তাঁর পবিত্রাত্মার দ্বারায় মিলিত করিয়া এই দল স্থাপনে সহায়তা করিতে পরিচালন করুন এই আমাদের আন্তরিক ভিক্ষা। শ্রীব্রহ্মানন্দ যেমন প্রার্থনায় বলিলেন "ভগবান কৃপা কর শেষে খাঁটি ধর্ম্ম খাঁটি নববিধান দেখিব। উচ্চ প্রেমের সাধন দেখিব। আবার সকলকে নূতন নববিধান ধর্ম্মে দীক্ষিত কর।" এই নূতন নববিধানে পুনরায় দীক্ষিত হইবার জন্য খাঁটি ধর্ম্ম উচ্চপ্রেম সাধনের জন্যই এই দল আবশ্যক। এবারে "মানুষের হাতে কিছু থাকিবে না, মানুষ গুরু হইয়া ব্রহ্মের সিংহাসনে বসিয়া উপদেশ দেবেন না"। এই দলের প্রাণ

জীবন এবং পবিত্রাত্মার প্রত্যাদেশ ইহার পরিচালনের উপায়। সর্বোপরি ... মা ব্রহ্মানন্দ-জননীরূপে অধিষ্ঠিত, সর্ব্ব মানবে জগজ্জন ভাই ব্রহ্মানন্দ ... পূজিত এবং সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্ব শাস্ত্রের সমন্বয়ে এক অখণ্ড নববিধান জগতের পরিত্রাণের জন্য প্রেরিত, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। এই বিধানই একমাত্র পাপীর পরিত্রাণের বিধান, কেননা ইহার মধ্যবিন্দু মানবের ... বোধ উদ্দীপনী জীবন। আমরা কিন্তু পাপরোগে রোগী হইয়লেও ... দময় হইব যদি এই মধ্যবিন্দু অবলম্বন করি। রোগীকে ইংরাজীতে ... patient ধৈর্য্যধারী। বাস্তবিক কি রোগী, কি চিকিৎসক, ... সেবক সকলে ধৈর্য্যধারী হইলে তবে রোগের উপশম হয়। ...প আমরাও আপনাদিগকে পাপী রোগী বলিয়া যদি বিশ্বাস করি আমাদিগকেও ধৈর্য্যধারী হইয়া ব্রহ্ম কৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর-শীল হইতেই হইবে। তিনি যথাসময়ে আমাদিগকে ভাল করিবেন। জীবন্ত মা যে আমাদের কাছে, পবিত্রাত্মা আমাদের পরিচালক এবং ব্রহ্মানন্দের ... সহায়: সরল প্রার্থনা আমাদের সম্বল। "সঙ্গতের নীতি, মুঙ্গেরের ভক্তি, নববিধানের ধর্ম্ম" সাধন ও "নববিধানের আদর্শ চরিত্র" অবলম্বনে ব্যক্তিগত জীবন এবং নবসংহিতাঅনুসারে পরিবার ও মণ্ডলীগঠন করা এবং ... অখণ্ড মানব যোগ সমাধান করা এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। "ষোল আনা বিশ্বাস মাতে, ষোল আনা বিশ্বাস বিধানেতে, ষোল আনা বিশ্বাস ...তে এবং ষোল আনা বিশ্বাস ভক্তেতে" রাখিয়া প্রত্যক্ষ ... শ্রবণে এই ব্রহ্মানন্দ-সঙ্ঘ কার্য্য করিবেন।

... এখন আর লুক্ লুক্ ছাপ্ ছাপ্ নয়। শ্রীব্রহ্মানন্দের সহিত ... "গোপনে যা শুনেছিলাম এখন ভেরী বাজাইয়া তা রাস্তায়

বলিতেছি। লোকের মন যুগিয়ে কথা বলা কখনও আমাদের ব্রত না হয়। চিরকাল ঐ বিষ খেয়ে আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। অনুমানের সময় তোমার দল ভারি ছিল, বিশ্বাসের সময় পাতলা হইল। ক্ষতি নাই, তোমারও ক্ষতি নাই, আমাদেরও ক্ষতি নাই। তবু মত্ত হস্তীর ন্যায় চলিব, সিংহের ন্যায় চলিব, পিতা আমাদের দায়ীত্ব বুঝিয়ে দাও। দায়ীত্ব কি? নরম সুরে বলিব না, অনুমান করিয়া বলিব না। যাতে থাকে থাক যায় যাক লোক, তোমার কথা বলে বলে ঢের লোক সরে পড়েছে। যে কটা মেয়ে ছেলে রয়েছে তাদের মন যেন যথার্থ যোগধর্ম্ম শিক্ষা করে। তাদের নিকট ব্রহ্মদর্শন যেন সত্য হয়। তারা যেন বিবেকের আদেশ শুনিতে পায়। বিশ্বাস যেন স্থির হয়। ব্রাহ্মসমাজ এখন ঘনীভূত হইয়া এই ছোট পরিবারের মত হয়েছে। ইহারা যাতে যোগী বিশ্বাসী বৈরাগী হয় এমন আশীর্ব্বাদ কর।" ইহাতে যেমন ব্রহ্মানন্দ বলিলেন "একজনই থাকুন আর দেড়জনই থাকুন" তাহাতে ক্ষতি নাই।

পরিশেষে ব্রহ্মানন্দ সনে আমরা আরও প্রার্থনা করি "হে হরি, আমাদের দশটা দশরকম হইয়া দাঁড়িয়েছে। দশ জন দশ রকম মত খাড়া করেছে। দেখে, শুনে ভয় পেয়ে দাস তোমার কাছে তাই ভিক্ষা চাহিতেছে, সাংঘাতিক বিপদে তুমি রক্ষা কর। তুফান ভারি ওহে হরি তোমার হাল, তুমি ধর। একখানি ধর্ম্ম আমরা রাখিব। একখানি মানুষ হয়ে, একখানি ভক্ত হয়ে তোমার পাদপদ্ম সাধন করিব। তোমার নববিধানের দোহাই, তোমার শ্রীপাদপদ্মের দোহাই। কৃপাসিন্ধু কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ

পরিশিষ্ট।

জয় সত্য-জ্ঞান-অনন্ত- প্রেমময়-অদ্বৈত-

শুদ্ধ-অপাপ-বিদ্ধ হে ব্রহ্ম-আনন্দ ;

জয় মুষা-সক্রেটীস-বুদ্ধ- গৌর-মোহম্মদ-

ঋষি-খ্রীষ্ট ব্রহ্মপুত্র সবে মিলে ব্রহ্মানন্দ ;

জয় আবেস্তা-বিজ্ঞান- ললিতবিস্তর-পুরাণ-

কোরাণ-বেদ-বাইবেল মিলে হল জীবন-বেদ ;

(ঐ) সপ্তস্বরূপ-মা একজন, সর্ব্বভক্ত এক-সন্তান,

সর্ব্বশাস্ত্রে এক-বিধান মিলাইলেন ব্রহ্মানন্দ

(তাই) লয়ে প্রাণে সর্ব্ব-জনে, একে-ত্রিনীতি সাধনে

(সবে) লভিব নববিধানে এ জীবনেই ব্রহ্মানন্দ ;

(জয়) জয় সচ্চিদানন্দ, জয় জয় ব্রহ্মানন্দ,

জয় নববিধান-পবিত্রাত্মা-আনন্দ।

জয় ব্রহ্ম-ব্রহ্মানন্দ-নূতন বিধান,

(জয়) সচ্চিদানন্দ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

সত্য-জ্ঞানানন্ত-প্রেম-এক পুণ্য-শান্তি-ঘন,

গড্ খোদা জিউবা হরি সেই একজন,

মাতৃরূপে স্বয়ং ব্রহ্ম ধরায় অবতীর্ণ,

পূজি তাঁরে হৃদ্‌মন্দিরে পাই নবজীবন।

সর্ব্ব জীবে ভ্রাতৃভাবে করিতে মিলন,

জগজ্জন-ভাই ব্রহ্মানন্দের আগমন।